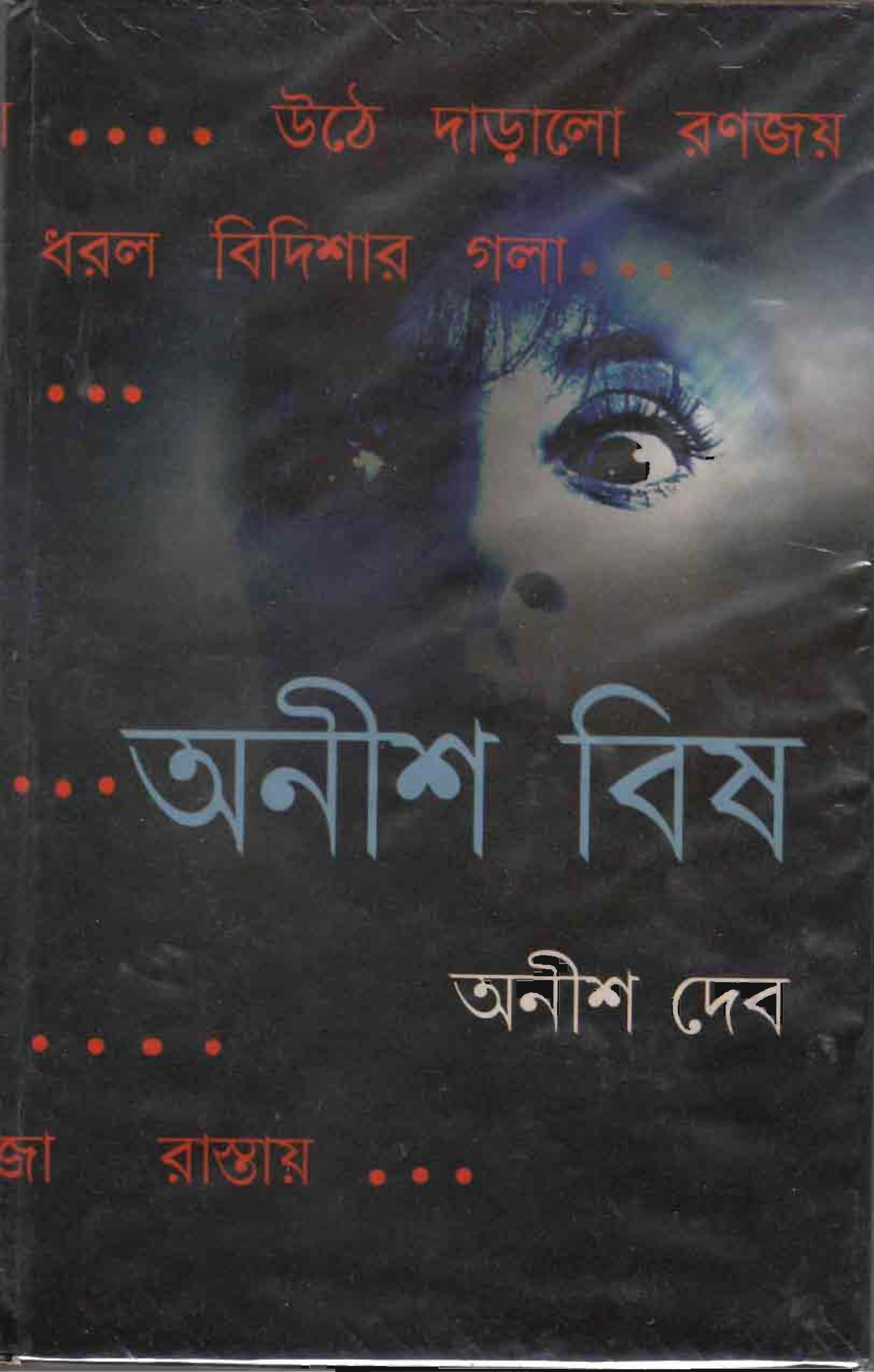


.... উঠে দাড়ালো রণজয়
ধরল বিদিশার গলা...
...
...অনীশ বিষ
অনীশ দেব
....
জা রাস্তায় ...

সূচিপত্র

সাক্ষী এই চোখ

সূত্রপাত

বিগত পাঁচ বছরের পেশাদারি অপরাধ-জীবনে ('খুন' শব্দটাকে আমি আবার ঠিক পছন্দ করি না) সামান্যতম কোনও ভুল আমি করিনি। জন্মগত প্রতিভাবশত আমার প্রতিটি অপরাধই নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন এবং মক্কেলদের চাহিদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ সূত্রহীন। এ ছাড়া পুলিশের সন্দেহ দুঃস্বপ্নেও আমার মক্কেলদের কেশ স্পর্শ করেনি।

এ পর্যন্ত যে-ক'জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আমার রিভলভার ইত্যাদি মারফত মোক্ষ লাভ করেছেন, তাঁদের স্বভাব-চরিত্রে পরস্পরের সঙ্গে ছিল ঘোরতর অমিল। কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁদের তেমনই প্রচণ্ড মিল ছিল—তাঁরা কেউই অজাতশত্রু ছিলেন না। অর্থাৎ, তাঁদের খরচ করার জন্যে দশ-বিশ হাজার খরচের লোক অন্তত একজন করে এই পৃথিবীতে হাজির ছিল।

কিন্তু 'আমাকে' খুন করানোর জন্যে 'আমাকে'-ই ভাড়া করবার চেষ্টা আমার জীবনে এই প্রথম!

অবশ্য অবন্তী কর্মকার জানত না যে, আমাকে খুন করার জন্যে সে আমাকেই ভাড়া করতে যাচ্ছে। সে জানত, একটা মোক্ষলাভ সংক্রান্ত ব্যাপরে সে সতীশ দেবনাথের (অর্থাৎ, এই অধমের) সাহায্য নিচ্ছে।

সাধারণত আমার সঙ্গে আমার মক্কেলদের যোগাযোগের সূত্রটা প্রায় মাইলতিনেক লম্বা। কারণ, কেউ আমার আসল পরিচয় জেনে ফেলুক তা আমি চাই না। তাতে মাঝখান থেকে আমার অসাবধানতার জন্যে একজন গোবেচারা নির্দোষ মক্কেলকে স্বর্গের পথে পা বাড়াতে হয়—সেটা আমার রুচিতে বাধে। কারণ, বিনা পারিশ্রমিকে আমি কাউকে খুন করি না।

এত সব বিচার-বিবেচনা করেই একটা দৈনিক খবরের কাগজের অফিসে ছদ্মনামে একটা বক্স-নম্বরের ব্যবস্থা করেছিলাম। এও বলেছিলাম, আমার চিঠিপত্র আমি নিজে এসেই নিয়ে যাব। উদ্দেশ্য : কৌতূহলী মক্কেলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া। সুতরাং, এইভাবেই মক্কেলদের সঙ্গে চলত আমার ব্যাবসায়িক যোগাযোগ।

অবন্তী কর্মকার আমার বক্স-নম্বরের খবর কী করে পেল জানি না, হয়তো আমার কোনও পুরোনো মক্কেল তাকে ওই বক্স-নম্বরের হদিশ দিয়ে থাকবে। তাতে কিছু যেত-আসত না, যদি না সে আমাকে দিয়ে আমাকেই খুন করাতে চাইত!

এইসব অদ্ভুত ঘটনায় একটু যে বিচলিত হইনি তা নয়। এবং সেই কারণেই খুব সাবধানে অবন্তী কর্মকারের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে দর-কষাকষি চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

অবন্তী কর্মকারের সঙ্গে তেমন পরিচয় আমার ছিল না। 'সিসিল' বার-এর জুয়ার

আড্ডায় দেখা হলে কষ্টকৃত হাসি এবং 'কেমন আছেন?' বলে বরাবর পাশ কাটিয়ে এসেছি। সুতরাং, কোন অশ্রুতপূর্ব কারণে সে যে আমাকে খুন করতে চায়, তা শত ভেবেও আমি খুঁজে বের করতে পারিনি। অন্য মক্কেলদের মতোই সেও তার চিঠিতে আমাকে খুন করার উদ্দেশ্য খুলে বলতে নারাজ। শুধু একটি কথাই তার চিঠির সাত ইঞ্চি বাই ন' ইঞ্চি জায়গা জুড়ে লেখা থাকে : 'সতীশ দেবনাথকে স্বর্গের সিঁড়ি দেখানোর পারিশ্রমিক জানতে চাই।'

এত সব জেনেও আমি অটল ছিলাম। কিন্তু বিশেষভাবে আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগল তখনই, যখন লোকটা আমাকে খুন করার পারিশ্রমিক নিয়ে আমারই সঙ্গে দরাদরি করতে লাগল। তিন-তিনটে চিঠি প্রতি-চিঠির পরও আমরা কোনওরকম ব্যাবসায়িক শর্তে পৌঁছতে পারলাম না। কাজটা হয়তো আমি ছেড়েই দিতাম, যদি না এর সঙ্গে আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে থাকত। আমি চাই না, আমাকে সরানোর জন্যে অবন্তী কর্মকার অন্য কোনও 'ভাড়াটে খুনে'র কাছে যাক।

অবন্তী কর্মকারের সঙ্গে আলাপটা গাঢ়তর করার উদ্দেশ্যে 'সিসিল' বারে যাতায়াত বাড়িয়ে দিলাম, এবং প্ল্যানমাফিক নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এক সন্ধ্যায় তার টেবিলে গিয়ে বসলাম। অবন্তী তখন হাতের গেলাসে চুমুক দিতে ব্যস্ত। বার-এর ঝাপসা আলোয় তার কালো চোখের তারা চিকচিক করছে।

কর্মকারের চেহারা রোগার দিকেই। বয়স চল্লিশ পেরোনো, চোখের দৃষ্টির সঙ্গে স্থিরপ্রতিজ্ঞ মনের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

মুখোমুখি বসেই অলস আলাপের সূত্রপাতের প্রয়াস পেলাম 'ওঃ, আজ ভীষণ গরম পড়েছে! অন্যান্য বছর এ-সময়টা এত গরম পড়ে না।'

হাতের গেলাস থেকে চোখ তুলে তাকাল অবন্তী কর্মকার 'শুনে বড় আনন্দিত হলাম, মিস্টার দেবনাথ।'

এক মাঘে শীত যায় না, বৎস। স্থিরো ভব। এক গাল হেসে বলে উঠলাম, 'আপনার আদি নিবাস যে সাহারায় তা তো জানতাম না।'

'কী বললেন?' অবন্তী চমকে চোখ তুলল।

'না, বলছিলাম আমাদের দেশে গরমকালে ক্রাইমের সংখ্যাটা বেড়ে যায়। হয়তো সাইকিয়াট্রিস্টরা এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

অবন্তীকে একটু কৌতূহলী মনে হল। হাতের গেলাসটাকে এক চুমুকে শেষ করে সে বলে উঠল, 'তা ঠিক বলেছেন। গত বছর বিহারে সামান্য কথা-কাটাকাটির রেজাল্ট হিসেবে দুটো লাশ পুলিশ পড়ে থাকতে দেখেছিল।' কর্মকারের স্বর সামান্য জড়ানো।

ব্যাপারটা সত্যি কি-না জানি না, কিন্তু সুযোগ পেয়েই প্রসঙ্গের গভীরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম : 'কত সামান্য কারণেই না মানুষ মানুষকে খুন করে! বীভৎস হলেও খুন করতে তাদের হাত এতটুকুও কাঁপে না, তাই না?'

কর্মকার বিষণ্ণভাবে হেসে বলল, 'আমার মনে হয় এই খুন করার কারণটা বিশেষ-

বিশেষ অবস্থা আর পরিস্থিতির ওপর ডিপেন্ড করে।'

'কিন্তু আইনকে কখনও নিজের হাতে তুলে নেওয়া কি ঠিক? কোনও মানুষের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করার দায়িত্ব আমাদের এই সমাজের। তাদের হাতে আদালত রয়েছে, রয়েছে বিচারক, জুরি...' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলেই ফেললাম, 'তা ছাড়া সবশেষে রয়েছে ভারপ্রাপ্ত পেশাদার খুনিরা।'

অবন্তী কর্মকার ব্যঙ্গের হাসি হাসল 'মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়, যেসব ক্রাইমের দায়িত্ব আমরা নিজের কাঁধে নিতে ভয় পাই, সেগুলোই আমরা তুলে দিই বিচারক, জুরি, জহ্লাদের হাতে। অর্থাৎ, নিজের অন্যায়টা আর-পাঁচজনের কাঁধে ভাগাভাগি করে দিই।'

হয়তো আমার মনের কল্পনা, কিন্তু অবন্তী কর্মকার যখন 'ভাগাভাগি' শব্দটা উচ্চারণ করল, তখন একটা অদ্ভুত শীতল দীপ্তি তার চোখে মুহূর্তের জন্যে ঝিলিক মেরে গেল।

আমি পরিকল্পনা মতো এগিয়ে চললাম 'কোনও মানুষকে খুন করানোর যে সত্যি কোনও কারণ থাকতে পারে, তা আমি বিশ্বাসই করি না। পৃথিবীতে আরও হাজার রকম শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে—।'

ভুরু তুলে তাকাল অবন্তী কর্মকার 'কারণের কোনও অভাব আছে! যেমন ধরুন, প্রতিশোধ হতে পারে, নারীঘটিত ব্যাপার হতে পারে, টাকার প্রশ্নও নেহাত হালকা কারণ নয়। বুঝলেন, মিস্টার দেবনাথ, ভেবে দেখলে এমনই হয়তো আরও কয়েক লাখ কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।'

কথাটা সত্যি। মনে-মনে কর্মকারকে সমর্থন জানালাম। কোনও মানুষকে খুনের কারণ আঙুলে গুনে শেষ করা যায় না। কিন্তু বৎস, আমাকে খুন করানোর পেছনে তোমার সেই মহৎ কারণটা কী? তুমি-আমি বলতে গেলে অচেনা পাবলিক। তা সত্ত্বেও আমাকে খুন করানোর ব্যাপারে তোমার তো দেখছি উৎসাহের কমতি নেই!

যখন আবার কর্মকারের ওপর চোখ রাখলাম, তখন সে টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে। সম্ভবত নেশার পরিমাণ বিপদসীমা পেরিয়ে গেছে। সুতরাং 'সিসিল' ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। মনে-মনে ঠিক করলাম, অবন্তী কর্মকার সম্পর্কে আরও কিঞ্চিৎ খোঁজখবর আমার করা দরকার।

বাড়ির কাছে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে যখন নামলাম, রাত তখন সাড়ে ন'টা। আমাদের এই বাড়িটায় গোটাছয়েক বিশাল-বিশাল ফ্ল্যাট আছে—তার মধ্যে একটা আমি ও আমার স্ত্রী (দ্বিতীয় পক্ষের, অতএব সুন্দরী হতে বাধ্য) ইন্দিরা দখল করে আছি। ইন্দিরার প্রসঙ্গ যখনই ওঠে, তখনই 'সুন্দরী' শব্দটা ওর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ, নিখুঁত কোনও মানবীর জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি আমার স্ত্রী—ইন্দিরা দেবনাথ।

আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন, অত্যন্ত সাদামাঠা চেহারার মেয়েরা প্রচুর অধ্যবসায় এবং চেষ্টায় ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে চায়। এমনকী নিজেদের বুদ্ধিমতী বলে প্রমাণ করার মতো দুঃসাহসিক কাজে নামতেও তারা পেছপা হয় না। কিন্তু এর বিপরীতটাও বোধহয়

তেমনই সত্যি।

কারণ, ইন্দিরা পড়াশোনার সমস্ত ব্যাপারেই অস্বাভাবিকরকম নিরাসক্ত। যেহেতু ও সুন্দরী, সেহেতু দৈনিক খবরের কাগজে ন'মাসে ছ'মাসে একবার চোখ বোলালেও ওর সৌন্দর্যের অহঙ্কার কলঙ্কিত হয়। নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতেই দিনের চব্বিশটা ঘণ্টা রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো ওর চোখের সামনে পার হয়ে যায়।

সুদূর অতীতে স্কুলের মায়া কাটিয়ে বেরোনোর পর কলেজমুখো হওয়ার চেষ্টা ইন্দিরা আর করেনি। কারণ ও নির্বোধ নয়। শরীর মূলধন করে জীবিকা নির্বাহের চটুল পদ্ধতিটুকু ও বেশ অল্পদিনেই রপ্ত করে নিয়েছিল। এবং সেই কারণেই মনকে ভারাক্রান্ত করার সবরকম চেষ্টা থেকে ওর গভীর-গহন চোখজোড়া চিরতরে বিরত হয়েছে।

অবশ্য সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও ইন্দিরার আছে। ও জানে, ঠিক কোন সময়ে ওকে একাগ্র শ্রোতার ভূমিকা নিতে হবে, কখন 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলতে হবে, কখন হতে হবে নীরব সাক্ষী। এমনকী সময় বুঝে দু-এক চিলতে মোক্ষম হাসি ছুড়তেও ইন্দিরা দ্বিধা করে না। অর্থাৎ, কপট আগ্রহের এবং সমঝদারের সমস্ত রকম মারপ্যাঁচই ওর নখদর্পণে। সেই কারণেই কোনও তাত্ত্বিক আলোচনাতেও ইন্দিরা অপরিহার্য অংশীদার।

ভুলেও ভাববেন না, ইন্দিরাকে আমি অভিযুক্ত করছি। কারণ, বুদ্ধিমতী মেয়েদের ব্যাপারে আমি দ্বিতীয় আওরঙ্গজেব—দূরতম স্বপ্নেও তাদের আমি বিশ্বাস করি না। বিশেষত, তারা আমাকে মনে করিয়ে দেয় জাপানি 'বনসাই'-এর কথা। কারণ, নারী এবং বুদ্ধি—এই দুটো পরস্পরবিরোধী জিনিসের সহাবস্থান আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না। বুদ্ধিমতী মেয়েরা এক কথায় বনসাইয়ের মতো প্রকৃতি-বিদ্রোহিনী।

সুতরাং, ইন্দিরাকে একান্ত ওর মতন করেই আমি দেখতে ভালোবাসি। আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ভ্যান গগ, রেমব্রাঁ, রুবেন-এর রিপ্রোডাক্সনের মতোই ইন্দিরা দেবনাথ আমার ফ্ল্যাটের এক জীবন্ত শো-পিস। আশা করি এতক্ষণে আপনারা উপলব্ধি করেছেন, আমি সৌন্দর্যের পূজারি!

ভারী অদ্ভুত এবং আকস্মিকভাবেই আমার এবং ইন্দিরার চার চোখের প্রথম মিলন। বছরখানেক আগের ঘটনা। আমার যৌবনের যুবতী স্ত্রী ইরা মারা যাওয়ার প্রায় চার বছর বিরতির পর একটা 'পেশাদারি' প্রয়োজন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল এসপ্ল্যানেড এলাকার একটা ব্রটেলে (অর্থাৎ, ব্রথেল তথা হোটেল)। সেখানেই রিসেপশান কাউন্টারে বসে ছিল ইন্দিরা। যেন স্বপ্নের রাজকুমারের প্রতীক্ষায় সিন্ড্রেলা। আমি যে ওর জীবনের মহৎ দায়িত্ব নিয়ে হাজির হয়েছি, সেটা ওর এবং আমার উপলব্ধি করতে প্রায় মাসখানেক লেগেছিল। অতঃপর ইন্দিরার মতো একটা অবহেলিত হীরে তার প্রাপ্য জায়গা পেল—অধমের ফ্ল্যাটে মিসেস দেবনাথের ভূমিকায়।

আমি অবশ্য 'যতদিন না মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন করে' জাতীয় বাক্যাংশে বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু ইন্দিরা ভ্রমর-চরিত্রে অবিশ্বাসী এবং গীতার উপদেশে বিশ্বাসী হওয়ায় আমরা পরস্পরের সম্পর্ককে স্থায়ী করানোরই পরিকল্পনা নিলাম। এবং অনুগত ইন্দিরা

আমার দ্বিতীয় তরুণী ভার্যার আসন গ্রহণ করল।

ঘরে পা দিয়েই ইন্দিরাকে যথারীতি ওর ড্রেসিং টেবিলের সামনে আবিষ্কার করলাম।

'কী ব্যাপার? আজ এত সকাল-সকাল?' ইন্দিরার চোখ আয়নায় নিজের শরীরে স্থির।

'শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছে না—তাই।' ইন্দিরা তখন আলতো-পাঁচ-আঙুলে গালে ক্রিম ঘষছে।

উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, এসব সাজগোজে তোমার কতক্ষণ সময় লাগে বলো তো?'

ও চোখ তুলে তাকাল। আয়নার কাচে আমাদের চোখাচোখি হল।

'মিনিট দশ-পনেরো—তার বেশি নয়।'

'উঁহু, শুধু ক্রিম ঘষা নয়—আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কতক্ষণ লাগে জিগ্যেস করছি।'

'শাড়ি-টাড়ি সব নিয়ে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম 'হ্যাঁ, সব নিয়ে।'

ইন্দিরার মুখে গভীর চিন্তার ছায়া পড়ল। কয়েক সেকেন্ড পর ও জবাব দিল, 'কী জানি, ঠিক জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, এতে সারাটা দিনই আমি ব্যস্ত থাকি। কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায়, টেরই পাই না।'

'রোজ এই একই জিনিস নিয়ে পড়ে থাকতে তোমার বিরক্ত লাগে না?'

ইন্দিরা পেছন ফিরে ঘুরে তাকাল 'কই, না তো! সবসময়ই কিছু-না-কিছু করার থাকে। কখনও নেইল পলিশ, কখনও পাউডার, অথবা লিপস্টিক—' ওর চোখ আবার স্থির হল সামনের আয়নায় 'কিন্তু তুমিও তো কখনও বিরক্ত হও না, সতীশ?'

হঠাৎ একটা মানসিক ধাক্কা খেলাম : 'আমি? আমি কেন বিরক্ত হব? কোনও বুদ্ধিমান মানুষ কখনও একঘেয়েমির শিকার হয় না। তা ছাড়া আমার রোজকার কাজে যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে।'

'না, আমি বলছিলাম তুমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকো শুধুই তো ঘরে পায়চারি করে বেড়াও, দেওয়ালে টাঙানো ছবি অথবা টেবিলে বসানো পাথরের মূর্তি নিয়ে পড়ে থাকো—এতে তোমার বিরক্ত লাগে না? সারাটা দিন অলসভাবে কাটাতে তোমার ভালো লাগে?'

'ইন্দিরা, তুমি হয়তো জানো না, ভ্যান গগ পৃথিবীর অন্যতম সেরা শিল্পীদের একজন ছিলেন।' সংযত স্বরে আমার 'ঘরে পায়চারি' করার ব্যাখ্যা ওর সামনে তুলে ধরলাম।

'তাই বুঝি?'

বুঝতেই পারছেন, ইন্দিরা জীবনে ভ্যান গগের নামই শোনেনি!

ও শিশুসুলভ স্বরে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু তুমি কী করে জানলে?'

'এ ব্যাপারে পৃথিবীর তাবৎ সমালোচকেরা সম্পূর্ণ একমত।'

'কিন্তু তোমার কি সত্যিই ভ্যান গগের ছবি ভালো লাগে, না কি, যেহেতু সবাই বলছে, তাই তুমিও তাঁর ছবির প্রশংসা করছ? মানে ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার চেষ্টা করছ?'

এবার বেশ বিরক্ত হলাম। ইন্দিরার কাছ থেকে কখনও এমন আপাত-সরল অথচ ব্যঙ্গে অধ্যুষিত 'বচন' শুনিনি।

গম্ভীর স্বরে জবাব দিলাম, 'তুমি যে ভ্যান গগের ছবি আমার চেয়ে বেশি বোঝো, তা তো জানতাম না!'

'রাগ কোরো না, সতীশ। তোমার পছন্দ-অপছন্দের প্রতি আমি কটাক্ষ করছি না।' কয়েক মুহূর্ত পুঙ্খাক্ষি-দৃষ্টিতে আমাকে ব্যবচ্ছেদ করল ইন্দিরা 'কখনও তোমার স্বাধীনতায় আমি হাত দিইনি—দিয়েছি? আমি জানি, তোমার সাধারণ লোকের মতো দশটা-পাঁচটা চাকরি-বাকরির প্রয়োজন নেই, কারণ, তোমার স্বর্গত কোন আত্মীয় (হ্যাঁ, আত্মীয়ই বটে! স্বর্গে পাঠানো সেই এগারো জনকে আমি পরম আত্মীয়ই মনে করি) তোমাকে এক বিশাল সম্পত্তির মালিক করে গেছেন। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, তোমার কিছু-না-কিছু করা উচিত—একটা ভালো কোনও কাজ—যাতে তুমি কখনও একঘেয়েমির ফাঁদে না পড়ো!'

'কতবার বলব, ডার্লিং—আমার রোজকার কাজের একমাত্র অলঙ্কার বৈচিত্র্য!'

আমার কথা যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে ও বলে চলল, 'এই পৃথিবীতে তোমারও যে প্রয়োজন আছে, সেটা যেন তুমি রিয়ালাইজ করতে পারো। সেটাই কোনও মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

একইসঙ্গে বিরক্তি ও বিস্ময়ের চরম সীমায় পৌঁছলাম। বিরক্তির কারণ তো বুঝতেই পারছেন। বিস্ময়ের কারণ ইন্দিরার উপদেশের গভীরতা। তাহলে কি বুদ্ধির ব্যাপারে আমি ওকে কিছুটা আন্ডার এস্টিমেট করে ফেলেছি?

'এই পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন যে কতখানি, তা তুমি জানো না, ইন্দিরা। সত্যিই আমাকে ছাড়া এ পৃথিবী চলতেই পারবে না?

এবার ইন্দিরার কণ্ঠে ফুটে উঠল সান্ত্বনার সুর, 'অবশ্য আমার জীবনে তুমিই সবকিছু। তোমাকে ছাড়া জীবনকে আমি কল্পনাই করতে পারি না। কিন্তু এমন কোনও কাজ তোমার করা উচিত, যাতে লোকে তোমাকে মনে রাখে, তোমার প্রশংসা করে—।'

'যেমন?' সংযত সুরে জানতে চাইলাম : 'কী ধরনের কাজের কথা তুমি বলতে চাইছ?'

'ওহ্—আমি, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, সতীশ। কিন্তু এমন কিছু, যার গুরুত্ব জীবন-মরণের সমান।'

হেসে ফেললাম। 'সুলেখা ওয়াশেব্‌ল্ রয়্যাল ব্লু' কালির মতো সমস্ত রাগই নিমেষে ধুয়ে গেল আমার মন থেকে। জবাব দিলাম, 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে, ডার্লিং।'

সামনের টেবিলে পড়ে-থাকা রুমালে হাত মুছল ইন্দিরা। চোখে অযথাই সংশয়ের ছায়া পড়ল।

'সতীশ, আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ?'

ওর কাঁধে হাত রাখলাম 'তুমি যেমনটি, তোমাকে ঠিক তেমনটি করে দেখতেই আমি ভালোবাসি। আমি চাই না, আমার "ডার্লিং ইন্দু" বদলে যাক।'

ইন্দিরা হাসল—বিষণ্ণ হাসি।

'আমারও সেইরকমই মনে হয়েছিল—।'

আমি এবার পা বাড়ালাম রান্নাঘরের দিকে।

মিনিটপাঁচেক বাদে এক কাপ কফিতে ফুঁ দিতে-দিতে বসবার ঘরে ফিরে এলাম। ইন্দিরা পলকের জন্যে 'এত রাতে কফি খাওয়ার কোনও মানে হয়' দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার নিজের প্রসাধন পর্বে মন দিল।

আমি একটা সোফায় আয়েস করে বসে কফির কাপে চুমুক দিলাম। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে মনে-মনে নিজের পছন্দের তারিফ করলাম। নেহাত কপালজোরেই বছরচারেক আগে এই সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটটার সন্ধান পেয়েছিলেন, এবং এই দীর্ঘ চার বছরে এটা আমার সমস্ত আর্টিফ্যাক্টের একরকম সংগ্রহশালা হয়েই দাঁড়িয়েছে।

বাড়ির মালিকের যে ম্যানেজার, তার সঙ্গে সম্প্রতি আমার একটু মন-কষাকষি হয়ে গেছে। কারণ, সেই ভদ্রলোক তার ওপরওয়ালার নির্দেশে আমাকে ফ্ল্যাটের লিজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে হুকুম দিয়েছে। তার উদ্দেশ্যও যে মহৎ তা নয়। তার মালিকের ইচ্ছে, এই ফ্ল্যাটটাকে ভাগ করে তিনটে ছোট-ছোট ফ্ল্যাট তৈরি করা হোক। কিন্তু আমিও অল্প কথায় চিঁড়ে ভেজার পাত্র নই। স্রেফ মুখের ওপর 'না' বলে দিয়েছি। কারণ, আমার লিজে আইন-সংক্রান্ত কোনওরকম ফাঁক নেই এবং খুশি মতো সে-লিজ বাড়ানোর অধিকারও যে আমার আছে, তা বেশ স্পষ্ট করেই কাগজপত্রে লেখা আছে।

একদিন আমাদের এই আলোচনা (সোজা বাংলায়, ঝগড়া) এতই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, আমাকে 'প্রাণ থাকতে তা আমি হতে দেব না'-র মতো যাত্রা-টাইপ বক্তব্যও উচ্চারণ করতে হয়েছে।

এখন, এই মুহূর্তে, কফির কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে মনে হল, একমাত্র অবন্তী কর্মকারের ব্যাপারটা ছাড়া আমাকে মোটামুটি 'সুখী গৃহস্থ' বলা যেতে পারে।

শুধু একটা কাঁটাই মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল।

কী কারণে কর্মকার আমাকে খুন করতে চায়? টাকার জন্যে? উঁহু, আমার চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশি টাকা ওর আছে। প্রতিশোধ? কিন্তু কীসের প্রতিশোধ? হাজার চিন্তা করেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনওদিন ওর ক্ষতি করেছি বলে মনে পড়ে না। তাহলে?

তাহলে কি নারীঘটিত কারণ?

মনে-মনে সম্ভাবনাটাকে নাকচ করে দিয়ে মাথা নাড়তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আচমকা একটা মানসিক সংঘাত আমার মস্তিষ্কে বিপর্যয় ডেকে আনল।

কিন্তু এ-সম্ভাবনাটা নেহাতই কষ্টকল্পিত। এবং ঠিক তেমনই অযৌক্তিক।

অথচ তবুও...?

ইন্দিরাকে আমি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি। তা ছাড়া এরকম কোনও পরকীয়ার পরিকল্পনা ওর মাথায় আসবে বলে তো মনে...আমি ওকে সুখেই রেখেছি। কোনও জিনিসেরই অভাব বুঝতে দিইনি। যখনই মুখ ফুটে যা চেয়েছে, এনে হাতে তুলে দিয়েছি।

নাঃ, এ অসম্ভব। আমারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ইন্দিরা আর কর্মকার? কর্মকার আর ইন্দিরা? আপনমনেই ভেবে চললাম।

প্রণয়লীলা! তাও কিনা অবন্তী কর্মকারের সঙ্গে!

অবন্তীর না আছে চেহারা, না আছে ব্যক্তিত্ব। এমনকী সাধারণ ভদ্রতার আদব-কায়দা পর্যন্ত ও জানে না। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারেও নিস্পৃহ। তা সত্ত্বেও—।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি আপ্ত বাক্য স্মর্তব্য 'নারী জাতির মন, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'—অতএব বৎস, কর্মকার বলিয়া 'উয়ারে' নিষ্কর্মা ভাবিয়ো না।

বজ্রপাত

সুতরাং, পরদিন একটু সকাল-সকালই ঘর ছেড়ে বেরোলাম।

খুঁজে-পেতে যে-টিকটিকি-প্রতিষ্ঠানটি বের করলাম, সেটা আয়তনে বড়সড় হলেও আমাদের দেশের অলিখিত রীতি অনুযায়ী বেশ মনোযোগ সহকারেই মাছি তাড়াচ্ছে। কিন্তু আমি কুকুর পুষলে অ্যালসেশিয়ান পোষাতেই বিশ্বাসী—নেড়ি কুকুর নয়। অতএব মাছি তাড়ালেও সেটাকেই বেছে নিলাম তার সাজানো-গোছানো বহিরঙ্গের জন্যে।

সামনের কাউন্টারে বসা মেয়েটি আমাকে বসতে বলে জনৈক চোর-চোর চেহারার লোককে ডেকে নিয়ে এল। লোকটির নাকের নীচে মিলিটারি মোচ (গোঁফ নয়), কটা চোখ, ক্ষুদে কান (অর্থাৎ, ধুরন্ধর)। শুনলাম তার নাম শুভঙ্কর বর্মা এবং সে-ই মালিক। তার জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি আমার দিকে পড়তেই সংক্ষিপ্তভাবে বললাম, 'আমি চাই আমার স্ত্রীকে নজরে-নজরে রাখা হোক।'

বর্মা ব্যবসায়ীসুলভ সুরে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি কিছু সন্দেহ করছেন?'

'উঁহু। আমি শুধু ওকে চোখে-চোখে রাখতে চাই। এর বেশি আর-কিছু আপনার জানা প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' ঢোক গিলে হাসল বর্মা 'আপনি কি কোনও বিশেষ সময়ে মিসেস-এর ওপর নজর রাখতে বলছেন?'

'উঁহু, চব্বিশ ঘণ্টা।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল বর্মা 'কিছু মনে করবেন না—আমাদের বেশিরভাগ মক্কেলই পয়সা বাঁচাতে ভালোবাসেন। সেই কারণেই দিনের আট ঘণ্টা তাঁরা নিজেরাই নজর রাখার দায়িত্ব নেন।'

আমার স্যুটের ওপর একবার শকুন-চোখ চালিয়ে নিল সে। মনে হল, সন্তুষ্টই হল।

বলল, 'আমি তাহলে আট ঘণ্টার ডিউটিতে তিনজন লোক লাগিয়ে দেব। আর রোববারটার জন্যে তাদের না-হয় ওভারটাইম দিয়েই কাজ করাব—।'

বুঝলাম, বর্মা এরই মধ্যে আমার রক্ত চুষতে শুরু করেছে। অতএব বেশ রূঢ় স্বরেই জবাব দিলাম, 'যত হাজার লোক লাগে লাগুক, চব্বিশ ঘণ্টার কাজ আমার চাই।'

'আপনাকে তাহলে উইকলি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব।'

'না, রোজকার রিপোর্ট আমিই রোজ এসে নিয়ে যাব।'

বর্মার অফিস থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন সে কাগজ কলম নিয়ে লাভ-খরচের খতিয়ান কষছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে নেহাত খেয়ালবশেই জাদুঘরে (এই নিয়ে আঠেরোবার হল) ঢুকে পড়লাম। আধ ঘণ্টা পায়চারি করে রাস্তায় যখন বেরোলাম, বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। ভাবলাম, ইন্দিরার জন্যে একটা শাড়ি নিয়ে যাওয়া যাক—খুশি হবে।

অতএব যথা চিন্তা তথা কাজ। সটান ঢুকে পড়লাম চৌরঙ্গী রোডের ওপর একটা দোকানে। উপস্থিত সেল্‌স গার্লদের ওপর একপলক চোখ বুলিয়ে 'মিস চৌরঙ্গী' নির্বাচন করে ফেললাম এবং দৃপ্ত পদক্ষেপে সুন্দরীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু?' মিষ্টি কণ্ঠস্বর, এবং মাপা সুর।

'উড য়ু প্লিজ শো মি সামথিং ওয়ার্থ বাইং?'

'সার্টেইনলি—এদিকে আসুন।' কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল 'মিস চৌরঙ্গী'। অবাক চোখে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে ঝপ করে বলে বসল, 'আরে, মিস্টার দেবনাথ!'

'মাপ করবেন, আমি ঠিক...।'

'আমাকে চিনতে পারলেন না, তাই তো?' মেয়েটি হাসল 'তা না চিনতে পারারই কথা! কারণ আমাদের পরিচয় হয়েছিল মাত্র একবার—সেই ইন্দিরার বিয়ের সময়।'

'ওঃ হো, এবার মনে পড়েছে।' মুখে সমর্থন জানালেও মনের কন্দরে মেয়েটির পরিচয় তখনও হাতড়ে চলেছি—উঁহু, ইন্দিরার সঙ্গে কখনও একে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। যাই হোক, মুখে একটা পরিচিতের হাসি ফুটিয়ে তুললাম।

'আমার নাম সুনন্দা চক্রবর্তী।' বলে খিলখিল করে আবার হাসল ও : 'মানে বর্তমান নাম সুনন্দা সেন। সত্যি, বিয়ের পর এই নাম-পালটানো ব্যাপারটা ভীষণ বিশ্রী!'

'দেখুন, মিসেস সেন, আমি একটা শাড়ি কিনতে এসেছি।'

মেয়েটা যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। অদূরে দাঁড়ানো জনৈক ভিজে-বেড়াল চেহারার পুরুষকে দেখিয়ে বলল, 'আমার "ইয়ে"। এই মাসদুয়েক হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। ও এই দোকানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার—।'

'শাড়িটা জাপানি জর্জেট হলেই ভালো হয়।'

'একদিন যাব আপনার বাড়িতে, দেখে আসব ইন্দিরা কেমন সংসার পেতে বসেছে।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। শাড়িটা যেন নীল জমির ওপরে হয়।'

'ইন্দিরা স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত। পরে কিছুদিন আমরা একসঙ্গে চাকরিও করেছি। অবশ্য আমাদের তেমন বন্ধুত্ব কখনও হয়নি। কারণ, ইন্দিরা সবসময় পড়াশোনা নিয়ে থাকতেই ভালোবাসত—মানে একটু ইন্টেলেকচুয়াল টাইপের।'

আর থাকতে পারলাম না। হেসে ফেললাম।

'ইন্দিরা? ইন্টেলেকচুয়াল?'

সুনন্দা সেন সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল : 'ও তো ফিজিক্স না কী নিয়ে যেন বি. এসসি. পাশ করেছে। ফার্স্ট ক্লাসও পেয়েছিল। কলেজের মধ্যে ওরই নম্বর ছিল সবচেয়ে বেশি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'মিসেস সেন, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আপনি হয়তো অন্য কোনও ইন্দিরাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন—।'

'গুলিয়ে ফেলব? আপনি ইন্দিরা শর্মাকে (ইন্দিরার বিয়ের আগের নাম) আমাকে চেনাবেন!'

আমি চিন্তিতভাবে গালে হাত বোলালাম।

'ও কি সায়েন্স কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছে?'

'কীসের অ্যাডমিশন?'

'কীসের আবার, এম. এসসি.-র।'

ক্রমশ আমার রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ পেতে লাগল : 'মিসেস সেন, আপনি কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সুনন্দা যেন অবাক হল 'ইন্দিরা তাহলে য়্যুনিভার্সিটিতে ভরতি হয়নি?'

আমার ধৈর্যের সীমা প্রায় ছাড়িয়ে গেল। কোনওরকমে গলার স্বরকে স্বাভাবিক লয়ে রেখে জবাব দিলাম, 'মিসেস সেন, আমার স্ত্রী ইন্দিরা কলেজ-য়্যুনিভার্সিটি যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়িতেই কোনওদিন বই নিয়ে বসে না।'

সুনন্দা যেন থতমত খেয়ে গেল। মৃদু স্বরে বলে উঠল, 'আশ্চর্য! ইন্দিরা দিনরাত দুটো জিনিসের কথা আমার কানের কাছে উচ্চারণ করত : তার একটা টাকা, আর দ্বিতীয়টা লেখাপড়া। বলত, লেখাপড়া করতে ওর ভীষণ ভালো লাগে।'

'দেখুন মিসেস সেন, আপনার হয়তো কোথাও ভুল হচ্ছে—।'

আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সুনন্দা বলে উঠল, 'অসম্ভব! ও আমাকে বলেছিল, ওর বাবা-মা ওকে পড়াতে পারেনি। তাদের সে-ক্ষমতা ছিল না, তাই ইন্দিরা ঠিক করেছিল, ও এক বছর চাকরি করে তারপর কলেজে ভরতি হবে। পার্ট ওয়ান পাশ করে আবার চাকরি করবে, তারপর সে-টাকা দিয়ে আবার পড়বে। এইভাবে ও ডক্টরেট পর্যন্ত করবে!' সুনন্দা কয়েক মুহূর্ত আমার হতবুদ্ধি মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'আপনি ঠিক জানেন, ও য়্যুনিভার্সিটিতে ক্লাস করছে না?'

'করতে চাইলেও আমি তাতে রাজি হতাম না।' রূঢ় স্বরে পালটা জবাব দিলাম।

'হয়তো যখন আপনি বাড়ি থাকেন না, কাজে যান, তখন ও কলেজে ক্লাস করতে যায়।'

'আমি কোনও কাজ করি না।' কঠিন স্বরে বলে উঠলাম, 'বেশিরভাগ সময় আমি বাড়িতেই থাকি, এবং কোনওদিনই ইন্দিরাকে আমি কলেজে যেতে বা ফিরতে দেখিনি।'

'সত্যিই আমার অবাক লাগছে, মিস্টার দেবনাথ। ইন্দিরার জীবনে একমাত্র প্রিয় নেশা লেখাপড়া। তা ছাড়া ও ভীষণ একরোখা মেয়ে—যা চায় তা করবেই, কারও কথা শুনবে না, কারও বাধা মানবে না।'

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল সুনন্দা। তারপর বলল, 'জানেন, একবার ইন্দিরা এ-কথাও আমাকে বলেছিল, যে ওকে ওর খুশি মতো কাজে বাধা দেবে, তাকে ও খুন করতেও পেছপা হবে না।'

আমার শেষ যুক্তিকে সঙ্গে-সঙ্গে আঁকড়ে ধরলাম।

'এবার হাসালেন, মিসেস সেন! কলেজ যাওয়ার জন্যে কেউ কখনও মানুষ খুন করে বেড়ায় না।'

'আমারও তাই মনে হয়।' অসংলগ্ন অন্যমনস্ক স্বরে স্বীকার করল সুনন্দা সেন, 'কিন্তু তবুও যখন ইন্দিরা কোনও জিনিস চেয়ে পায়নি, তখন দেখেছি...' হঠাৎ থেমে গিয়ে ও বলে উঠল, 'মাঝে-মাঝে দেখবেন, ওর চোখ দুটো কেমন অ্যাবনরমাল হয়ে যায়, যেন এখুনি...শুনেছি ওর মায়েরও নাকি মাথায় একটু গোলমাল ছিল। ওইজন্যেই ইন্দিরার জেদকে কখনও আমি বাধা দিইনি।' হঠাৎই হাসল সুনন্দা 'ইন্দিরাকে আমার কথা বলবেন। বলবেন, একদিন মিস্টার সেনকে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, কী শাড়ি যেন বললেন? জর্জেট?'

শাড়িটার দাম দেওয়ার সময় মানিব্যাগ থেকে একটা কাগজ পড়ে গেল মেঝেতে। কাগজটা তুলে নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে তাকালাম—আমার গত মাসের ফ্ল্যাট-ভাড়ার বিল। এবং আরও একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল, (যেটা এতদিন আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল) আমার বাড়ির তথা ফ্ল্যাটের মালিক হলেন শ্রীযুক্ত অবন্তী কর্মকার। এতদিন এটা জানতে না পারার কারণ, আমার সমস্ত টাকা-পয়সার লেনদেনই গত চার বছর ধরে ওই সিড়িঙ্গে ম্যানেজারের সঙ্গেই হয়ে আসছে।

সুতরাং, একটা মজাদার সম্ভাবনা আমার মাথায় খেলে গেল। হয়তো ফ্ল্যাটের লিজ না ছাড়ার অপরাধেই কর্মকার আমাকে খুন করতে চায়।

হাস্যকর কল্পনা হলেও মনকে অস্বস্তিতে ফেলার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট।

ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক একটু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাতেই উপলব্ধি করলাম, আমি আপনমনেই হাসছি। তাই হাসির তাৎপর্য বোঝাতে ঝটপট বলে উঠলাম, 'কিছু না, হঠাৎই একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল।'

নিজের চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে বাইরের ঘরে কোট-প্যান্ট ছেড়ে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখলাম। তারপর ঘরোয়া পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার শ্রী

উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলাম।

হঠাৎই নজর পড়ল, আমার সামনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে বসবার ঘরের আয়না, এবং সেই আয়নার কাচে প্রতিবিম্বিত হয়েছে ঘরের এক আপাত-অদৃশ্য অংশ। কিছুক্ষণ অলস পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, বিভিন্নভাবে নিজের জায়গা বদল করে একসময় গোটা বসবার ঘরটাই আমার সামনের আয়নায় ধরা পড়ল।

ইন্দিরাকে আবিষ্কার করলাম একটা আরাম-কেদারায়।

এবং ও বেশ মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে!

শুধু বই-ই নয়, ইন্দিরার হাতে একটা পেনসিল ও হাঁটুর ওপর একটা বড় খাতা। থেকে-থেকেই ও ভুরু কুঁচকে খাতাটায় কীসব লিখে নিচ্ছে।

আমি পাশের একটা টেবিলে শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়াতেই টেবিলে রাখা চিনেমাটির ফুলদানিটা গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে—টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

ইন্দিরার পরবর্তী কার্যকলাপ ক্ষিপ্র কালো চিতাকেও হার মানায়। এক মুহূর্তেই পেনসিল, বই, খাতা সব উধাও হয়ে গেল চেয়ারের গদির নীচে। আমি মুগ্ধ চোখে আয়নায় ওকে দেখতে লাগলাম। ওর হাবভাব পলকেই স্বভাবসিদ্ধ শান্ত, উদাসীন, চিন্তাশূন্য ভঙ্গি ধারণ করল। শাবাশ, ইন্দিরা! ফিল্মে নামলে তোমার বি-এফ-জে-এ পুরস্কার পাওয়া কেউ ঠেকাতে পারত না।

'কে? সতীশ নাকি?' ও ডেকে উঠল।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, আমি!'

সেদিন সন্ধ্যায় ইন্দিরা কিছু কসমেটিক্স কিনতে বেরোতেই আরামকেদারার গদির নীচেটা হাতড়ে দেখলাম। খাতাটায় লেখা শতেক শব্দের মধ্যে গোটাকয়েক পরিচিত শব্দ পেলাম, ('নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন', 'প্লাজ্‌মা', 'সাইক্লোট্রন'—ইত্যাদি) যেগুলো কলেজে পড়ার সময় শুনেছিলাম।

পরের তিন-তিনটে সপ্তাহ মানসিক অশান্তির মধ্যেই কেটে গেল। অবন্তী কর্মকার যথারীতি আমাকে 'স্বর্গতি' করার পারিশ্রমিক নিয়ে আমারই সঙ্গে দরাদরি চালাতে লাগল এবং হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও তার এই অদ্ভুত 'বাসনার' কারণ সম্পর্কে সামান্যতম ইঙ্গিতও আমাকে দিল না।

এদিকে ইন্দিরাও স্বচ্ছন্দভাবেই ওর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে এগিয়ে চলল।

শুভঙ্কর বর্মার অফিসে বসে তার 'একবিংশতম' দৈনন্দিন রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গত কুড়িবারের মতই হতাশ হলাম : 'উঁহু, অস্বাভাবিক কিস্যু নেই।'

'ঠিকই বলেছেন।' বর্মা আমাকে সমর্থন জানাল : 'সন্দেহজনক কিছুই নেই। গত একুশ দিনে আপনার ম্যাডাম এমন কোনও পুরুষের সঙ্গে দেখা করেননি, যাকে আপনি আপনার ইয়ে...প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে পারেন।'

'সায়েন্স কলেজেও যায়নি?' আপনমনেই বিড়বিড় করে চললাম, 'তাহলে কি ও বাড়িতে বসে নিজে-নিজেই পড়াশোনা করছে?'

ভুরু তুলে তাকাল শুভঙ্কর বর্মা 'কী বললেন? সায়েন্স কলেজ?'

'নাঃ, কিছু নয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম : 'আমার মনে হয়, ইন্দিরার ওপর আর নজর রাখার কোনও প্রয়োজন নেই।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি জানাল সে 'আপনার ওয়াইফের যদি আদৌ কোনও গোপন লাভার থাকত, তাহলে এই একুশ দিনে আমরা তাকে ঠিক বের করে ফেলতাম, মিস্টার দেবনাথ। আমি এটুকু বলতে পারি, আপনার ওয়াইফ পুরোপুরি ক্লিন।'

আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে শুভঙ্কর বর্মা গলাখাঁকারি দিল 'অবশ্য আপনি যদি বলেন, তাহলে আমরা আপনার মিসেসের এগেইন্স্টে এমন সব প্রমাণের ব্যবস্থা করব যে, স্মুদ্লি যে-কোনও কোর্ট থেকেই ডিভোর্স পেয়ে যাবেন—।'

ন্যাকা-ন্যাকা মুখ করে ওর দিকে তাকালাম।

'তারপর কাকে বিয়ে করব? আপনার 'ইয়ে'-কে?'

বর্মা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি ওর অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধেবেলা অলসভাবে বসে অলস চিন্তায় ডুবে ছিলাম। পাশের স্টিরিওতে বেজে চলা ট্রিনি লোপেজের 'শেম অ্যান্ড স্ক্যান্ডাল ইন দ্য ফ্যামিলি' গানটা যেন আমার অবস্থাকেই ব্যঙ্গ করছে। অবন্তী কর্মকারের উদ্দেশ্য এখনও আমার কাছে অস্পষ্টই থেকে গেছে। অবশ্য সেই কষ্টকল্পিত ফ্ল্যাট ভাগাভাগির কারণটাকে আমি সযত্নে বাদ দিয়েছি। উঁহু, সামান্য একটা ফ্ল্যাটের জন্যে কেউ কখনও কাউকে খুন করে না—যেমন করে না কলেজে যাওয়ার জন্যে (সুনন্দা সেন, তোমার কল্পনা আমার ফ্ল্যাটের কল্পনাকেও হার মানিয়েছে!)।

আর সুন্দরী ইন্দিরা?

সত্যি কথা বলতে কি, বর্মার রিপোর্ট মারফত ওকে 'সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত' জেনে আমি খুশিই হয়েছি। কিন্তু ওর ওই লুকিয়ে-লুকিয়ে লেখাপড়া করা বন্ধ করতে হবে। এ নিয়ে শিগগিরই ওর সঙ্গে কথা বলব।

'তুমি কি চা খাবে?'

ইন্দিরা প্রশ্ন করতেই স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এলাম বাস্তবে।

'উঁহু—কফি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম 'তুমি চটপট ব্যবস্থা করো, আমি জামাকাপড় ছেড়ে এক্ষুনি আসছি।'

বাইরের ঘরে জামাকাপড় পালটে অভ্যাসবশে আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। গত তিন সপ্তাহে আমার এই পর্যবেক্ষণ-ক্রিয়ায় কোনওরকম ব্যতিক্রম হয়নি, এবং সময়ে-সময়ে বেশ লাভবানই হয়েছি।

লক্ষ করলাম, ইন্দিরা দু-কাপ কফি এনে টেবিলের ওপরে রাখল। আয়না ছেড়ে

ফিরে আসতে যাচ্ছি, একটা ছোট্ট ঘটনা আমার নজর কাড়ল।

ইন্দিরার হাতে একটা ছোট্ট সাদা পুরিয়া। ও সেটা খুলে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই আমার জন্যে রাখা কাপটায় উপুড় করে দিল। আমার বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টির সামনেই ও খালি পুরিয়াটা মুঠো করে টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। তারপর অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে বসল একটা চেয়ারে। ঠোঁটে ফুটে উঠল ঈষৎ বাঁকা হাসি।

ঘামে-ভেজা হাতের চেটো পায়জামায় মুছে নিজেকে সংযত করলাম। তারপর স্বাভাবিক পায়ে এগিয়ে গেলাম বসবার ঘরে।

ইন্দিরার মুখমণ্ডল রোজকার মতো সুন্দর, নিষ্পাপ, অভিব্যক্তিহীন। কিন্তু ওর চোখের তারায় একটা অদ্ভুত অস্থিরতা লক্ষ করলাম।

'এসো, তোমার কফি রেডি।' হাসি মুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল ইন্দিরা।

আমি বসলাম ওর মুখোমুখি। মাঝে শুধু একটা টেবিলের দূরত্ব।

'তোমার কফির জবাব নেই, ইন্দু ডার্লিং।' ওর নিটোল থুতনি দু-আঙুলে নেড়ে দিলাম। ও দুষ্টু হাসি হেসে চোখ নামাল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে তাকালাম কফির কাপের দিকে। নাঃ, খালি চোখে পাউডারের কোনও অস্তিত্বই চোখে পড়ছে না।

'আজ কোথাও বেড়াতে-টেরাতে গিয়েছিলে?' সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে ইন্দিরার নিষ্পাপ মুখটা আবছাভাবে ভাসতে লাগল।

'নাঃ, শুধু একটা উইগ কিনতে বেরিয়েছিলাম।' ওর চোখ আমার কফির কাপে।

আমার মনের বিক্ষুব্ধ, অশান্ত, দিশেহারা ঝঞ্ঝা তখন মস্তিষ্কে মাথা খুঁড়ে মরছে। অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! এবং অযৌক্তিক! শুধুমাত্র কলেজে যাওয়ার জন্যে কোনও মেয়ে কখনও স্বামীকে খুন করে না—আজ পর্যন্ত কোনওদিন করেওনি। কিন্তু তবুও...।

শুকনো ঠোঁটের ওপরে জিভটা বুলিয়ে বলে উঠলাম, 'ইন্দিরা, এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি হয়তো তোমার ব্যাপারে একটু বেশিরকম স্বার্থপর হয়ে পড়েছি।'

ইন্দিরার ভুরু কুঁচকে উঠল 'স্বার্থপর?'

'হ্যাঁ। কারণ, তোমাকে আমি নেহাত শো-পিস হিসেবেই এতদিন আমার ফ্ল্যাটে সাজিয়ে রেখেছি—।'

ওর মুখে ফুটে উঠল হালকা হাসি 'তুমি আমার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করোনি, সতীশ। তাতেই আমি খুশি।'

'তা ঠিক।' ওর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'কিন্তু তবুও আমার ভাবা উচিত ছিল তোমারও জীবন বলে একটা পদার্থ (পদার্থবিজ্ঞান?) আছে, মন বলে একটা জিনিস আছে। শুধু অলঙ্কার হয়ে শোভাবর্ধন করাটাই তোমার একমাত্র কাজ নয়। তাই ভাবছিলাম—।'

'কী?'

এবার সরাসরি ঠান্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

'তুমি কখনও কলেজে ভরতি হওয়ার কথা ভেবে দেখেছ?'

ইন্দিরার চোখে অস্বস্তির ছায়া পড়ল।

'হঠাৎ এ-কথা মনে হওয়ার কারণ?'

'এমনিই—' অনুভব করলাম, আমি ঘামতে শুরু করেছি : 'কাল-পরশু গিয়ে ভরতি হয়ে যাও—ভালোই হবে।'

ও সহজভাবে হাসল : 'এই প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ।'

'তাহলে এ-বছরই ভরতি হচ্ছ তো?'

'দিনকয়েক ভেবে দেখি।' তারপর ওর গলায় ফুটে উঠল খানিকটা যেন আদেশের সুর, 'কফিটা খেয়ে নাও, সতীশ।'

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। আশ্চর্য! এইমাত্র আমি ইন্দিরাকে কলেজে যাওয়ার অনুমতি এবং স্বাধীনতা দিলাম, তা সত্ত্বেও ও আমাকে খুন করতে চাইছে!

এবং সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার বিচারবুদ্ধি ঝলসে উঠল মনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে।

প্রচণ্ড নিঃশব্দ হাসিতে আমার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে গেল। এতদিন কী বোকার মতোই না আমি ইন্দিরার অদ্ভুত উদ্দেশ্যকে আমাকে খুন করার একমাত্র কারণ ভেবে মানসিক কষ্ট পেয়ে এসেছি! আশ্চর্য! অস্বাভাবিক স্নায়বিক চাপের মুহূর্তে মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধি যে এরকম বিশ্রীভাবে জট পাকিয়ে যায়, তা আমার জানা ছিল না।

ইন্দিরা আমাকে খুন করতে চায় পৃথিবীর সরলতম এবং আদিমতম কারণের জন্যে। ও আমাকে সরিয়ে আমার সম্পত্তির মালিক হতে চায়! সিম্প্‌ল!

এতদিনের ওলট-পালট পৃথিবীটা কয়েকটা পাক খেয়ে আবার নিজের মেরুদণ্ডে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আমার সুশৃঙ্খল চিন্তাশক্তির সমতা আবার ফিরে এল। চারপাশের সবকিছুই আবার হয়ে উঠল স্বাভাবিক। মনে পড়ল সুনন্দা সেনের কথা টাকা এবং লেখাপড়া—এই দুটো জিনিসই ইন্দিরা ভালোবাসে। আমি এতদিন ওর লেখাপড়ার ব্যাপারটাই ভেবেছি। টাকার কথাটা ভাবিনি।

এই কার্যকারণ আবিষ্কারের আনন্দে আমি কফির কাপটা প্রায় তুলে নিয়ে জিভে ঠেকাতে যাচ্ছিলাম, আচমকা পুরিয়ার কথাটা মনে পড়তেই অবাধ্য হাতকে মাঝপথে সামলে নিলাম।

পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে বেশ মজাই লাগল। আমি স্বচ্ছলভাবে থাকি বটে, কিন্তু সে-স্বচ্ছলতা আমার রোজকার আয়ের বিনিময়ে কেনা। অর্থাৎ, জমানো টাকা বলতে কিছুই আমার নেই—কোনদিনও ছিল না। এই মুহূর্তে মাত্র দশ হাজার টাকা আমার হাতের কাছে রয়েছে—এবং আমি জানি, শত করে বললেও ইন্দিরা সে-কথা বিশ্বাস করবে না।

আমার মনে হয়, ইন্দিরাকে অন্যমনস্ক করে কফির কাপ দুটো পালটাপালটি করে নেওয়াটা এমন কিছু অসম্ভব কাজ ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে-ইচ্ছে ত্যাগ

করলাম। কারণ, তাতে আমারই বিপদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। ইন্দিরার মৃতদেহের সুব্যবস্থা করার কোনও পরিকল্পনা আমি আগে থেকে ছকে রাখিনি, এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে 'হঠাৎ উদ্ভুত' বুদ্ধিতে ওর মৃতদেহের প্রতি উপযুক্ত 'সম্মান প্রদর্শন' করা রীতিমতো ঝঞ্ঝাটের কাজ।

ইন্দিরা সামনে ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল ওর কফির কাপ। ওর এই কাজের উদ্দেশ্য আমিও যেন কফির কাপ হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিই। সুতরাং, আর দ্বিধা না করে ওর নিঃশব্দ আদেশ মাথায় তুলে নিয়ে ওকে বাধিত করলাম।

বেশ কয়েকবার শুঁকেও কাপ থেকে বাদাম জাতীয় (আপনারা তো জানেন সায়ানাইডের বৈশিষ্ট্য!) কোনও গন্ধ না পেয়ে হতাশ হলাম। নিষ্পাপ মুখে ইন্দিরাকে প্রশ্ন করলাম, 'ইন্দু, তুমি কি আমাকে বিয়ে করে সুখী হয়েছ?'

'এ-কথা কেন বলছ? নিশ্চয়ই সুখী হয়েছি।' কফির কাপে চুমুক দিল ও। চাইল, আমিও ওকে অনুসরণ করি।

আমি কাপটা তুলে নিলাম ঠোঁটের কাছে। এবং পরমুহূর্তেই কাপটা নামিয়ে রেখে ঈষৎ গাঢ় স্বরে বললাম, 'আমিও তোমাকে পেয়ে সুখী হয়েছি, ইন্দু।'

হয়তো 'সুখী'-র চেয়ে 'পরিতৃপ্ত' শব্দটাই মানাতো ভালো। কারণ, বিয়ের পর ইন্দিরাকে পেয়ে আমি যে-আনন্দ ও গর্ব অনুভব করেছি, ঠিক সেই একই অনুভূতি আমার মনে দোলা দিয়েছে, যখন পিকাসোর একটা দুর্লভ ছবিকে আমি নিজের করে পেয়েছি। শিল্পসংগ্রহের এই নেশাটা বোধহয় আমার জন্মগত।

ইন্দিরার চোখের দৃষ্টি আমার কাপের দিকে।

আমি চেষ্টা করে হাসলাম 'জানো, ইন্দু, তোমাকে যখন বিয়ে করি, তখন আমার বয়স ঊনচল্লিশ এবং তার আগের চার-চারটে বছর আমি নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছি।'

ইন্দিরা গভীরভাবে শ্বাস নিল 'হ্যাঁ, জানি। আর এও জানি, আমি তোমার দ্বিতীয় পক্ষের বউ। কফিটা খেয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'এবং স্বাভাবিকভাবেই ইরা মারা যাওয়ার পর বহুদিন একা থাকার জন্যে আমার কিছু-কিছু অভ্যাস বদলে গেছে। বিশেষ করে কতকগুলো ব্যাপারে আমি ভীষণ সতর্ক... বলতে পারো সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছি।'

ওর চোখজোড়া আসন্ন উৎকণ্ঠায় কুঁচকে উঠল 'সন্দেহপ্রবণ?'

মুখে একটা অপরাধী-অপরাধী হাসি ফুটিয়ে চোখ নামালাম 'হ্যাঁ। কারণ, কোথায় তুমি একজন চব্বিশ-পঁচিশের সুন্দরী যুবতী, যার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়, আর কোথায় আমি একজন প্রায়-চল্লিশের প্রৌঢ়। অবশ্য—' ছোট্ট করে কেশে গলা পরিষ্কার করলাম 'টাকা-পয়সার অভাব আমার নেই। দু-হাতে ওড়ালেও বিশ বছরের আগে তা শেষ হবে না—।'

ইন্দিরার চোখ চকচকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা আমার নজর এড়াল না।

কফির কাপটা আমি তুলে নিলাম মুখের কাছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, যেন হঠাৎই

কিছু মনে পড়েছে এমনভাবে, আবার টেবিলে নামিয়ে রাখলাম।

ইন্দিরা দেবনাথ যে মনে মনে 'ইস' বলে আক্ষেপ করে উঠল, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় ওর ধৈর্য এখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে।

'সুতরাং, তোমার এবং আমার বিয়েটাকে যদি আমি....তোমার দিক থেকে উদ্দেশ্যমূলক বলে ভেবে থাকি, তাহলে তুমি আমাকে....দোষ দিতে পারো না—কারণ, আগেই বলেছি, খুব বড়লোকেরা এসব ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এইসব কথা ভেবেই আমি এতদিনেও আমার "উইল" পালটে উঠতে পারিনি।'

ইন্দিরা ঘাড় কাত করে তাকাল : 'উইল?'

মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালাম 'হ্যাঁ—উইল। আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই এখন রয়েছে আমার ভাইয়ের নামে!'

সত্যি কথা বলতে কি, উইল তো 'দূর অস্ত', কোনও ভাই-ই আমার নেই।

'কিন্তু আজ আমি সে-উইল পালটানোর ডিসিশান নিয়েছি। কারণ, তোমার এবং আমার সম্পর্ক এতদিনে পূর্ণতা পেয়েছে। আজ আমরা সুখী দম্পতি (ঠিক যেন কোনও বই থেকে মুখস্থ করা ডায়ালগ বলছি)। তাই ঠিক করেছি—' নিঃশব্দে হাসলাম 'এর পরদিন যখন উকিলের সঙ্গে দেখা করব, তখন আগের উইল পালটে আমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ তোমাকেই করে যাব।'

'নাটক' শেষ করে এবার কফির কাপের দিকে হাত বাড়ালাম।

ইন্দিরার পরমুহূর্তের ক্ষিপ্রতা একমাত্র শঙ্খচূড়ের ছোবলের সঙ্গেই তুলনীয়। এই দেখলাম ও টেবিলের ওপারে, আমার কাছ থেকে প্রায় ফুটপাঁচেক দূরে বসে আছে, আর নিমেষের মধ্যেই ওকে আবিষ্কার করলাম আমার ঠিক পাশটিতে। ওর সরু-সরু পাঁচ-আঙুল দৃঢ় মুঠিতে আমার হাতে-ধরা কাপটাকে আঁকড়ে ধরেছে।

'তোমার কফিটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। দাঁড়াও, আর-এক কাপ নিয়ে আসি।'

সুতরাং, কাপটাকে মাঝে রেখে শুরু হল আমাদের আঙুলের লড়াই।

'না, না, তার কোনও দরকার নেই। কফি ঠান্ডা করে খেতেই আমার ভালো লাগে। তাতে কফির স্বাদটা পুরোপুরি পাওয়া যায়।'

'এই অদ্ভুত যুক্তির কোনও মানে হয়!' ওর কণ্ঠে তিরস্কারের সুর, 'ঠান্ডা করে খেলে কফি তেতো লাগে, জানো না?'

ইন্দিরার পরের কাজটাকে ঠিক 'মৌলিক' বলা যায় না। কিন্তু ওই উৎকণ্ঠিত পরিস্থিতিতে মৌলিকত্বের চেয়েও সাফল্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। সুতরাং, ইন্দিরার কলাকৌশলে কফির কাপটা আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ল মেঝেয়। কাপটা ভেঙে গিয়ে কফি ছড়িয়ে পড়ল আমার গায়ে, ইন্দিরার শাড়িতে, টেবিলে এবং মেঝেতে।

'ইস—সব নষ্ট হয়ে গেল।' নিয়ম-মাফিক সুরে বলে চলল ও, 'আমারই দোষ।'

আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম 'দুঃখ করার কী আছে? সামান্য একটা কাপ তো মাত্র!'

মিনিটপাঁচেকের মধ্যে মেঝে পরিষ্কার করে কাপের ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়ে

গেল ইন্দিরা। রান্নাঘর থেকে আর-এক কাপ কফি নিয়ে এল আমার জন্যে।

ধোঁয়াটে কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে দুঃখ পেলাম এই কথা ভেবে ইন্দিরা আমাকে স্বর্গের রাস্তা দেখানোর আগেই ওর রাস্তা আমাকে তৈরি করতে হবে।

মিত্রপাত

পরদিন বিকেলে যখন আমার ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল, তখন সবে পাঁচটা বেজে মিনিটকয়েক পার হয়েছে। ইন্দিরা ঘরে নেই—মেয়েলি কেনাকাটায় বেরিয়েছে। সুতরাং আমিই দরজা খুলতে উঠলাম।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে চোখ মুছলাম। আবার তাকালাম। নাঃ, ভুল দেখিনি। দরজায় দাঁড়িয়ে বাড়ির খোদ মালিক অবন্তী কর্মকার।

আমার শরীরের প্রতিটি পেশি বিপদের আশঙ্কায় তৎপর হয়ে উঠল। হয়তো আমার সঙ্গে দর-কষাকষিতে পেরে না উঠে এবং টাকা বাঁচানোর তাগিদে অবন্তী কর্মকার নিজেই আমার পার্থিব দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটাতে এসেছে।

'মিস্টার দেবনাথ,' সংশয়ভরা স্বরে কর্মকার বলল 'আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলতে পারলে খুশি হতাম।'

হয়তো তার নাকের ওপর দরজা বন্ধই করে দিতাম, কিন্তু আমাদের ঠিকে কাজের মেয়েটা, শীলা, সেই সময়েই রান্নাঘর ছেড়ে আমার সামনে এসে হাজির হল।

'আমি তাহলে যাই, দাদাবাবু?' ও কুণ্ঠিত স্বরে বলল।

সেই মুহূর্তেই আমার মনে হল, একজন বিপজ্জনক সাক্ষীর কাছে ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর আমাকে খুন করার মতো বোকামি নিশ্চয়ই কর্মকার আর করবে না। কোনও বুদ্ধিমান হত্যাকারী এ ধরনের ভুল করে না—অন্তত আমি কখনও করিনি।

অতএব বলেই ফেললাম, 'শীলা, ইনি হচ্ছেন মিস্টার অবন্তী কর্মকার—এই ফ্ল্যাট-বাড়ির মালিক।'

এই আচমকা পরিচয়ের পালা কর্মকার ও শীলাকে যেন হতবুদ্ধি করে দিল। শীলা বোধহয় মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিছু একটা বলার জন্যে, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিলাম 'এখন তুমি যেতে পারো, শীলা। তোমার চেনা লোকদের বলতে ভুলো না যে, মিস্টার কর্মকারের সঙ্গে আজ তোমার আলাপ হয়েছে...' হাতঘড়ির দিকে একপলক চোখ রাখলাম '...বিকেল ঠিক পাঁচটা বেজে সতেরো মিনিটে, কেমন?'

শীলা চলে যেতেই হাতে হাত ঘষলাম। আহ্বান জানালাম কর্মকারকে : 'আসুন, মিস্টার কর্মকার, ভেতরে আসুন।'

মিনিটপাঁচেক পর সামনে কফির কাপ রেখে আমি ও কর্মকার বসবার ঘরে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছি, হঠাৎই কর্মকার হাসল। কোনও মানুষ কাউকে ভীষণভাবে অবাক করে দেওয়ার আগে যেরকম হাসে সেইরকম হাসি।

'মিস্টার দেবনাথ—' কর্মকার বলল, 'গত পাঁচ সপ্তাহ্ ধরে আপনাকে খুন করানোর জন্যে একটা লোকের সঙ্গে আমি রীতিমতো দরাদরি করেছি।'

রামো চন্দ্র! এত কাণ্ড করে শেষকালে এভাবে সব ফাঁস করে দেওয়ার কোনও মানে হয়!

কর্মকার অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে আমাকে আশ্বস্ত করল 'নিশ্চিন্ত থাকুন, মিস্টার দেবনাথ—আমাদের দর-কষাকষি এখনও শেষ হয়নি।'

'সুখী হলাম।' একটু জোরালো স্বরেই জবাব দিলাম।

কর্মকারের হাসি বিস্তৃত হল 'আমার মনে হয়, প্রথম থেকেই সব আপনাকে খুলে বলা ভালো। আপনি অমৃত বক্সীকে চিনতেন?'

হ্যাঁ, চিনি—ভালোভাবেই চিনি। কারণ, সে আমার মক্কেল ছিল। কিন্তু এই ঘটনায় আমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম এবং কোনওরকম ভুল যে আমার হয়নি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অতএব নির্বিকার মুখে জবাব দিলাম, 'উঁহু, এই প্রথম নাম শুনলাম।'

কর্মকার এবার খবরের কাগজের পঞ্চম পৃষ্ঠার খবর পড়ার মতো করে বলে চলল, 'বছরদুয়েক আগে অমৃত বক্সীর ওয়াইফ রূপা মারা যায়। তাকে খুন করা হয়। প্রথমে পুলিশ বক্সীকেই সন্দেহ করেছিল। তদন্তে জানা গেছে, ওদের স্বামী-স্ত্রীর রোজকার ঝগড়াঝাঁটির কথা পাড়াপড়শিরা প্রায় সকলেই জানত। তা ছাড়া অমৃতর ওয়াইফ অমৃতকে সামান্য একটা মাসোহারা ছাড়া কিছুই দিত না। এখানে বলা দরকার, রূপাদের পরিবার শহরের পয়লা নম্বরের বড়লোক, অথচ অমৃতর অবস্থা ছিল "দিন আনে দিন খায়"।'

হঠাৎ খেয়াল করলাম, আমি সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে অবন্তী কর্মকারকে সমর্থন জানাচ্ছি। সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে থেমে গেলাম।

'কিন্তু অমৃতর ছিল এভারেস্ট-হাই অ্যালিবাই। কারণ, খুনের সময় সে বাড়ি থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে জনা-পনেরো লোকের সঙ্গে একটা পার্টিতে হাজির ছিল।'

নিশ্চয়ই। ভাবতে বেশ তৃপ্তি পেলাম। ব্যাপারটা এইভাবেই সাজানো হয়েছিল।

'এই ঘটনায় অমৃত প্রচণ্ড একটা মেন্টাল শক পায়।' কর্মকার বলে চলল, 'ও ভীষণভাবে ডিপ্রেস্‌ড হয়ে পড়ে।'

হতাশা নয়, অনুশোচনা। মনে-মনে কর্মকারকে শুধরে দিলাম।

'যখন ঘটনাটা ঘটে, তখন আমি অমৃতর ঘরে হাজির ছিলাম।'

চকিতে সোজা হয়ে বসলাম 'মিসেস বক্সীর খুনের ঘটনা?'

'না। যখন অমৃত আত্মহত্যা করে, তখন।'

'ও।' আশ্বস্ত হয়ে বললাম।

'আমি ছিলাম অমৃতর একমাত্র ক্লোজ ফ্রেন্ড। ওর ওয়াইফ মারা যাওয়ার পর আমি বহুবার, বহুরকমে ওকে সান্ত্বনা দিয়েছি, কিন্তু তার বেশি কিছুই আমার করার ছিল না।' দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল কর্মকার 'একদিন ওর বাড়িতে বসে আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অমৃত হঠাৎই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, ও হয়তো জামাকাপড়

পালটাতে গেছে বাইরে বেরোবে বলে। কিন্তু তার পরেই একটা গুলির আওয়াজ পেলাম। এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটে যাবে, আমি ভাবিনি। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গেলাম ওর শোওয়ার ঘরে। দেখি, একনদী রক্তের মাঝে ও পড়ে রয়েছে। সে এক হরিব্‌ল সাইট!'

'মৃত্যুর দৃশ্য হরিব্‌লই হয়।' দার্শনিক মন্তব্য করলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'মিস্টার বক্সী কি তখন মারা গেছেন?'

কর্মকার বিষণ্ণ হাসি হাসল 'না, পুরোপুরি মারা যায়নি।'

আমি অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসলাম।

'কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অমৃত মারা গেল। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে ও ফিসফিস করে কয়েকটা কথা উচ্চারণ করে।' একইসঙ্গে কর্মকারের স্বর নাটকীয়ভাবে নিচু পরদায় নেমে এল, 'অমৃত বলল, "অবন্তী, আমিই রূপাকে খুন করেছি"।'

'কিন্তু তা কী করে হয়? মিস্টার বক্সী তো খুনের সময়—।'

'অমৃতর ওই শেষ কথা নয়।' আমাকে বাধা দিল অবন্তী কর্মকার : 'ও ফিসফিস করে একটা নম্বর উচ্চারণ করে এক দুই এক সাত।'

আমার কেমন শীত-শীত করে উঠল। কারণ, এই নম্বরটা আমারই বক্স নম্বর।

'আপনি ঠিক শুনেছেন?' আগ্রহী সুরে জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ। শুনতে আমার ভুল হয়নি।'

'আর কিছু?' সতর্ক স্বরে প্রশ্ন করলাম।

'না। শুধু এই ক'টা কথা "আমিই রূপাকে খুন করেছি। এক দুই এক সাত"।'

হঠাৎই আর-এক কাপ কফির তেষ্টা পেল। উঠে গেলাম রান্নাঘরে।

ফিরে এসে কর্মকারকে বললাম, 'আপনি পুলিশকে ব্যাপারটা জানাননি?'

কর্মকার মাথা নাড়ল : 'না। আমি তো আগেই বলেছি, অমৃত আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল। তা ছাড়া সেই সময়ে আমি কনভিন্সড্‌ ছিলাম, ওর পক্ষে রূপাকে খুন করা ইম্‌পসিব্‌ল। আমার মনে হয়েছিল, অমৃতর শেষ কথাগুলো নিছকই প্রলাপ মাত্র। হয়তো ওয়াইফকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি বলে সে অপরাধবোধের শিকার হয়ে পড়েছিল, আর সেই কারণ থেকেই ওই প্রলাপের জন্ম। সুতরাং, এইসব কথা ভেবে আমি পুলিশে খবর দেওয়া দরকার মনে করিনি। তাতে অমৃত বক্সীর সুনামটুকু শুধু নষ্ট হত।'

কর্মকারের কথার মধ্যে কয়েকটা শব্দ যেন আমার কানে বাজতে লাগল। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে-শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করলাম, 'সেই সময়ে আপনি কনভিন্সড্‌ ছিলেন?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়ল অবন্তী কর্মকার 'সেই সময়ে আমি ভেবেছিলাম, অমৃতর পক্ষে রূপাকে খুন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বছরখানেক আগে হঠাৎই আমার মনে হল, অমৃত হয়তো ওর ওয়াইফের মৃত্যুর জন্যে সত্যি-সত্যিই দায়ী হলেও হতে পারে— ডিরেক্টলি না হলেও অন্তত ইনডিরেক্ট্‌লি। সে হয়তো রূপাকে খুন করার জন্যে কোনও

কিলারকে ভাড়া করেছিল।'

সত্যি, আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। এরকম যুক্তি-খেলানো মন আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি। তিক্তভাবে নিজের অদৃষ্টকেই দোষারোপ করলাম। পুরো রহস্যটা উদ্ঘাটন করতে আপনার মাত্র এক বছর সময় লাগল!

'তারপর নিশ্চয়ই আপনি পুলিশে গেলেন?'

কর্মকার যেন ঈষৎ লজ্জা পেল। বলল, 'না। কারণ, ততদিনে অমৃত মারা গেছে এক বছরের ওপর হয়ে গেছে। সুতরাং, পুলিশ আমাকে বিনা প্রশ্নে সহজে রেহাই দিত না। আর সুবিচারের পথে বাধা দেওয়ার জন্যে আমাকেই হয়তো দায়ী করত।'

'হ্যাঁ, আপনার ভয়টা নেহাত বেসলেস নয়।' বিড়বিড় করে বললাম।

'কিন্তু ওই ১২১৭ নম্বরটা আমার মনে খচখচ করতে লাগল। অবশেষে একদিন...' থেমে একটু দম নিল অবন্তী কর্মকার 'পোস্ট অফিসে চিঠি ফেলতে গিয়ে আচমকা একটা পসিবিলিটি আমার মনে ঝিলিক মেরে গেল ১২১৭ নম্বরটা কোনও বিজ্ঞাপনের বক্স নম্বর নয়তো?'

এক ঢোকে বেশ কিছুটা কফি গিলে ফেলায় বিষম লেগে কেশে উঠলাম। কাশির ঝোঁক থামলে রুমাল বের করে মুখ মুছতে লাগলাম। তখনই মনে পড়ল, কর্মকারকে আমি দ্বিতীয়বার কফির জন্যে অনুরোধ করিনি।

অনুরোধ জানাতেই সে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল। তারপর বলে চলল, 'সুতরাং এইবার আমি সম্পূর্ণ নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করলাম। যদি অমৃত সত্যি-সত্যিই কোনও "ভাড়াটে খুনে"র হেল্প নিয়ে থাকে, তাহলে ওদের যোগাযোগ এবং লেনদেন সম্ভবত চিঠিপত্রেই হয়েছে। অমৃত বাড়িতে আনন্দবাজার রাখত। সেই পুরোনো কাগজের টাল ঘেঁটেঘুঁটে আমি একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। এই দেখুন—' বলে কোটের পকেট থেকে একটা কাগজের কাটিং বের করল কর্মকার। তাতে লেখা:

ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্যে যোগাযোগ করুন। বক্স নং—১২১৭

বিজ্ঞাপনটা বলা বাহুল্য আমারই দেওয়া। কিন্তু তবুও অভিনয়ের খাতিরে ওটা হাতে নিয়ে পড়তে হল, ছোট্ট করে একটা 'হুম' শব্দও করতে হল।

'আমার ধারণা, অমৃত হয়তো কারও কাছে এই বিজ্ঞাপনের সন্ধান জানতে পারে এবং নিজে চিঠি দিয়ে সেই নেপথ্য-ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে।' কর্মকার দৃঢ় স্বরে বলল।

'তখন নিশ্চয়ই পুলিশে গেলেন?'

অবন্তী কর্মকার আবার লজ্জিতভাবে হাসল 'না, যাইনি। কারণ অমৃত মারা যাওয়ার পর তখন দেড় বছর কেটে গেছে। সুতরাং পুলিশি ঝামেলার ভয়টাও সেই সঙ্গে দেড়গুণ হয়েছে।'

আর এইসব ভদ্রসন্তানরাই কোনও মার্ডার-ফার্ডারের ব্যাপারে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সমালোচনা করে! কথাটা ভেবে রীতিমতো দুঃখ পেলাম।

অবন্তী গভীরভাবে শ্বাস নিল 'কিন্তু তাই বলে আমি তো আর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না! সুতরাং আমি এক বিপজ্জনক পরীক্ষায় হাত দিলাম। যেই ভাবা সেই কাজ! একটা চিঠি সরাসরি ওই বক্স নম্বরে পাঠিয়ে দিলাম—স্বভাবতই একটা খুনসংক্রান্ত সমঝোতার জন্যে।'

'তারপর?' তার পর কী হয়েছে সেটা আমি কর্মকারের চেয়ে ভালোই জানি।

'দেখলাম, আমার অনুমানই ঠিক।' অবন্তী কর্মকার গর্বিত স্বরে জবাব দিল, '১২১৭ নম্বরটা এমন একটা লোকের—যাকে আপনি সহজেই প্রফেশন্যাল কিলার বলতে পারেন।'

আমি ঠোঁট বেঁকিয়ে মন্তব্য করলাম, 'কিন্তু আমাকেই শিকার হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণটা দয়া করে খুলে বলবেন?'

কর্মকার হাসল, 'সত্যি কথা বলতে কি, সারা পৃথিবীতে আমার কোনও শত্রু নেই। তাই দিনের পর দিন ভেবেছি ভিক্‌টিম হিসেবে কাকে আমি বেছে নেব। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়েই হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল আপনার নামটা।'

'আমি আপনাকে চিনি না, জানি না,' একদৃষ্টে কর্মকারের অভিব্যক্তি লক্ষ করতে লাগলাম 'কোনওদিন আপনার কোনও ক্ষতিও করিনি। তাহলে কী কারণে—।'

কর্মকার চাপা স্বরে হাসল 'ধীরে, মিস্টার দেবনাথ, ধীরে। আপনি আমার সেরকম কোনও ক্ষতি করেননি ঠিকই, কিন্তু একটা বিষয়ে আমাকে একটু অসুবিধেয় ফেলেছেন। আমি এই বাড়ির ছ'-ছ'টা ফ্ল্যাটকেই ছোট-ছোট ফ্ল্যাটে ভাগ করতে চাই। এ পর্যন্ত সবাই আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে—একমাত্র আপনি ছাড়া।'

'যেহেতু জনৈক ভদ্রলোক তার ফ্ল্যাট ছাড়তে রাজি নন, সেহেতু আপনি তাকে খুন করবেন?' বেশ উষ্মা প্রকাশ পেল আমার কঠিন স্বরে : 'আপনার মতো একজন সম্মানিত, শিক্ষিত ব্যক্তি যে এ ধরনের নৃশংস, অমানুষিক চিন্তা করতে পারে তা আমার জানা ছিল না।'

মুখ দিয়ে বিচিত্র এক 'চুকচুক' শব্দ করে আমার রাগ ঠান্ডা করতে চাইল অবন্তী : 'রাগ করবেন না, মিস্টার দেবনাথ। আমার এই পরিকল্পনা ছিল শুধু "পরিকল্পনা" মাত্র। তাকে বাস্তবায়িত করার কোনওরকম ইচ্ছে আমার ছিল না।'

এবার অবাক হলাম। কর্মকার বলে কী? কিন্তু এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তাকে করলাম না। বরং মুখে একটা কাষ্ঠ মার্কা হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলাম, 'যাক, শুনে সুখী হলাম।'

'আমি শুধু চেয়েছিলাম সেই অচেনা কিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। চেয়েছিলাম খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে সেই বক্স নম্বরের মালিককে আবিষ্কার করতে। কিন্তু—' মাথা নাড়ল কর্মকার 'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার পরিকল্পনায় কাজ হয়নি।'

মনের আনন্দ ও স্বস্তিকে চেপে রাখতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। কারণ, প্রথমত দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই আমার পক্ষে সেই কাগজের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়ত আমার নিজের রোজকার কাজকর্মও অঢেল। শুধু দুপুরে ঘণ্টাখানেক আর সন্ধেবেলা তিন ঘণ্টার বেশি সময় আমি দিতে পারিনি। কিন্তু কোনওদিনও তাকে আমি ওইসময়ে চিঠি নিতে আসতে দেখিনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কর্মকার 'আমি দরাদরির ভান করে চিঠিপত্রের যোগাযোগ চালিয়ে গেছি একমাত্র এই কারণে, কিন্তু...' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

কর্মকারের অকৃতকার্যতায় আমার মনে করুণা হল। অতএব গায়ে পড়েই সহানুভূতি ঘেঁষা উপদেশ দান করলাম।

'আপনি পুলিশের সাহায্য নিতে পারতেন। ওরা দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ওই বক্স নম্বরের সামনে নজর রাখতে পারত!'

'না,' ক্লান্তভাবে বলল অবন্তী, 'আগেই তো আপনাকে বলেছি, তখন ওদের কাছে আমাকে সবরকম প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হত। আর তা ছাড়া, মনে করুন যদি অঘটন কিছু একটা ঘটে যায়, তখন তার দায়িত্ব নেবে কে? যদি সেই জহ্লাদ সন্দেহের বশে ওই বক্স নম্বরটা বাতিল করে দেয়, তাহলে? তখন আমাকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আরও হাজারটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।'

কফির স্বাদে মোলায়েম নিশ্চিন্ততা অনুভব করলাম।

'অর্থাৎ আপনি হেরে গেছেন?'

'হুঁ,' ঘাড় নাড়ল অবন্তী—একটু কর্কশ স্বরে বলল, 'তবে আপাতত।'

কর্মকারের পরবর্তী অভিব্যক্তি আমাকে স্পষ্টই সাবধান করে দিল যে, সে আবার আমাকে চমকে দিয়ে মজা লুটতে চলেছে। এবং হলও তাই।

অদ্ভুতভাবে মুচকি হেসে চোখ নামাল সে 'কিন্তু এতদিনে আমি সমস্ত টানাহেঁচড়া বন্ধ করে একটা হেস্তনেস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সেই কিলারের পারিশ্রমিকের দাবি মেনে নেব এবং তাকে কাজে নামার নির্দেশ দেব।'

'কী বলছেন কী? আপনার কি মাথা—।'

'না, খারাপ হয়নি।' আমার অধৈর্য-অবিশ্বাসী সুরকে বাধা দিয়ে চোখ তুলে তাকাল অবন্তী 'কাজে আমি তাকে নামতে বলব, কিন্তু এ-কথা আমি একবারও আপনাকে বলিনি যে, সে তার কাজ কমপ্লিট করতে পারবে।'

'তার মানে?'

'একটু পরেই সেটা বুঝতে পারবেন।' আবার হাসল অবন্তী, মুচকি হাসি 'জহ্লাদসাহেব আমার কাছ থেকে পনেরো হাজার টাকা চেয়েছেন আপনাকে খুন করার জন্যে। টাকার পরিমাণটা আমার কাছে বেশি ঠেকলেও আমি দেব।'

'হয়তো তার কাছে পনেরো হাজার টাকাটা বেশি বলে মনে হয়নি। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে।' উদাসীনভাবে দার্শনিক সাজলাম আমি।

'কিন্তু তার বদলে কয়েকটা বিষয়ে সেই কিলারকেও আমার নির্দেশ মেনে চলতে

হবে। যেমন, খুনটা করতে হবে আমারই ঠিক করা সময়ে, এবং কোথায় করতে হবে তাও আমি বলে দেব—।'

'অর্থাৎ, স্থান-কাল-পাত্র সবই আপনার পছন্দমতো হওয়া চাই।' হেসে বললাম।

'আচ্ছা, এই বসবার ঘরটা কীরকম হয় বলুন তো? আমার তো মনে হচ্ছে খুন হওয়ার পক্ষে এটা বেশ আদর্শ ঘর।' ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল অবন্তী কর্মকার।

'হ্যাঁ।' সমর্থন জানালাম 'তা বলতে পারেন—।'

স্পষ্টই বুঝলাম, অবন্তী ইতিমধ্যেই সমস্ত পরিকল্পনা ছকে রেখেছে।

'সেই বিশেষ রাতে আপনি যাতে ফ্ল্যাটে একা থাকেন সে-ব্যবস্থা করবেন। এই বসবার ঘরেই অপেক্ষা করবেন আপনি। রাত ঠিক সাড়ে আটটায় খুনি আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকবে এবং চুপিচুপি আপনার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াবে।'

'আপনি তাকে আমার ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই?'

'যদি আপনি আমাকে চাবিটা ধার দেন—।'

'নিশ্চয়ই দেব।'

'তারপর আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে সেই খুনি আপনার মাথায় হিট করবে।'

'সত্যি কথা বলতে কী, মিস্টার কর্মকার, গুলি খেয়ে মরাটাই আমি পছন্দ করব।'

'না, আমি চাই আপনাকে যেন মাথায় হিট করেই খুন করা হয়। কারণ, যদি খুনি বন্দুক ইউজ করে, তবে আমি লুকোনো জায়গা থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই হয়তো কোনও অঘটন ঘটে যেতে পারে।'

'ও, আপনি তাহলে লুকোনো জায়গা থেকে সেই খুনির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল কর্মকার 'যেই মুহূর্তে সে আঘাত হানার জন্যে হাত তুলবে, সেই মুহূর্তেই আমি রিভলভার নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলব। আপনার ঘরে লুকোনোর সেরকম কোনও জায়গা আছে?'

'আছে, ওই দরজাটার পেছনে।' আঙুল দিয়ে দেখালাম ভাঁড়ার ঘরের ছোট্ট দরজাটার দিকে।

সামনে ঝুঁকে পড়ে কর্মকার বলল, 'তাহলে আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি?'

আমাদের এতসব আয়োজন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে যাচ্ছে ভেবে দুঃখ পেলাম। কিন্তু তবুও পনেরো হাজার টাকা পকেটস্থ করার এমন প্লাটিনাম-সুযোগ বোধহয় আর আসবে না। সুতরাং জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই রাজি। আপনি সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

শত্রুপাত

পরের সপ্তাহে কর্মকার এবং বক্স নম্বর ১২১৭ একটা সমঝোতায় পৌঁছল। আমি যথারীতি পনেরো হাজার টাকার পুরোটাই অগ্রিম দাবি জানালাম এবং দশ, বিশ ও পাঁচ টাকার নোট ছাড়া অন্যান্য নোট যে আমি ভীষণ অপছন্দ করি, সেও জানাতে ভুললাম না।

আমার ভয় ছিল, বড় নোটের ক্ষেত্রে কর্মকার হয়তো তাদের নম্বরগুলো কাগজে টুকে রাখতে পারে এবং পরে অবস্থা বুঝে সেই নম্বরের লিস্টটা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

টাকা পেতে বেশি দেরি হল না।

'বিশেষ' দিন হিসেবে একটা মঙ্গলবারকে বেছে নিয়ে অবন্তী কর্মকার এসে হাজির হল আমার ফ্ল্যাটে—ঠিক সন্ধে সাতটায়।

সাতটার সময়েই তার আসার কথা ছিল।

আমি ওকে বসবার ঘরে নিয়ে গেলাম 'আমি তো ভাবছিলাম, আপনি বোধহয় আর এলেনই না।'

কর্মকার হাতঘড়ির দিকে তাকাল 'কেন, আমি তো ঠিক সময়েই এসেছি!'

আমি যথাক্রমে তাকালাম আমার হাতঘড়ি, অদূরের টেবিল-ঘড়ি ও সবশেষে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে। তিনটে ঘড়িতেই সময় তখন সাড়ে সাতটা। বললাম, 'আপনার ঘড়ি আধঘণ্টা স্লো আছে।'

বলা বাহুল্য, কর্মকার আমার সাজানো সময়ের ফাঁদে পা দিল। সে বুঝল না, তিনটে ঘড়িকেই আমি আধঘণ্টা করে এগিয়ে দিয়েছি। সুতরাং, বিনা বাক্যব্যয়ে হাতঘড়ির সময়কে কর্মকার আধঘণ্টা এগিয়ে দিল। তারপর প্রশ্ন করল, 'ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই তো?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আছে—।'

কর্মকার প্রতিবাদের সুরে শুরু করল, 'কিন্তু আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি—।'

'ভয় নেই। আমার স্ত্রী এখুনি বেরিয়ে যাবে। সম্ভবত ও কিছু কেনাকাটা সেরে কোনও সিনেমা দেখতে যাবে—রাত সাড়ে এগারোটার আগে ফিরবে না। আশা করি এগারোটার মধ্যেই আমাদের সমস্ত কাজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনি রিভলভার এনেছেন তো?'

পকেট থেকে নীরবে ০.৩৮ স্পেশালটা বের করল অবন্তী। দেখে মনে হল, রিভলভারটা হাতে নিয়ে সে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে।

'এটা আমার বাবার রিভলভার ছিল।'

হঠাৎই বসবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল ইন্দিরা। প্রসাধন শেষ করে ও তখন বাইরে বেরোনোর জন্যে তৈরি।

'এই যে, ইন্দু—ইনি হলেন মিস্টার অবন্তী কর্মকার—আমাদের এই বাড়ির মালিক।'

কর্মকার আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। ইন্দিরার দিকে চোখ পড়তেই ওর আচমকা শ্বাস টানার শব্দ আমার কানে এল।

ইন্দিরা মাপা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলাম।'

আমি ইন্দিরার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। নিচু গলায় বললাম, 'ইন্দু, আমরা

কিছুক্ষণ একটা আলোচনায় ব্যস্ত থাকব। তুমি তাহলে এসো।'

ও চলে যেতেই বসবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলাম। ঘরে শুধু আমি আর কর্মকার। কানে এল ইন্দিরার সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ।

'আপনার ওয়াইফ বিউটিফুল, মিস্টার দেবনাথ।' চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল অবন্তী—যেন ও ভীষণরকম একটা ধাক্কা খেয়েছে। তারপর ঘোর কাটতেই ও ভাঁড়ার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই কর্মকার বেরিয়ে এল। বলল, 'ভাঁড়ার ঘরের দরজাটা আমি ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে রাখব, যাতে সর্বক্ষণ আপনার এবং আপনার পেছনের ওই দরজাটার দিকে নজর রাখতে পারি। আপনি টেবিলের কাছেই বসছেন তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি একমুহূর্তের জন্যেও আমার ওপর থেকে নজর সরাবেন না।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার জীবন-মরণ বলতে গেলে আমার ওপরেই নির্ভর করছে। সুতরাং, অন্যমনস্ক হয়ে আপনার বিপদ ডেকে আনব না।'

'হুঁ, ব্যাপারটা একরকম তাই।' আনমনাভাবেই বললাম। তারপর 'আমার পরিকল্পনা'কে বাস্তবায়িত করার প্রথম পদক্ষেপ রাখলাম কর্মকারের সামনে 'এক কাপ কফি চলবে নাকি? তাতে মেজাজটা ঠিক থাকবে। তা ছাড়া "শ্রীমান ১২১৭" তো সাড়ে আটটার আগে আসছেন না। তাহলে শুধু-শুধু এতক্ষণ ধরে আপনি ভাঁড়ার ঘরে মুখ গুঁজে বসে থেকে কী করবেন?'

অতএব কর্মকার আর আপত্তি করল না।

মিনিটকয়েকের মধ্যেই ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে বসবার ঘরে ফিরে এলাম। টেবিলে একটা কাপ নামিয়ে রেখে দ্বিতীয়টা ঠোঁটে ছোঁয়ালাম।

'আসুন—' দাঁড়িয়ে থাকা অবন্তীকে চেয়ারে বসতে আহ্বান জানালাম। নিজেও বসলাম।

কর্মকার বসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় একরকম জোর করেই ওকে চেয়ারে বসালাম। না, ওর আরামের জন্যে আমার বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি চাই না ঘুমের ওষুধ মেশানো কফি খেয়ে ও মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নাক-মুখ ভেঙে বসে থাকুক। তাহলে সেই সব আঘাতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাকেই পরে বিপদে পড়তে হবে।

কর্মকার কফির কাপে এক গভীর চুমুক দিল। আমি ওকে লক্ষ করতে-করতে বললাম, 'জানেন, আপনি যে আজ আমার এখানে আসবেন, সেটা আমি প্রায় বিশ জনকে বলে বেড়িয়েছি।'

কর্মকার চমকে উঠল 'কারণ?'

'শুধু সামান্য সতর্কতা বলতে পারেন।' আমি হাসলাম 'কিন্তু তাদের এ-কথা বলিনি, আপনি কেন এখানে আসছেন।' ভেবে দেখলাম, কর্মকারকে সমস্ত কিছু খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই ভালো। তাই বললাম, 'কেন জানি না, আমার মনে হয়েছিল, আপনি হয়তো সত্যি-সত্যিই আমাকে খুন করার একটা সুযোগ নিতে পারেন।'

অবন্তীর চোখ বিস্ফারিত হল 'কীসব আবোল-তাবোল বকছেন!'

'হ্যাঁ, আবোল-তাবোলই বটে। কিন্তু সত্যিই যদি আমাকে আপনার খুন করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কোথায় পাবেন? ফ্ল্যাটে আমি রয়েছি একা, নিরস্ত্র এবং নিশ্চিন্ত—অন্তত আপনার দিক থেকে।'

হালকাভাবে হাসল অবন্তী : 'আপনার ওয়াইফ তো জানেন, আমি এখানে এসেছি।'

'সেটাও তো আমার প্ল্যান মতো সাজানো।'

'তাহলে আর-সবাইকে আমার আসার কথা জানানোর কী দরকার ছিল?'

আমি হাসলাম 'হয়তো ব্যাপারটা আমার বউয়ের মনে নাও থাকতে পারে।' অর্থাৎ, ইন্দিরা হয়তো স্বইচ্ছায় বেশ কষ্ট করেই কর্মকারের আগমনের ঘটনাটা ভুলে যেতে চেষ্টা করবে।

আমি অত্যন্ত সাবধানী ব্যক্তি। সামান্যতম 'যদি'কেও আমি কখনও প্রশ্রয় দিই না। এমনও হতে পারে, অবন্তী আর ইন্দিরার মধ্যে হয়তো সত্যিই কোনও সম্পর্ক রয়েছে এবং আমি অথবা বর্মা সেটা খুঁজে পাইনি।

কর্মকার মাথা নাড়ল 'আমি যদি আপনাকে খুনই করতে চাই, তাহলে শুধু-শুধু একজন কিলারকে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে ডেকে আনব কেন?'

'হয়তো নিজের হাতে খুন করতে আপনার বিবেকে বাধছে। তাই আপনার হয়ে "শ্রী ১২১৭"ই কাজটা সারবেন। আপনার যা কর্তব্য, তা হল প্রয়োজনের সময়ে লুকোনো জায়গা ছেড়ে রিভলভার হাতে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে যাওয়া। তাহলে সাপও মরল, অথচ লাঠিও ভাঙল না।'

কর্মকার কফির কাপে অন্তিম চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনার এই সন্দেহ-বাতিক দেখলে স্বয়ং আওরংজেবও কবরে পাশ ফিরে শুতেন!'

'সন্দেহ-বাতিক এবং একইসঙ্গে দূরদর্শী বলতে পারেন।'

আমি এবার চোখ রাখলাম হাতঘড়ির দিকে। ওষুধের কাজ শুরু হতে আর মিনিট পাঁচ-ছয় লাগবে। তারপরই প্রায় আধঘণ্টার জন্যে কর্মকার ঘুমে ঢলে পড়বে (ওষুধের পরিমাণটা সেই অনুপাতে মেশানো রয়েছে)।

'সিগারেট চলবে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমি সাধারণত সিগারেট খাই না।'

'আরে আজ একটা ধরান, কোনও ক্ষতি হবে না।' বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই জোর করলাম।

কর্মকার সিগারেট ধরানোর পর কয়েকটা মিনিট আমাদের জল্লাদের আলোচনাতেই কেটে গেল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করে চললাম।

ব্যাপারটা প্রত্যাশা অনুযায়ী আচমকাই ঘটল। অবন্তীর চোখ দুটো বুজে এল, আঙুলের ফাঁক থেকে খসে পড়ল জ্বলন্ত সিগারেট। সে ঢলে পড়ল চেয়ারে।

সিগারেটটা ঝটিতে মেঝে থেকে তুলে নিলাম। ওটাকে নিভিয়ে, ছিঁড়ে, তামাকগুলো

ছড়িয়ে দিলাম অ্যাশট্রের মধ্যে।

তারপর আমি উঠে গেলাম বাইরের ঘরে। দাঁড়িয়ে রইলাম অপেক্ষায়।

ইন্দিরা সিনেমা দেখতে যায়নি।

অবন্তী আসার কিছুক্ষণ আগে আমি ওকে কয়েকটা অ্যাসপিরিনের হঠাৎ-প্রয়োজনের কথা জানিয়েছি। বলেছি, ঘরে যে-ক'টা ট্যাবলেট ছিল, সব শেষ হয়ে গেছে। তাই ও যদি বড় রাস্তার ডাক্তারখানা থেকে গোটাচারেক অ্যাসপিরিন আমাকে এনে দেয়, তাহলে ভীষণ উপকার হয়। আমি নিজেই যেতাম, নেহাত একজন ভদ্রলোকের আসার কথা আছে, তাই। ও রাজি হয়েছে।

এই ওষুধ আনার কাজে ইন্দিরার কতটা সময় লাগতে পারে সেটা আমি আগে থাকতেই আন্দাজ করে রেখেছি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বড় রাস্তার ডাক্তারখানা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া এবং ওষুধ কিনে ফিরে আসা—এতে মোটামুটি মিনিট-কুড়ি লাগবে।

ইন্দিরার কাজকর্মে কখনও দীর্ঘসূত্রতার ছায়ামাত্রও পড়েনি, সুতরাং খুব তাড়াতাড়িই ও ফিরে আসবে—এই আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অবশেষে যখন বন্ধ দরজা খোলার শব্দ পেলাম, তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস আমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

ঘরে ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল ইন্দিরা।

'তোমার বন্ধু কি এখনও রয়েছেন?'

'হ্যাঁ, বসবার ঘরে।'

আমি শেষবারের মতো ওর সুন্দর মুখশ্রী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। সৌন্দর্যের পূজারি হয়ে এরকম একটা নিখুঁত ভাস্কর্যকে ধ্বংস করতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে।

ইন্দিরা হাতের ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। তারপর ব্যাগ খুলে নিচু হয়ে ট্যাবলেটের খামটা খুঁজতে লাগল।

আগে থাকতেই হাতের কাছে রাখা একটা ভারি ব্রোঞ্জের মূর্তি তুলে নিয়ে সজোরে আঘাত করলাম ওর মাথার পেছনে।

ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এবং ইন্দিরা কোনওরকম শব্দ না করেই পড়ে গেল মেঝেতে। ঝুঁকে পড়ে ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। ব্রোঞ্জের মূর্তিটার যে-অংশ আমি হাতে ধরেছি, সেখানটা রুমাল দিয়ে ভালো করে মুছে ইন্দিরার মৃতদেহের পাশে ওটাকে নামিয়ে রাখলাম। টেবিল থেকে ওর ব্যাগটা নিয়ে বন্ধ করে ফেলে দিলাম মেঝেতে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুমালটা পকেটে রেখে ফিরে এলাম বসবার ঘরে।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে থাকা কর্মকারের পাণ্ডুর মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্যে আমাকে আশঙ্কিত করে তুলল। মরে যায়নি তো লোকটা? কাছে গিয়ে ওকে পরীক্ষা করতেই নিশ্চিন্ত হলাম। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কিছুটা ধীর হলেও কর্মকার দিব্যি বেঁচে রয়েছে।

আমার হিসেবে যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আর মিনিট পনেরোর মধ্যে অবন্তী জেগে উঠবে।

সুতরাং চারটে ঘড়ির কাঁটাকেই (দেওয়াল-ঘড়ি, টেবিল-ঘড়ি, আমার ও কর্মকারের হাতঘড়ি) আধঘণ্টা করে পিছিয়ে নিয়ে গেলাম সঠিক সময়ে।

তারপর চেয়ারে বসে কর্মকারের দিকে একাগ্র নজর রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন বুঝলাম, ওর চেতনা প্রায় ফিরে এসেছে, তখন একটা সিগারেটকে দু-ভাগ করে একটা অংশ পকেটে রেখে অন্যটায় অগ্নি-সংযোগ করলাম। এবং জ্বলন্ত অংশটাকে আলতো করে রাখলাম অ্যাশট্রের লম্বা খাঁজে। অ্যাশট্রেটা এগিয়ে দিলাম কর্মকারের সামনে।

সম্পূর্ণ চেতনা ফিরতে অবন্তীর হয়তো দু-একটা আচ্ছন্ন মিনিট লাগত, কিন্তু আমার অভিপ্রায় তা ছিল না। সুতরাং, একটা মোটা বই তুলে নিয়ে সশব্দে আছাড় মারলাম টেবিলের ওপর। এবং স্পষ্ট স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, '...তাতে আপনার ঢের বেশি সুবিধে হবে।'

কর্মকার চোখ পিটপিট করে তাকাল 'কীসের সুবিধে?'

'না, এই বলছিলাম, ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে আপনি যদি বসার জন্যে একটা চেয়ার নিয়ে যান, তাহলে ঢের বেশি সুবিধে হবে।'

কর্মকার যথাক্রমে দেওয়াল-ঘড়ি ও টেবিল-ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে তাকাল নিজের হাতঘড়ির দিকে। তারপর ওর নজর পড়ল অ্যাশট্রের কানায় রাখা জ্বলন্ত সিগারেটটার ওপরে। সুতরাং, কর্মকারের যুক্তিবাদী মন ওকে বোঝাল, ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। হয়তো ও কয়েক সেকেন্ডের জন্যে এমনিই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

এইভাবে আধটি ঘণ্টার জন্ম এবং মৃত্যু ঘটল, অথচ কর্মকার তা জানতে পারল না।

'কিন্তু একটা কথা,' আমি আলোচনা চালিয়ে গেলাম 'আপনি যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না।'

অবন্তী কষ্ট করে একটা হাই তুলল 'কোনও ভয় নেই, আমি জেগেই থাকব।'

আমি হাসলাম : 'না, শুধু ঘুমোনো নয়—আমার ওপর থেকে আপনার চোখ যেন একমুহূর্তের জন্যেও সরে না যায়।'

'আরে আমার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।' দৃঢ় স্বরে জবাব দিল অবন্তী।

পরের তিন ঘণ্টা যেন তিনটে তিমির রাতের আয়ু!

আমি চেয়ারে বসে একটা গোয়েন্দা উপন্যাস নিয়ে অলস ভঙ্গিতে চোখ বুলিয়ে চললাম আর কর্মকার ভাঁড়ার ঘরের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে মাছি (প্রকৃতপক্ষে মশা) তাড়াতে লাগল। সাধারণত গোয়েন্দা গল্প পড়ে আমি রীতিমতো আনন্দ পাই, কিন্তু আজ এগারোটা নাগাদ যখন কর্মকার ভাঁড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, তখন বইটা

নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

'কী করে যে সব গোলমাল হয়ে গেল আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' অবন্তী খিটখিটে স্বরে কেবলই বলে চলল। যেন আমাকেই দোষারোপ করছে।

'ওই লোকটাকে আপনার আগাম টাকা দেওয়াটা মোটেই ঠিক হয়নি।' আমি গায়ে পড়ে উপদেশ দিলাম 'আপনার ওই কিলার স্রেফ পনেরোটি হাজার টাকা মেরে দিয়ে কেটে পড়েছে!'

কিছুক্ষণ পরেই বাইরের ঘরে এসে আমরা ইন্দিরার ডেডবডি আবিষ্কার করলাম।

স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ আমাকে সন্দেহ করল। কিন্তু আমার পক্ষে কি খুন করা সম্ভব? ইন্দিরার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা হওয়ার পর থেকে আমি সর্বক্ষণ কর্মকারের চোখে-চোখেই ছিলাম। আমার স্ত্রীর মৃতদেহ যৌথভাবে আবিষ্কার করা পর্যন্ত কর্মকারের নজরের আড়ালে আমি যাইনি।

বেচারা কর্মকার পুলিশের জেরার চোটে একেবারে নাকানি-চোবানি খেতে লাগল। তারা তাকে ভাড়াটে জহ্লাদের ব্যাপারটা নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত অন্য কোনও পছন্দসই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না পেয়ে অবন্তীর কথাই তাদের সত্যি বলে মেনে নিতে হল।

হয় ইন্দিরা সিনেমায় যাওয়ার মতলব পালটে ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল, অথবা ও কোনও কিছু ভুলে যাওয়ায় সেটা নিতেই অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসে।

আর এই হঠাৎ-ফিরে-আসা সেই মুহূর্তে ঘরে উপস্থিত জহ্লাদকে চমকে দেয় এবং নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে সে ইন্দিরাকে ওই ব্রোঞ্জের মূর্তিটা দিয়ে খুন করে। এমনও হতে পারে, ইন্দিরা ঘরে ঢোকার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হয়তো সেই অজ্ঞাতকুলশীল খুনি মিস্টার দেবনাথকে হত্যা করবার জন্যে ফ্ল্যাটে ঢোকে এবং ইন্দিরাকে আচমকা আবিষ্কার করে ওকে খুন করতে বাধ্য হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি...।

ইন্দিরাকে হারিয়ে আমার কিঞ্চিৎ যে আপশোস হয়নি তা নয়। ওর মতো সুন্দর, নিখুঁত, তিলোত্তমাসদৃশ শরীরের অধিকারিণী এ-পৃথিবীতে আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। ওর কয়েকটা পরিচিত ভঙ্গির ছবি এখনও পিকাসো, রেমব্রার মতো আমার মনের ঘষা কাচের পরদায় জ্বলজ্বল করছে।

সুতরাং, লাভের মধ্যে শুধু রইল পনেরো হাজার টাকা।

এ ছাড়া আরও একটা ছোট্ট লাভ আমার হয়েছে। অবন্তী কর্মকার আর-কখনও আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেনি।

সুতরাং, অতঃপর 'শার্প' (আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যে পরিচিত লোকে আমাকে এ-নামে ডাকে) দেবনাথ চরম সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। অলমিতি।

খুনির দুনিয়ায়

ম্যানেজারসাহেব গম্ভীরভাবে একটা খাতা উলটেপালটে দেখছিলেন। লম্বা টাইপের মুখ।' চোখ দুটো কোটরে বসা, লম্বা নাক, দাড়ি-গোঁফ কামানো, ছোট-খাটো চেহারা। মাথা নিচু করে টেবিলে রাখা খাতাটা বেশ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমাকে চশমার ফাঁকে একপলক দেখে নিয়ে গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কী চাই?'

'আমার নাম সিদ্ধার্থ সরকার। আমি আপনার নীচের তলায় একটি রাত কাটাতে চাই।'

সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি। আমি তাঁর সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসলাম। বললাম, 'আপনাকে সবই খুলে বলছি। আমি একজন ভাগ্যহীন সাংবাদিক—রিপোর্টার। অনেক জায়গায় কাজ পেয়েছিলাম, কিন্তু টিকতে পারিনি। কারণ, আমার নাকি একফোঁটা ইমাজিনেশান নেই। সব জায়গায় ধাক্কা খেয়ে শেষে এখানে এসেছি। "অতলান্ত" কাগজের এডিটরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছি। আমি আপনার এই "খুনির দুনিয়া"য় একটি রাত কাটাব এবং সেই রাত কাটানোর বিবরণ "অতলান্ত" কাগজে বেরোবে। তার জন্যে শ'খানেক টাকা পাব।'

ম্যানেজার যেন এইবার আমার অদ্ভুত খেয়ালের অর্থ বুঝতে পারলেন।

'খুনির দুনিয়া' বর্তমানে এই শহরে বেশ নাম করেছে। এখানে পৃথিবী বিখ্যাত সব খুনিদের মোমের মূর্তি তৈরি করে রাখা আছে। সকালবেলা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সাধারণ দর্শকদের জন্যে 'খুনির দুনিয়া' খোলা থাকে। নীচের বিরাট হলঘর জুড়ে নানান দেশের খুনিদের মূর্তি সাজানো। আর দোতলায় এই অফিস-ঘর।

ম্যানেজারসাহেব এবার বললেন, 'আপনি কি মূর্তিগুলো ঘুরেফিরে দেখেছেন?'

'না, তেমনভাবে ঠিক দেখিনি।'

'তবে চলুন। আগে ওগুলো দেখাই আপনাকে। তারপরও যদি আপনার ডিসিশান না পালটায়, তবে আজ রাতটা আপনি স্বচ্ছন্দে এই "খুনির দুনিয়া"য় কাটাতে পারেন।'

'চলুন, তাই যাওয়া যাক।' বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের হলঘরে এলাম।

হলঘরে ঢুকতেই সারা গা ছমছম করে উঠল। বিশাল হলঘরে শুধুমাত্র একটা গাঢ় নীল রঙের আলো। হলঘরের বিভিন্ন জায়গায়, এখানে সেখানে, বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সব মোমের মূর্তি।

'দেখুন, এঁকে দেখুন।'

ম্যানেজারের কথায় চমক ভাঙল আমার।

'দেখুন, ইনি হলেন চার্লস পিস। একজনকে গুলি করে মার্ডার করায় দু-বছর পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

সামনে দাঁড়ানো বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত এক মূর্তি। তার ডান হাতে একটা রিভলভার। গলায় নট দেওয়া সিল্কের রুমাল। আলো-ছায়ায় বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

'দেখুন, মিস্টার সরকার—এ হল মাদাম অলিভিয়ের। ইনি ফুলের মতো নিষ্পাপ আটটি শিশুকে দুধের গামলায় ডুবিয়ে খুন করেছিলেন।'

আমার সামনে এক মোটাসোটা বয়স্কা মহিলা। দু-চোখে তাঁর ক্রূর দৃষ্টি। হাতের আঙুলগুলো এমনভাবে বাঁকানো, যেন কারও গলা টিপতে যাচ্ছেন। তাঁর পায়ের কাছে একটা গামলা—দুধে ভরতি। আসলে সাদা মোম দিয়ে গামলাটা ভরতি করা, তবুও তারই মধ্যে কারুকার্য করে তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে।

'চার্লস পিসের মুখোমুখি যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হলেন ডক্টর বার্দো—ফরাসি। ইনি ক্ষুর দিয়ে তেরোজন মানুষকে খুন করেছিলেন। গলার নলি কাটা অবস্থায় তাদের পাওয়া গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, কোনও ক্ষেত্রেই একটুও ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, ডক্টর বার্দো নাকি হিপনোটিজ্‌ম জানেন।'

'জানেন? জানেন মানে!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'এখানে যাঁরা আছেন তাদের মধ্যে এই একমাত্র ডক্টর বার্দোই আজও পুলিশের হাতে ধরা পড়েননি। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি এই শহরেই কোথাও লুকিয়ে আছেন। তবে পুলিশ এখনও তাঁর পিছু ছাড়েনি।'

হঠাৎই আমি চমকে উঠলাম। একী? নড়ল না? আমার চোখের সামনে দাঁড়ানো ডক্টর বার্দোর মূর্তিটা হঠাৎ যেন একটু নড়ে উঠল! মনে হল...। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর প্যাঁসনে চশমার দিকে, আর তার আড়ালে জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে। কেমন যেন অবশ লাগল নিজেকে। ডক্টর বার্দোর হাতে একটা ধারালো ঝকঝকে ক্ষুর, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট, বয়স পঞ্চাশের ওপরে। মাথায় টাক, মোটা ভুরু আর গোঁফ।

'এদিকে আসুন। এ লোকটি হল রমন রাঘব। বোম্বাইয়ের ভয়ঙ্কর অপরাধী। সামান্য টাকার জন্যেও এ মেয়ে, পুরুষ, শিশু নির্বিচারে খুন করেছে এই অস্ত্র দিয়ে।' দেখলাম একটা 'দ'য়ের মতো চেহারার লোহার অস্ত্র নিয়ে পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো বেঁটেখাটো রমন রাঘব দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'এ কে বলুন তো? পৃথিবী বিখ্যাত "জ্যাক দ্য রিপার"—।'

আক্রমণের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলাম।

'এ হল বস্টনের সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকারী। যে গলা টিপে বারোজন মহিলাকে হত্যা করেছিল।'

প্রায় এক ঘণ্টা পর হলঘর পরিদর্শন শেষ হল। শেষে ম্যানেজার বললেন, 'এই চেয়ারটা রইল আপনার জন্যে। আর ওটা হল ফায়ার অ্যালার্ম। দরকার হলে বাজাবেন। সব মোমের তৈরি তো, যে-কোনও মুহূর্তে আগুন লাগার চান্স। এই তো, আজ বিকেলেই কে যেন ইয়ার্কি করে অ্যালার্মটা বাজিয়ে দিয়েছিল। তারপর কী হুড়োহুড়ি! শেষে দেখা গেল যে, কিছুই হয়নি। কেউ ঠাট্টা করেছে। আচ্ছা, আমি চলি—হ্যাঁ, একটা কথা, আলো

কিন্তু এর চেয়ে বেশি আমি দিতে পারছি না। কারণ, এই অল্প আলোতে মূর্তিগুলো জীবন্ত দেখায়—তাই দর্শকদের সুবিধের জন্যেই আলোর ব্যবস্থা ওরকম রাখতে হয়েছে।'

'না, না,' বাধা দিয়ে আমি বললাম, 'তার জন্যে কোনও অসুবিধে হবে না। এ-আলোতেই চলবে। চাই কি একেবারে অন্ধকারও করে দিতে পারেন।' হাসলাম আমি।

'শুভরাত্রি।' বললেন ম্যানেজারসাহেব, 'সদর দরজা বন্ধ রইল। আর ওই দোতলার সিঁড়ির গোড়াতেই একজন সিকিওরিটি থাকে। আপনি ডাকলেই সে শুনতে পাবে। অবশ্য যদি কোনও প্রয়োজন হয়। নমস্কার।'

বিদায় নিয়ে হলঘর ছেড়ে দোতলায় চলে গেলেন ম্যানেজার। আমি হাতের রিস্টওয়াচের দিকে তাকালাম। সাড়ে আটটা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে এলাম ডক্টর বার্দোর মোমের তৈরি মূর্তিটার সামনে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে চেয়ারের পেছন দিকটা ডক্টর বার্দোর দিকে রেখে চার্লস পিসের মুখোমুখি বসলাম। আসল কথা, ডক্টর বার্দোর ক্রূর দৃষ্টি আমি সইতে পারছিলাম না। কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল।

হলঘরে দম আটকে আসা নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে। ভাবতে লাগলাম, কী করা যায়। পকেট থেকে নোটবুক আর পেনসিল বের করলাম। কিছুক্ষণ চিন্তার পর লিখলাম, 'রাত ন'টা বাজে। হলঘর নিস্তব্ধ। "খুনির দুনিয়া" চুপচাপ। প্রতিটি হত্যাকারী যেন নিঃসাড়ে বিভিন্ন হাতিয়ার নিয়ে চুপিচুপি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডক্টর বার্দোর দিকে তাকাতে পারছি না। মনে হচ্ছে, এই মোমের তৈরি মূর্তিটাও আমাকে হিপনোটাইজ করবে। কী সাংঘাতিক চোখ। হলঘরে জীবিত বলতে আমি একা।'

'একা' শব্দটা একটু ভেবে লিখলাম। তারপর আবার লিখতে শুরু করলাম।

'কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। সিকিওরিটিকে একবার ডাকব নাকি? মনে হচ্ছে, এখুনি যেন কেউ এসে পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখবে—।'

লাফিয়ে উঠলাম চেয়ার ছেড়ে। কে? কে হাত দিল আমার কাঁধে? আমার পেছনে দাঁড়ানো ডক্টর বার্দোর দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে যেন হাতটা একটু—ডিগ্রিখানেক মতো—সরে গেছে। তাহলে কি আমার দেখার ভুল? মাদাম অলিভিয়েরের মুখে দুষ্টুমির মুচকি হাসি। যেন বলতে চাইছেন, আমি কিন্তু কিছু করিনি।

ঘুরে আবার চেয়ারে বসলাম, চার্লস পিসের মুখোমুখি। লিখতে আরম্ভ করলাম, 'এখানে ভারি আশ্চর্য বিচিত্র সব ব্যাপার ঘটছে। মনে হচ্ছে, মূর্তিগুলো যেন জীবন্ত।'

ডায়েরি বন্ধ করে পকেটে পুরলাম। পেনসিলটা বুকপকেটে রেখে তাকালাম চার্লস পিসের দিকে। কী আশ্চর্য! চার্লস পিস এতক্ষণ তো আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল! তবে? দেখলাম, চার্লস পিসের মূর্তিটা যেন একটু পাশে ফেরানো। অদ্ভুত তো! হয়তো আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। বারবার মনে হচ্ছিল যে, দুটো চোখের দৃষ্টি সর্বদা আমার মাথার পেছন দিকটাকে বিদ্ধ করছে। তাই এবার মরিয়া হয়ে ডক্টর বার্দোর দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে বসলাম! যেন বলতে চাইলাম, দেখব বাছাধন, এবার তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে নড়ো কেমন করে?

কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। হয়তো একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। হঠাৎ চোখ খুললাম। এ কী?

ডক্টর বার্দো যেন কিছুটা এগিয়ে এসেছেন আমার দিকে! ক্রমশ দৃষ্টি নামিয়ে তাঁর পায়ের দিকে তাকালাম। আমার দেখার ভুল? ডক্টর বার্দোর এক পা মাটিতে আর এক পা বেদিতে। তারপর—তারপর আমার চোখের সামনেই তিনি ধীরে-ধীরে এগিয়ে এলেন আমার কাছে। ক্ষুরটাকে কোটের পকেটে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এই আবছা নীল আলোয় তাঁকে শয়তানের চর বলে মনে হল। দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সুন্দর 'বাও' করলেন তিনি : 'গুড ইভনিং, জেন্টলম্যান। আমি নিশ্চয়ই আপনাকে চমকে দিয়েছি?' তাঁর শ্যেনচক্ষু আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল। ওই বিমোহিত দৃষ্টিতে আমি কেমন যেন পাথরের মতো হয়ে গেলাম। সিকিওরিটিকে ডাকার কথা মনে এলেও ডাকতে পারলাম না—গলা যেন আটকে গেল।

ডক্টর বার্দো বলে চললেন, 'জানি, আপনি ভয় পেয়েছেন। যে-তেরোজনকে আগে আমি...তারাও ভয় পেয়েছিল। তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। আজ বিকেলে এই একজিবিশানের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি একটা পুলিশ কনস্টেবল সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি মাসখানেক এই শহরে লুকিয়ে ছিলাম। এরা চারদিকে ছবি-টবি ছেপে এমন করেছে যে, রাস্তায় বেরোনোও মুশকিল হয়ে পড়েছে। যাকগে, তা পুলিশ কনস্টেবলটি আমার দিকে এক-পা বাড়াতেই আমি সুট করে ঢুকে পড়লাম এখানে—খুনির দুনিয়ায়। ঢুকেই ফায়ার অ্যালার্মটা বাজিয়ে দিলাম। ওঃ! তারপর সে এক মজার কাণ্ড। সব পাবলিক হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি করে বেরোতে লাগল। জনতার সেই স্রোতে তলিয়ে গেল পুলিশম্যানটিও।

'ভেতরে ঢুকে ভাবছি কী করা যায়, হঠাৎ দেখি—আশ্চর্য! আমারই একটা স্ট্যাচু দাঁড় করানো। মনে-মনে হাসি পেলেও মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তাড়াতাড়ি স্ট্যাচুটিকে সরিয়ে ফেললাম ওই কোণের ডায়াসের নীচে। আর ওর জামা-কাপড়গুলো পরে ক্ষুরটা হাতে নিয়ে নিজেই দাঁড়িয়ে রইলাম স্ট্যাচু সেজে। সে যে কী কষ্ট, উঃ! একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে গা-হাত-পা সব ব্যথা হয়ে গেছে।' বলে একটু হাত-পা নাড়াচাড়া করে নিলেন তিনি। আমি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

তিনি বলে চললেন, 'যখন রাতে ম্যানেজার আপনাকে আমার কাছে নিয়ে এল, তখন এত গা ব্যথা করছিল যে থাকতে না পেরে বোধহয় নড়ে উঠেছিলাম। কারণ, তারপরই আপনি এমন আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন যে...।

'যা হোক, এবার কাজের কথায় আসি। জানেন তো, "তেরো" সংখ্যাটা একদম অপয়া। তাই ওটাকে আমি চোদ্দো করতে চাই। না, না, কোনও অসুবিধেই হবে না। এই দেখুন না—।'

বলে পকেট থেকে ক্ষুরটা বের করে খুলে ধরলেন ডক্টর বার্দো। ওটার ইস্পাতের ফলাটা চকচক করে উঠল রক্ত-পিপাসায়।

আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

আরও এক-পা এগিয়ে এলেন ডক্টর বার্দো 'এই ক্ষুরটা মেড ইন প্যারিস। তাই হয়তো আপনার একটু অসুবিধে হতে পারে। দেখি, গলাটা একটু তুলুন।...হ্যাঁ, এই ক্ষুর দিয়ে বেশি ডিপ করে কাটা যায় না। তবে গলার নলিটা কাটতে গেলে বেশি ডিপ করে কাটার তো দরকার নেই—একটানেই হয়ে যাবে। এই তো, আর-একটু তুলুন থুতনিটা। আর-একটু—এই সামান্য কষ্ট দিচ্ছি বলে আমাকে মাপ করবেন...আর-একটু, এই তো—এইবার ক্ষুরটা দিয়ে—অ্যা—অ্যা—এই—ই—ই—ব্যস...।'

পরদিন সকালবেলা বাইরের রোদ্দুর এসে পড়েছে হলঘরে। সূর্যের একটা রশ্মি এসে পড়েছে সিদ্ধার্থ সরকারের গলায়। থুতনিটাকে ওপরে তুলে চেয়ারে বসে আছেন সিদ্ধার্থ সরকার, যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামানোর জন্য তৈরি হয়েছেন। তাঁর দেহ বরফের মতো ঠান্ডা।

সম্পাদকেরা ভুল বলেছিলেন যে, সিদ্ধার্থ সরকারের বিন্দুমাত্রও কল্পনাশক্তি নেই। কারণ, বেদির ওপর নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডক্টর বার্দো। শুধু নিশ্চল নয়, তাঁর নড়বার কোনও ক্ষমতাও নেই—তিনি সত্যিই শুধুমাত্র মোমের তৈরি।

শিশুরা বড় সরল

মিস সরকার ভীষণ সুন্দরী। এই 'মিডল্যান্ড হাই স্কুলে' তাঁর চেয়ে সুন্দরী দিদিমণি আর কেউ নেই। শুধু স্কুল কেন, সারা জীবনে এর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে কখনও ওর চোখে পড়েনি—এবং পড়বেও না। গরমের ছুটির পর স্কুলে এসে এইটুকুই প্রথমে ভাবতে পারল অলংকার।

'অলংকার, তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ তো?' হঠাৎই ওর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন ইন্দ্রাণী সরকার।

অলংকারের গাল গরম হল, রক্তিম হল কান।

'ন্—না, মিস।'

'তাহলে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে উঠে এসো, একশোবার লেখো, "আমি ক্লাসে সর্বদা মনোযোগী হব।" '

গুরুজনদের কথা অমান্য করতে নেই, জানে অলংকার। সুতরাং মিস সরকারের আদেশ পালন করতে ও উঠে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে। একটা গোটা চক নিয়ে লিখতে শুরু করল। ক্রমে ছোট হয়ে আসতে লাগল ওর হাতের চক, আর ক্লাসের ছেলেদের যথারীতি অঙ্ক করিয়ে চললেন ইন্দ্রাণী সরকার।

লেখা শেষ হলে নিজের সিটে ফিরে এল অলংকার, এবং আবার মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল মিস সরকারের নেশা-ধরানো সুন্দর মুখের দিকে।

ওর পাশের ছেলেটা, মহীতোষ পাল, জানত ওর মনের গোপন কথাটা। তাই অলংকার ফিরে এসে বসতেই চাপা স্বরে সে বলে উঠল, 'মিস সরকারের সঙ্গে আমাদের অলংকারবাবুর ইয়ে চলছে।'

অলংকার ভয়ে আশেপাশে তাকাল। বুঝতে চাইল কথাটা আর কারও কানে গেছে কি না। তারপর অন্ধ রাগে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহীতোষের ওপর, ওর মুখ লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল নির্ভুল ঘুসি। মহীতোষের কথায় মিথ্যে নেই অলংকার জানে। কিন্তু কেন জানি না, ওর বলার ভঙ্গিতে এত সুন্দর ভালোবাসার ব্যাপারটা কেমন যেন নোংরা বলে মনে হল।

'তুমি ওকে মারলে কেন, অলংকার?' ওদের বেঞ্চের সামনে এসে জানতে চাইলেন মিস সরকার। সত্যি, রাগলে মিস-কে যেন আরও সুন্দর দেখায়, আরও ভালো লাগে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল অলংকার।

'এটা যে অন্যায় তুমি জানো?' মহীতোষের ঠোঁটের কোণ থেকে তখন রক্তের সরু রেখা বয়ে চলেছে। সেদিকে তাকালেন মিস, বললেন, 'মহীতোষ, অলংকার তোমাকে হঠাৎ মারতে গেল কেন?'

'আমি বলতে পারব না, মিস।' মাথা নিচু করে মহীতোষও দাঁড়িয়ে থাকে।

সুতরাং, অনিবার্যভাবেই অভ্যাসলব্ধ একঘেয়ে পদক্ষেপে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে আবার এগিয়ে চলল অলংকার। মিস-এর টেবিল থেকে তুলে নিল একটা গোটা চক, লিখতে শুরু করল মহীতোষকে আমি আর মারব না।

মহীতোষকে আমি আর মারব না। মহীতোষকে আমি আর...।

ও ফিরে আসতেই চাপা হিংস্র স্বরে হিসহিস করে উঠল মহীতোষ, 'শালা, এর শোধ আমি তুলবই। তুই দেখে নিস।' একই ক্লাসে বারংবার পড়ার অভিজ্ঞতায় মহীতোষের জানা আছে, কীভাবে দিদিমণির কান এড়িয়ে কথা বলতে হয়।

অলংকারের সে-কৌশল জানা নেই। তাই মহীতোষের কথার উত্তরে ও যখন মারামারির জন্যে চাপা স্বরে ওর কাছে ক্ষমা চাইতে গেল, তার পরিণতি হল সেই ব্ল্যাকবোর্ড আর চক আমি ক্লাসে আর কথা বলব না।

আমি ক্লাসে আর কথা বলব না। আমি ক্লাসে আর...।

আর মহীতোষ? সে হয়ে গেল ক্লাসের মনিটর।

মিস সরকার বললেন, 'ছেলেরা শোনো সবাই। আজ থেকে মহীতোষ তোমাদের ক্লাসের মনিটর। ও রোজ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াবে—দেখবে লাইন করে যাওয়া-আসার সময় কেউ কোনও গোলমাল করে কি না। এ ছাড়া স্কুলের নিয়ম-কানুন সবাই মেনে চলছে কি না তাও দেখবে। কোনওরকম বেনিয়ম দেখলেই ও আমার কাছে রিপোর্ট করবে।'

সুতরাং, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় খুব সতর্ক থাকে অলংকার। কারণ, ওর কেমন যেন একটা ধারণা হল, এই নতুন মনিটর ওকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে।

না, হিসেবে অলংকারের ভুল হয়নি। অতএব

আর কোনওদিন সিঁড়িতে কাগজ ফেলব না...।

লাইনে দাঁড়িয়ে কখনও শিস দেব না...।

কখনও বারান্দায় থুতু ফেলব না...।

চকের পর চক শেষ হয়ে গেল দিনের পর দিন। কিন্তু ওপরের অন্যায়গুলোর জন্য দায়ী কে? আর যেই হোক, অলংকার নয়। কিন্তু মহীতোষের সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা অনেক সহজ—অন্তত অলংকারের কাছে। এবং মিস সরকার ওর ওপরে অসন্তুষ্ট হোক তা অলংকার চায় না। মিস সন্তুষ্ট হলেই ও খুশি।

তা ছাড়া মহীতোষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য কম চেষ্টা করেনি অলংকার।

'শোন, মহীতোষ, এই ডটপেনটা নিবি? আমার কাছে দুটো আছে।'

'তোর ডটপেন কে চায়?'

'চ', বিকেলে আমার সাইকেল করে ঘুরে আসি—।'

'তোর রদ্দি সাইকেল তোর কাছেই থাক।'

'নতুন ব্যাট-বল কিনেছি। চ', মাঠে প্র্যাকটিস করি।'

'মরে গেলেও তোর ব্যাট-বলে আমি হাত দেব না।'

সুতরাং, অলংকারের সব চেষ্টাই বিফল হল। আর কী উপায়ে মহীতোষের বন্ধুত্ব ও পেতে পারে?

হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা এসে গেল। অংক পরীক্ষার দিন প্রাক্তন বন্ধুর ব্যবহারে অলংকার অবাক হল। ভাবল, মহীতোষ বোধহয় এতদিন অভিমানের পর ওর সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছে। কারণ, মহীতোষ ওর উত্তর লেখা অংকের খাতাটা সোজা ঠেলে দিয়েছে অলংকারের চোখের সামনে! এই হিমালয়-প্রমাণ প্রলোভন জয় করার ক্ষমতা এখনও অলংকারের হয়নি। তাই মহীতোষের খাতায় ওর চোখ আটকে গেল, এবং পরিণতি:

আর কখনও পরীক্ষায় টোকাটুকি করব না।

আর কখনও পরীক্ষায় টোকাটুকি করব না।

আর কখনও...।

এরপরে যে মিস সরকার অলংকারের বাবা কিংবা মাকে ডেকে পাঠাবেন সে আর আশ্চর্য কী।

'মনে হয়, আমারই যাওয়া দরকার।' অলংকারের বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন।

'তুমি শুধু-শুধু যাবে কেন।' ওর মা বলে উঠলেন, 'ছেলে এমন কিছু খুন-জখম করে বসেনি যে, তোমাকে যেতে হবে! তা ছাড়া তোমার অফিসও কামাই যাবে—।'

অতএব, স্কুলের অফিস-ঘরে দু-জন মহিলার সামনে লজ্জানত মুখে দাঁড়িয়ে নির্বাক অলংকার।

'আর কোনওদিন খারাপ কাজ করব না।' বিড়বিড় করে বলল ও, 'আমি ভালো হওয়ার চেষ্টা করব। সত্যি বলছি।'

'কোনওরকম দুষ্টুমি করলেই আমি আপনার ছেলেকে ব্ল্যাকবোর্ডে দাঁড় করিয়ে লিখতে বলি।' বললেন মিস সরকার।

অলংকারের মা হাসলেন 'হ্যাঁ একশোবার বলবেন। আমাদের সময়েও ওই একইভাবে শাস্তি দেওয়া হত।'

'জানি, পড়ানোর টেকনিক দিনের পর দিন অনেক পালটে যাচ্ছে, কিন্তু পুরোনো অনেক নিয়ম এখনও কাজে লাগে।'

'যা বলেছেন! এই তো সেদিন ওর বাবাকে বলছিলাম...।'

বাড়িতে ফিরে অলংকারের মা ওকে বললেন, 'তোমাদের দিদিমণিকে দেখতে খুব সুন্দর।'

'হুঁ।' বলল অলংকার। রক্তের আকস্মিক ঝলকে ওর ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল। মা-র কাপড়ে মুখ গুঁজে ও বলে উঠল, 'মা, এবার আমি সত্যি ভালো হব, বিশ্বাস করো।'

কিন্তু কোনও ফল হল না। মহীতোষের সাজানো অপরাধের অপরাধী হয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লাগাতার প্রায়শ্চিত্ত করে চলল অলংকার। ওর আঙুলের শক্তিও যেন দিন-দিন কমে আসছে।

'আমাদের স্কুলে চকের অভাব নেই।' কঠোর স্বরে বলেন মিস সরকার।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আর কোনওদিন চেঁচাব না...।

দেওয়ালে আর কখনও দাগ দেব না...।

সিঁড়ি দিয়ে রোজ ধীরে-ধীরে নামব...।

কারও সঙ্গে কখনও ঝগড়া করব না...।

এই অভ্যাসে আজকাল ওর লাইনগুলো অন্তত সমান হচ্ছে। ও চাইল, এই উন্নতিটুকু মিস সরকারের চোখে পড়ুক।

একদিন সকালে একটু দেরি করে স্কুলে পৌঁছল অলংকার। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে কেউ নেই, শুধু একরাশ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ভরা হাসি নিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে মহীতোষ। সম্ভবত ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

'কীরে, স্কুলের জিনিস ড্যামেজ করছিস?' মহীতোষ নিষ্ঠুরভাবে হাসল, অলংকারের হাত থেকে স্কুল-থেকে-দেওয়া বইগুলো কেড়ে নিয়ে তার পৃষ্ঠাগুলো টেনে-টেনে ছিঁড়তে লাগল।

তখনও দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়েনি। তাই স্কুল-বাড়ির অন্যান্য গোলমালে চাপা পড়ে গেল সিঁড়ির শব্দের রাশ।

'তুমি বড্ড অলস, অলংকার—' অলংকারকে ক্লাসে ঢুকতে দেখেই বলতে শুরু করেছেন মিস সরকার, কিন্তু ছেলেটা যেন একটা ঘোরের মধ্যে সোজা এগিয়ে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে।

দিদিমণির টেবিল থেকে তুলে নিল নতুন চক, লিখতে শুরু করল।

'অলংকার, তোমার জায়গায় যাও।' শাসনের সুরে বললেন মিস, 'আমি কিছু লিখতে না বলা পর্যন্ত চুপচাপ জায়গায় গিয়ে বসে থাকো।'

কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডের লেখার সারবস্তুর তাৎপর্য তাঁর মস্তিষ্কে আঘাত করতেই ইন্দ্রাণী সরকারের যুবতী শরীরটা কেঁপে উঠল। বোর্ডের কালো জমিতে অতিরিক্ত স্পষ্টভাবে পড়া যাচ্ছে সাদা লেখাগুলো

মহীতোষকে আর কখনও ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেব না।

মহীতোষকে আর কখনও ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেব না।

মহীতোষকে আর কখনও ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেব না।

মহীতোষকে আর কখনও...।

অন্তত পক্ষে বারো বার লেখার পর সংবিৎ ফিরল মিস সরকারের। ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরের বারান্দায়। রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে তাকালেন নীচের উঠোনে। ক্লাসরুম থেকে তখনও তার কানে আসছে অলংকারের সাদা-কালোর প্রায়শ্চিত্তের খসখস শব্দ। শব্দটা যেন গলা ফাটিয়ে বলতে চাইছে মহীতোষকে আর কখনও ধাক্কা...।

প্রতিশোধ অতি বিষম বস্তু

কপালে অবশেষে যাবজ্জীবন জুটল। কিন্তু 'গুডবয়টি' সেজে বেরিয়ে এলাম চোদ্দোর মাথায়। মাত্র চোদ্দো বছর! আলিপুরে ঢুকে আমার সহজ-সরল ছেলেবেলার সঙ্গে জুড়ে গেল বত্রিশের তেতো যৌবন। আলিপুরের নরক যেন সি এম ডি এ প্রকল্পের দু-নম্বর হাওড়া ব্রিজ। কৈশোর আর যৌবনের মধ্যে ইঁট-কাঠ-লোহালক্কড় দিয়ে সেতু বেঁধে দেয়।

যদ্দিন ছিলাম, সবাই আমাকে মাদার টেরেসা ভাবত। কারণ সেইভাবেই চলাফেরা করতাম আমি, দেখাতাম সেইরকম আদবকায়দা। এই অভিনয়ে সকলের নাকের জলে চোখের জলে গদ্গদ অবস্থা দেখে আমার দমফাটা হাসি পেত। কথায়-কথায় জেলার সান্ত্রি-কয়েদি সবাই আমার উদাহরণ টানত : দ্যাখো তো ওকে, কী ভদ্র, শান্ত...। এককথায়, আদর্শ বন্দি!

আমার এই আদর্শবাদের ভণিতার আসল কারণ একমাত্র আমিই জানতাম। জেলে আমার সঙ্গে আর যারা থাকত—চোর, ডাকাত, খুনে, রেপিস্ট—তারা সবাই ভাবত আমি শুধরে গিয়ে সীমান্ত গান্ধী হয়ে গেছি। কিন্তু কী কষ্টেই না চোদ্দোটা বছর ওই নরকের বাতাস আমি হজম করেছি। ঝনঝন করে লোহার দরজা খোলা-বন্ধের কর্কশ আওয়াজ, কয়েদিভাইদের গায়ের পচা গন্ধ, নোংরা দুর্গন্ধময় বাতাবরণ, সব আমি প্রাণপণ চেষ্টায় সহ্য করেছি। শুধু একটি কারণে...।

কারণ, আমি জানতাম, তাড়াতাড়ি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমাকে কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। নাম তার হরিপ্রসাদ। সারাটা বন্দিজীবন আমি শুধু ওর সঙ্গে দেখা করার স্বপ্ন দেখেছি। প্রিয় স্বপ্ন।

স্পষ্ট মনে পড়ছে হরিপ্রসাদের রক্তে আর হুইস্কিতে ঠাসা টসটসে ফোলা দেহটা। কোমরের বেল্টটা যেন মাংসের চাপে ফটাস্ করে ছিঁড়ে যাবে। নিঃশ্বাস ছাড়ে রেলের ইঞ্জিনের মতো ফোঁস-ফোঁস হাঁপানিতে। হাওয়াটা বেরিয়ে আসে ওর ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। কিন্তু ওর ভয়ে কুঁচকে যাওয়া মুখ আমি কখনও দেখিনি। দেখিনি বালিশের মতো ফাঁপা গাল বেয়ে ঘামের ঝরনা ঝরে পড়তে। দেখিনি কীভাবে ও আমার পা ধরে কান্নাকাটি করে বারবার ভিখ চাইবে, যেন গুলি না করি...।

জেল থেকে বেরিয়ে সব দেখব। শেষ-না-হওয়া ওই কালান্তক চোদ্দোটা বছর আমি শুধু এই আশা নিয়ে কাটিয়েছি। আর সেইজন্যেই হয়তো এখনও মাথাটা আমার ঠিক আছে—পাগল হইনি। অবশ্য হরিপ্রসাদকে খুন করলে আমাকে হয়তো আবার ধরা পড়তে হবে, আবার গুনতে হবে এক থেকে চোদ্দো। কিন্তু তাতে কোনও দুঃখ নেই। খুন করেছি, তাই খুনের সাজা পাব। এবারের মতো বিনা পাপে হরিপ্রসাদের সাজানো ফাঁদে পা দিয়ে জেলের ঘানি ঘোরাব না। মাত্র আঠেরো বছর বয়েসে আমাকে খুনের

সাজায় ধরা পড়তে দেখে খোদ বুঢ্‌ঢা জজ পর্যন্ত অবাক হয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল। শেষে রায় দেওয়ার সময় গম্ভীর গলায় বলেছে, 'অল্পবয়েস আর প্রথম অপরাধ—এই দুটো ব্যাপার চিন্তা করে তোমাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম'...তারপর আরও কত কী বকবক করেছে বুড়ো ভাম। আমি কানে আমল দিইনি। আর এখন...এতদিন পর... আমি ছাড়া পেয়েছি। এবং আমার প্রথম ও শেষ কর্তব্য জনৈক হরিপ্রসাদকে শ্রীহরির প্রসাদ করে দেওয়া। ওম্‌ শান্তি ওম্‌।

আলিপুরের এলাকা ছাড়িয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। ভাবতেই পারছি না, আমি ছাড়া পেয়েছি, গায়ে এখনও আমার শক্তি আছে, আকাশে সূর্য এখনও আলো দিচ্ছে। পকেটে হাজারদেড়েক টাকা। এর থেকে চেষ্টা-চরিত্র করে একটা দু-নম্বর রিভলভার কিনতে হবে। জেলের এক সঙ্গীর কাছ থেকেই লাইনের লোকের খোঁজ পেয়েছি। সুতরাং রওনা হলাম উপযুক্ত পথে।

বাস থেকে নেমে পড়লাম। সদ্য কেনা পিস্তল কোমরে গোঁজা। মুখ শুকনো, বুকের ভেতর কেউ গির্জার ঘণ্টা বাজাচ্ছে—ঢং—ঢং। যেন প্রথম কোনও প্রেমিকার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে যাচ্ছি। জোরকদমে এগিয়ে চললাম। লক্ষ্য হরিপ্রসাদের বাসস্থান। এবং আমার নিশানা যদি ভুল না হয় তাহলে ওর গোরস্থানও বটে।

বাড়িটা চোদ্দো বছর আগে যেমন ছিল এখনও ঠিক সেইভাবেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা হরিপ্রসাদের মতোই সুন্দর, বেঢপ। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম সদর দরজা থেকে বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সুরকি-ঢালা পথের দিকে। দু-পাশে কেয়ারি করা মরশুমি ফুলের গাছ। ভাবা যায় না, একটা চোর-ছ্যাঁচোর মানুষ এত পয়সার মালিক হতে পারে...হোক না কেন বাঁকা পথে। পিস্তলের ওপর আমার হাতের আঙুল শক্ত হয়ে বসল। ওটাকে আরও ঠেসে দিলাম গেঁজেতে।

যে-মেয়েছেলেটা দরজা খুলে দিল, সে জাতের মাল হরিপ্রসাদের সঙ্গে আমি খুব কমই দেখেছি। এক নম্বর, সে বেঁটে। দু-নম্বর, মোটা। তিন নম্বর...থাক, নম্বর দিতে গেলে শ'য়ে পৌঁছে যাবে, বরং আমিই বলি। মহিলার মাথার চুলে পাক ধরেছে, জটও সামান্য চোখে পড়ে, বয়েস পঞ্চাশের ওপর এবং সেটা চেপে রাখার একরত্তি চেষ্টা নেই। জিগ্যেস করলাম, 'হরিপ্রসাদজি বাড়ি আছেন?' সহজভাবে হাসতে চাইলাম, কিন্তু সেটা বিশেষ কাজে লাগল না। হয় মহিলার ছেনালির বয়েস পেরিয়ে গেছে, নয়তো আমার চেহারার চটক অনেক কমে গেছে। আলিপুরের ঘানিই হয়তো তার জন্যে দায়ী।

'ভেতরে আসবেন না?' গলার স্বর সাদামাঠা। স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আমি ভেতরে গেলাম কি না গেলাম তাতে তার বয়েই গেল। কিন্তু আমি ঢুকে পড়লাম ভেতরে। এত সহজে বাড়িতে ঢুকতে পারব ভাবিনি। আমার অহঙ্কারে ঠান্ডা জলের ঝাপটা পড়ল।

অন্ধকার হলঘর পেরিয়ে সাদামাঠা গোলগাল মহিলা একটা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি তাকে অনুসরণ করেছি তালে-তালে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উনি কী যেন ভাবলেন যেন দরজায় নক করবেন কি করবেন না। তারপর সোজা হাতল

ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন দরজা। সুবোধ ছাত্রের মতো আমিও পেছন-পেছন ঢুকে পড়লাম।

হরিপ্রসাদ কি এভাবে আমাকে মনের দিক থেকে দুব্‌লা করে দিতে চাইছে? তা যদি হয়, তাহলে বলতে হয় ওর দুব্‌লা করার কায়দা-কানুন আগের চেয়ে অনেক পালটেছে। নাকি ব্যাটা ভদ্দরলোক হয়ে গেছে এই চোদ্দো বছরে? আর আমি সত্যিই দুব্‌লা হয়ে গেছে কিনা তার উত্তর দেবে আমার পিস্তল।

মহিলা ঘরে কিছুটা ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘরে বাঁদিকের দেওয়ালে গোটাদশেক মোমবাতি জ্বলছে। আবছা অন্ধকার যেন টুইস্ট নাচছে প্রাণপণে। আমি কিছুটা বেকুব বনে গেলাম এ কি কোনও নাটকের সিন নাকি? কিন্তু এতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর আমি তো আর পেছিয়ে আসতে পারি না। লোকসানের মধ্যে বড়জোর আমার জীবনটা যাবে। সুতরাং মনে-মনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘরের ভেতরে এগিয়ে গেলাম।

হরিপ্রসাদ রয়েছে ঘরে। আর ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম, অনেক কিছু ওর পালটে গেছে দেখছি।

ঠিক যেন মাকড়সার জালে ঝুলে রয়েছে হরিপ্রসাদ। শেকলগুলো ঘরের দেওয়ালে আর সিলিংয়ে গাঁথা। ওর জামা-কাপড় শতছিন্ন হয়ে গতর থেকে ঝুলছে। চেহারা এখন হয়েছে তালপাতার সেপাইয়ের মতো। এককালের কালো চুল এখন ধবধবে সাদা হয়ে গেছে, পরিমাণে কমেও এসেছে অনেক। কুঁকড়ে যাওয় হাত-পায়ে কোনও মাংস নেই। শুধু কোটরে ঢোকানো জ্বলজ্বলে চোখ দুটোই বলে দিচ্ছে, ওর শরীরে এখনও জান আছে।

আমার ভীষণ-ভয়-পেয়ে-যাওয়া মুখের দিকে এমন শান্ত চোখে মহিলাটি তাকাল যে, আমার বুকটা হিম হয়ে এল। মনে হল না, আমার হাঁ করা মুখের হাঁপানি সে শুনতে পাচ্ছে, কিংবা দেখতে পাচ্ছে আমার ঠিকরে আসা বড়-বড় চোখ। মহিলা সাদামাঠা গলায় বলল, 'মিনু আমার একমাত্র মেয়ে ছিল।' তার যন্ত্রণায় ভরা চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম আমি, 'হরিপ্রসাদ যখন ওকে তুলে নিয়ে আসে তখন মেয়েটার বয়েস ছিল মাত্র পনেরো। তারপর...তারপর...তুমি—তুমি নিশ্চয়ই সেই ছেলে যার ঘাড়ে হরিপ্রসাদ সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল—' আমি অনেক চেষ্টায় মহিলার চোখে তাকালাম, 'মিনুর সর্বনাশ করে হরিপ্রসাদ ওকে গলা টিপে খুন করে,' বলে চলল সহজ কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু হরিপ্রসাদ বেঁচে রইল বহাল তবিয়তে। এটা আমার কাছে ঠিক ইনসাফ বলে মনে হয়নি। বরং অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়...।'

মোটা হরিপ্রসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে এগিয়ে গেল মহিলা, 'তাই, একদিন...ওর বাড়িতে এসে ঝিয়ের কাজ নিলাম। প্রথমটা আমার মতো চেহারা ও বয়েসের মেয়ের দিকে হরিপ্রসাদের ঝোঁক পড়েনি। কিন্তু বহু চেষ্টায় ধীরে-ধীরে আমি ওকে বোঝালাম, ন্যাকা-ন্যাকা অল্পবয়েসি বেহায়া মেয়েদের চেয়ে ঘরকন্নার কাজ জানা বয়স্কা মহিলারা অনেক বেশি সুখ-আনন্দ দিতে পারে। তখন, এখানে যে-মেয়েগুলো ও পুষত, সেগুলো ছেড়ে আমার দিকে নজর দিল হরিপ্রসাদ।' খসখসে চামড়াওলা একটা খাটিয়ে হাত

হরিপ্রসাদের দিকে উঁচিয়ে ধরল মহিলাটি : 'অবশ্য আমার আসল পরিচয় ও জানত না। তারপর একদিন...সুযোগ পেয়ে মাথায় বাড়ি মেরে ওকে অজ্ঞান করে ফেললাম। দরকারি যন্ত্রপাতি না পাওয়া পর্যন্ত ভালো করে বেঁধে ফেলে রাখলাম ওকে—' ইশারা করে সামনের শেকলগুলো দেখাল সে—যেন নতুন কোনও খেলনা পেয়ে খুশি এক শিশু : 'এভাবে ও রয়েছে আজ প্রায় তেরো বছর, বুঝলে। মাঝে-মাঝে ওকে খেতে দিই স্রেফ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। এখানে কেউ আসে না। বাজার-হাট যা দরকার হয়, সব আমিই করি—এভাবেই বেঁচে আছি আমরা দুজনে।' এই প্রথম মহিলার চোখে জল চিকচিক করতে দেখলাম।

অচেনা গলায় কোনওরকমে বলে উঠলাম, 'আমি ওকে খুন করতে এসেছিলাম।'

'না, না—দয়া করে ওই কাজটা কোরো না।' মহিলার স্বর জরুরি হয়ে উঠল। হিংস্র হাতে চোখের জল মুছে ফেলল নিমেষে : 'তোমার জীবনের কত সুন্দর বছরগুলো পচে-পচে নষ্ট হল জেলের ভেতর—আমি জানি, সব জানি। কিন্তু আমি যে আমার কচি মেয়েটাকে হারালাম,' এককালে যে হরিপ্রসাদ ছিল সেই বস্তুটার দিকে একবার দেখল মহিলাটি, তারপর বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, হরিপ্রসাদের এখন মরার ক্ষমতাটুকুও আর নেই!'

আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বেরুচি বেঢপ মহিলা আর জেলের হাওয়া খাওয়া এক দাগি। তারপর আর একটা কথাও না বলে আমি বেরিয়ে এলাম সেই অন্ধকার বীভৎস ঘর ছেড়ে। বাইরের রোদে আমার চোখ কুঁচকে গেল, ব্যথা করতে লাগল। ইচ্ছে করলে পিস্তল উঁচিয়ে আমি ঝাঁঝরা করে দিতে পারতাম হরিপ্রসাদকে। পারতাম ওকে মুক্তি দিতে। পারতাম আমার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু আমি পারিনি। তার কারণ, প্রতিশোধ নেওয়ার খেলায় ওই মহিলার কাছে আমি হেরে গেছি। সেইজন্যেই মহিলা যখন কথা বলছিল, তখন হরিপ্রসাদের হাজার চোখের ইশারা—আমাকে গুলি করো—আমি দেখেও না-দেখার ভান করেছি।

ছায়া-ছায়া

গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল মা মারা যাওয়ার পর। প্রায় আশি ছুঁই-ছুঁই বয়েসে ফরসা স্নেহময়ী মহিলা আমাকে—তাঁর একমাত্র ছেলেকে—ছেড়ে চলে গেলেন। আমার চারপাশটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। কেউ যেন টপ করে একটা সুইচ অফ করে দিল বুকের ভেতরে।

মা আর আমি বহু বছর ধরে একে অপরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছি। এই দোতলা বাড়িটায় সবসময়ে আমাদের চলাফেরার শব্দ শোনা যেত। শোনা যেত আমাদের দুজনের কথাবার্তা। এখন সেখানে আমার পায়ের শব্দ ফাঁপা প্রতিধ্বনি তোলে। আর কথাবার্তার তো কোনও প্রশ্ন নেই। কার সঙ্গেই বা কথা বলব!

মায়ের কাজ মিটে গেলে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আমাকে সান্ত্বনা জানিয়ে চলে গেলেন। আমি একা হয়ে গেলাম।

আমার মুখ-চোখে বোধহয় অসহায় ভাবটা ফুটে উঠছিল। হয়তো সেটা লক্ষ করেই সুভাষ আমার কাছে এগিয়ে এসেছিল, বলেছিল, 'আমি তোর সঙ্গে ক'টা দিন থাকব। দাঁড়া, বাড়িতে একটা ফোন করে দিই।'

সুভাষ আমার ছোটবেলার বন্ধু। এই পাড়াতেই আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। ও পেশায় উকিল। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে। পনেরো বছরের চেষ্টায় একটা ছোট অফিসও করে ফেলেছে হাইকোর্টের কাছে।

আমি ক্রমশই অবসাদের ঘূর্ণিতে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। মাকে ঘিরে বহু স্মৃতি মনে পড়ছিল। মাঝে-মাঝেই ছবির অ্যালবামটা বের করে পুরোনো ছবি দেখছিলাম। অফিসে বেরোতে আর ভালো লাগছিল না।

সুভাষ আমাকে সঙ্গ দিতে দু-দিন অফিস কামাই করে দিল। ফোন করে ওর অ্যাসিস্ট্যান্টকে চলতি মামলা সম্পর্কে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে দিল। তারপর বিছানায় আমার পাশে বসে হাত চেপে ধরে বলল, 'তুই এসব কী শুরু করেছিস?'

বয়েসকালে সুভাষ সেকেন্ড ডিভিশনে ফুটবল খেলত। ও ছিল রুপালি সঙ্ঘের একনম্বর স্ট্রাইকার। ওর কথাবার্তা আচার-আচরণ বরাবরই স্ট্রাইকারের মতো। ওকালতিতেও শুনেছি ও এই ধরনটা বদলায়নি।

আমি ওর কথার কোনও উত্তর দিলাম না।

সুভাষ অপেক্ষা করতে লাগল। ওর দিকে না তাকালেও আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ওর জ্বলজ্বলে কথা-বলা চোখ আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পর আমি ধরা গলায় বললাম, 'মাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না রে। আমি এভাবে একা বাঁচতে পারব না। আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। জীবনটাও ওলটপালট হয়ে গেছে।'

'এটা কোনও নতুন ব্যাপার নয়। সবার জীবনেই এরকম ঝড়ঝাপটা আসে। গোলমাল হয়, ওলটপালট হয়...পরে আবার সব ঠিক হয়ে যায়।'

আমি জানি, স্ত্রী আর দু-মেয়ে নিয়ে সুভাষ যথেষ্ট সুখী। ওর স্ত্রীর সঙ্গে যখনই রাস্তায় দেখা হয়, বেশ হেসে-হেসে কথা বলে। মুখে সবসময় একটা খুশির ছাপ, তৃপ্তির ছাপ। সেটা এখন আরও বেশি করে মনে পড়ল।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুভাষ একেবারে স্ট্রাইকারের ভঙ্গিতে বলে বসল, 'তোর আসলে সঙ্গিনী দরকার। নে, ঝট করে একটা বিয়ে করে ফ্যাল।'

আমার মাথায় যেন শহিদ মিনার ভেঙে পড়ল। বিয়ে! এই বয়েসে!

সুভাষ তখনও বলে চলেছে, 'অনেক আগেই তোর বিয়ে করা উচিত ছিল।'

আমি মিনমিন করে বললাম, 'কী করব! মায়ের দায়িত্ব...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনেই বললাম, 'আমি বোধহয় ঠিক নরমাল নই। এই মায়ের ব্যাপারটা...।'

এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি বহু বছর ধরে ভেবেছি। কখনও-কখনও মনে হয়েছে, মায়ের প্রতি আমার এই অস্বাভাবিক টান বোধহয় শুধুই মাতৃস্নেহ নয়। পত্রপত্রিকায় মা-ছেলের অস্বাভাবিক সম্পর্ক নিয়ে কোনও লেখা বেরোলে সেটা আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ি। এইভাবে, এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে, ইডিপাস কমপ্লেক্স টাইপের কোনও নতুন কমপ্লেক্স হয়তো আমার মনের গভীরে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে।

তা ছাড়া, আমার বাবা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন আমারই জন্যে। রাজা ইডিপাসও তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। এই মিলটুকুর কথা ভেবে আমি সবসময় মনে কষ্ট পাই। অথচ বাবার মৃত্যুর জন্যে সত্যিই কি আমি দায়ী?

আমার বয়েস তখন পাঁচ কি ছয়। বাবার সঙ্গে গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎই নাকি আমি ছুটে গিয়েছিলাম রেলিং-এর দিকে। তারপর রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম গঙ্গায়। বাবা সাঁতার জানতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশপাশের মানুষজনের চিৎকারে দিশেহারা হয়ে ছেলেকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন গঙ্গায়। আমাকে অন্য একজন সাঁতারু বাঁচিয়েছিল। কিন্তু বাবাকে আর বাঁচানো যায়নি।

তারপর থানা-পুলিশ, মায়ের কান্নাকাটি। ওই সময়কার কয়েকটা দৃশ্য আমি এই বয়েসেও বেশ মনে করতে পারি।

সুভাষ বলল, 'ওসব ফালতু চিন্তা ছাড়। তোকে বিনিপয়সায় একটাই অ্যাডভাইস দেব ঝট করে বিয়ে করে নে। বিয়ের পর বুঝবি, দিল্লির লাড্ডু কাকে বলে!'

আমি তেতো হাসি হাসলাম। মুখের ভেতরটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল। 'দেখেশুনে' অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর এই চুয়াল্লিশ বছর বয়েসে কোন মেয়ে আমার দিকে তাকাবে! আমার চেহারা কোনও মেয়েকে নিরুৎসাহ করার পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া, আমার চাকরিও অতি সাধারণ। মৌলালিতে একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মের অ্যাকাউন্ট্স এক্সিকিউটিভ।

সুভাষ আমার মনের কথা টের পেল। আমার কাঁধে চাপড় মেরে ও বলল, 'এই

বয়েসে বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছিস? আরে গাধা, চল্লিশের পরই তো জীবন শুরু। আমি একটা এক্সেলেন্ট ম্যারেজ বুরোর খবর জানি : "প্রজাপতি"। সল্ট লেকে এ-ই ব্লকে ওদের অফিস। ওরা সবকিছু কম্পিউটার দিয়ে করে। প্রথমে খুব সিরিয়াসলি তোর ইন্টারভিউ নেবে। তারপর তোর সমস্ত ইনফরমেশান ঢুকিয়ে দেবে কম্পিউটারে।'

'ইনফরমেশান মানে?' মিথ্যে বলব না, সুভাষের কথা শুনে আমার একটু-আধটু কৌতূহল হচ্ছিল।

'মানে, তোর বয়েস কত, লেখাপড়া কদ্দুর, কী চাকরি করিস, কত মাইনে পাস, শখ বলতে কী-কী আছে, টিভির কোন-কোন প্রোগ্রাম দেখতে ভালো লাগে, কী ধরনের মেয়ে তোর পছন্দ—' সুভাষ হেসে হাত উলটে বলল, 'এইসব ব্যাপার আর কী! এইসব খবর নিয়ে ওদের "ম্যাচমেকার" সফ্‌টওয়্যার প্যাকেজে ঢুকিয়ে দেবে। তারপর ওই এক্সপার্ট সিস্টেমই বলে দেবে, ওদের কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডারে তোর পক্ষে উপযুক্ত কোন-কোন মেয়ে আছে। ব্যস, তারপর সানাই—।'

কোনও ম্যারেজ বুরোয় গিয়ে হানা দেওয়ার ব্যাপারটা আমি যে আগে কখনও ভাবিনি, তা নয়। কিন্তু কোনওবারই সাহসে কুলিয়ে ওঠেনি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুভাষ উৎসাহের গলায় বলল, 'বিয়েটা করে ফেললে ভাবিস না শুধু তোরই উপকার হবে। আর-একজন নিঃসঙ্গ তরুণীও দম-আটকানো জীবন থেকে মুক্তি পাবে। তোদের আর কখনও একা-একা লাগবে না। চারপাশটা ভরাট হয়ে যাবে।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ইতস্তত করে বললাম, 'ওখানে গেলে কোনও অসুবিধে হবে না বলছিস?'

'ওদের "ম্যাচমেকার" এক্সপার্ট সিস্টেমটা একেবারে লাজবাব।' আমার পিঠে হাত রেখে সুভাষ বলল, 'ওদের বিয়েগুলো যা হয় না—একেবারে রাজযোটক। দাঁড়া, এ-সপ্তাহেই তোর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'না, না—এ-সপ্তাহে না, পরের সপ্তাহে।' আমার মনে কোথায় যেন একটা দ্বিধা আর অপ্রস্তুত ভাব কাজ করছিল।

'সারাদিন তো অন্য লোকের ইনকাম ট্যাক্স হিসেব করে-করেই গেলি। এটা কোনও লাইফ নয়। বিয়েটা কর, বুঝবি লাইফ কাকে বলে। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ফিক্স করেই আমি তোকে অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেব। ঘণ্টা-তিনেকের ছুটি নিয়ে ওদের অফিসে গিয়ে একবার কথা বলে নিবি। মৌলালি থেকে সল্ট লেক—একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাবি আর আসবি।'

আমার অফিস থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সল্ট লেক যাওয়া-আসাটা কোনও সমস্যা নয়। সমস্যা হল 'প্রজাপতি'-র মুখোমুখি হওয়া, একটা বিয়ের মুখোমুখি হওয়া।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুভাষ নরম গলায় বলল, 'কী এত ভাবছিস বল তো! আরে বাবা, এতে তো তোর লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই!'

আমি অগত্যা সুভাষের কথায় সায় দিলাম। বললাম, 'হুঁ, লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।' সেদিন বুঝিনি, কত বড় ক্ষতি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

এরপর সল্ট লেক, 'প্রজাপতি', ইন্টারভিউ, ম্যাচমেকার, ইত্যাদি মিটে গেল খুব তাড়াতাড়ি। দু-সপ্তাহ পর কম্পিউটারে ছাপানো কয়েকটা পৃষ্ঠা আর একটা রঙিন ফটোগ্রাফ তুলে দেওয়া হল আমার হাতে। সেই ফটোতেই আমি ছায়াকে প্রথম দেখি।

ছায়া সরকার। বি. এ. পাশ। বয়েস ৩২। উচ্চতা পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি। টাটা সেন্টারে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে টাইপিস্টের চাকরি করে। মাইনে পায় বাইশশো টাকা। সংসারে বৃদ্ধা মা আর এক ভাই। ভাইয়ের চার বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে, বাড়ি উল্টোডাঙ্গার তেলেঙ্গাবাগানে। নিজেদের একতলা বাড়ি।

ছায়াকে দেখে বেশ লাগল। ফরসা তেকোনো মুখ। বড়-বড় চোখ। টানা ভুরু। এক কথায় সুন্দরীই চলা চলে। ওর যে কেন এতদিন বিয়ে হয়নি কে জানে! না কি বিয়ে না করে থাকার অন্য কোনও কারণ আছে?

ওর শখ হল বই পড়া, গান শোনা, আর ফুলের বাগান করা। পাহাড় আর সমুদ্রের মধ্যে ওর পাহাড় ভালো লাগে।

মনে পড়ল, 'প্রজাপতি' ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় আমাকেও আমার শখ আর নানারকম পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। ওদের কম্পিউটার দেখছি আমার উপযুক্ত সঙ্গিনী খোঁজার ব্যাপারে যথেষ্ট 'মাথা' ঘামিয়েছে।

'প্রজাপতি'র অফিসেই আমাদের আলাপের পর্বটা সারা যেত, কিন্তু ওরাই পরামর্শ দিল, 'প্রথম পরিচয়ের ব্যাপারটা বাইরে কোথাও বসে সেরে নিলে আপনাদের অস্বস্তি কম হত।'

উপদেশটা আমারও মনে ধরল। তাই উল্টোডাঙ্গা-ভি. আই. পি. মোড়ের কাছে 'শাম্পান' চাইনিজ রেস্তরাঁয় আমরা দেখা করব ঠিক করলাম।

এক শনিবার সন্ধে সাড়ে সাতটায় 'শাম্পান'-এর কাচের দরজার সামনে আমাদের দেখা হল। আমি যেমন ছায়ার ফটো আগে দেখেছি, তেমনই ছায়াও নিশ্চয়ই আমার ফটো দেখে থাকবে। তাই আমাকে দেখামাত্রই ও চিনতে পারল। একটু ইতস্তত করে অপ্রস্তুত হাসি হাসল। বলল 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'এই তো, পাঁচ-সাত মিনিট।' আমি সহজভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম : 'চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।' আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ করে শব্দ হচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল, ছায়া শব্দটা শুনতে পাবে না তো?

ভেতরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সুন্দর করে সাজানো, তবে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। সামান্য আড়াল পেয়ে আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম। একটা কোনার টেবিল বেছে নিয়ে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

ছায়াকে আমি খুঁটিয়ে লক্ষ করলাম। মা বেঁচে থাকলে কি পুত্রবধূ হিসেবে ছায়াকে পছন্দ করতেন? নিশ্চয়ই করতেন। কারণ, ছায়াকে ওর ফটোর চেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে। তবে ওর চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত ভাব খুঁজে পেলাম। ঠিক যেন একটা ছোট্ট চড়ুই—কেউ যদি খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়ে তাহলে তক্ষুনি উড়ে পালাবে।

ছায়াকে আমার ভালো লেগে গেল।

মেনু কার্ড নিয়ে ওর পছন্দ মতো খাবারের অর্ডার দিলাম। ও মুখ নিচু করে বসে রইল। টেবিলের সিনথেটিক নকশায় আঙুল বোলাতে লাগল।

আমিও কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু দুজনেরই চুপচাপ বসে থাকাটা ক্রমশ একটা দম বন্ধ করা অবস্থা তৈরি করছিল।

শেষে মরিয়া হয়ে আমি বলে বসলাম, 'এই রেস্তরাঁটা খুব ভালো। এদের খাবার-দাবার, সার্ভিস সুপার্ব। আমি আগে অনেকবার এসেছি।'

বুঝতে পারলাম, কথাটা খুব বোকা-বোকা শোনাল, কিন্তু ততক্ষণে আমার আর কিছু করার নেই—কথাটা বলা হয়ে গেছে।

অন্য কোনও মেয়ে হলে হয়তো আমার কথা শুনে হেসে ফেলত, কিন্তু ছায়া হাসল না। ও টেবিলের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'আমি এখানে আগে কখনও আসিনি।'

আবার আমরা চুপচাপ।

'ক'দিন ধরে কী অসহ্য গরম পড়েছে!' যা-হোক একটা আলোচনা শুরুর জন্যে আমি দ্বিতীয়বার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলাম।

'যা বলেছেন! খুব শিগগিরই বৃষ্টি হওয়া দরকার।' কথাটা বলার সময় ছায়া আমার দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

'আর সপ্তাখানেকের মধ্যে বৃষ্টি না হলে চাষের খুব ক্ষতি হবে।'

'হ্যাঁ, কাল রাতের খবরে বলছিল...।'

বেয়ারা এসে টেবিলে খাবার দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এইভাবে টেনেটুনে কথাবার্তা চালিয়ে গেলাম। খাবারের প্লেট সামনে পাওয়ামাত্রই দুজনে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমরা ঝুঁকে পড়লাম প্লেটের ওপর।

বলতে গেলে টুকটাক মামুলি কথাবার্তার মধ্যেই খাওয়া শেষ হল। আমি কোল্ড ড্রিংক্স-এর অর্ডার দিলাম। ছায়া বলল, কোল্ড ড্রিংক্স-এর আবার কী দরকার। আমি তাতে ভাবলাম, আমাকে বোধহয় ওর পছন্দ হয়নি, তাই তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটাতে চাইছে। কিন্তু ভালো করে তো ওর সঙ্গে আলাপই করা হল না!

ওকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার কি যাওয়ার তাড়া আছে?'

ছায়া ইতস্তত করে বলল, 'না, আমি ভাবলাম আপনার দেরি হয়ে যাবে, তাই।'

'না, না। আমার তো বসে থাকতে বেশ লাগছে।'

'আমারও—' বলে ছায়া মুখ তুলে হাসল।

ব্যস, চোখের পলকে আমি হাজারবার শেষ হয়ে গেলাম। সেই মুহূর্তে ওর প্রেমে

পড়ে গেলাম আমি। কোনও মেয়ের হাসি এত সুন্দর হয়, তা আমার জানা ছিল না।

এর পরের একটা মাস কেটে গেল স্বপ্নের মতো। আমাদের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। ছায়ার বাড়িতে গেলাম আমি। ও-ও ওর মাকে নিয়ে একদিন এল আমার বাড়িতে। সুভাষকেও সেদিন আমি সস্ত্রীক নেমন্তন্ন করেছিলাম। ও আমাকে এক ফাঁকে আড়ালে পেয়ে পিঠে চাপড় মেরে মন্তব্য করল, 'কী মক্কেল, শেষ পর্যন্ত তাহলে কেস জিতে গেলে!'

আমাদের বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল।

কিন্তু দিনটা যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, আমার ভয় ততই বাড়তে লাগল। মেয়েদের ব্যাপারে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। ছোটবেলায় আমি বহু মেয়ের প্রেমে পড়লেও আমার প্রেমে কেউ পড়েনি। তারপর থেকে মা-ই আমাকে বরাবর আগলে রেখেছেন।

সুভাষকে একদিন আমার ভয়ের কথা বলতে ও বলল, 'তুই একটা আকাট মুখ্যু। বিয়ের দিন যখন পাকা হয়ে গেছে তখন ফুলশয্যার রাতের জন্যে অপেক্ষা করবি কেন! ছোবল না মারিস, ফোঁস করতে তো ক্ষতি নেই।'

ওর কথায় আমার হাসি পেয়ে গেল। ও এইরকমই। ওর কাছে কোনও সমস্যাই সমস্যা নয়।

সুভাষের কথা মতো বেশ কয়েকবার 'ফোঁস' করলাম। বুঝলাম, ছায়া তাতে খুশি হয়েছে। প্রথমদিন আদর পেয়ে ও যেরকম উত্তেজিত হয়ে পড়ল তাতে আমি খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু পরে দেখেছি, আদর করলে ও বেপরোয়াভাবে পাগলের মতো ছটফট করতে থাকে, যা খুশি করতে থাকে। শান্ত সুন্দর ছায়া তখন ভালোবাসার খিদেয় ভয়ঙ্কর। ওর এই লুকোনো রূপ আমাকে অবাক করে দেয়। ওর ওই পাগলামোতে আমিও তখন পাগল হয়ে উঠি। ওকে যেখানে খুশি যেমন খুশি আদর করতে থাকি।

নির্দিষ্ট দিনে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা হানিমুন করতে গেলাম শিলং-এ। তারপর ফিরে এসে সুখে দিন কাটাতে লাগলাম।

কিন্তু এ-সবই সাত বছর আগেকার কথা।

বিয়ের পর দিনগুলো নিয়মমাফিক কাটতে লাগল।

আমি আমার চাকরিতে অ্যাকাউন্টস-এর হিসেবনিকেশ নিয়ে কাটাই, আর ছায়া ওর চাকরিতে পাতার পর পাতা টাইপ করে যায়। অবসর সময়ে আমরা গান শুনি, টিভি দেখি, অথবা নাটক কিংবা সিনেমা দেখতে যাই। তা ছাড়া ছায়া বাড়ির ছাদে ফুলের বাগান করেছে—সেখানে ও সকালে আর ছুটির বিকেলে ঘণ্টাখানেক করে সময় কাটায়। আমি কখনও-কখনও ওর পাশে থেকে সাহায্য করি। ও ফুল সম্পর্কে অনেক ব্যাপার বুঝিয়ে দেয় আমাকে। সেসব শুনে আমি ঠাট্টা করে বলি, 'তুমি আগের জন্মে ফুল ছিলে।'

দিনের পর দিন যেতে লাগল। আমাদের বয়েসও বাড়তে লাগল। আমার মাথায় চুল এমনিতেই কম ছিল। সাত বছরে সেটা কমতে-কমতে মাথাটা প্রায় মহাশূন্য হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি আমার সেরকম আগ্রহ না থাকলেও একদিন অবাক হয়ে দেখি কোথা থেকে একটা ভুঁড়ির উদয় হয়েছে আমার মধ্যপ্রদেশে। তা ছাড়া গাল-গলা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে দিনে-দিনে। এখন আমাকে অতি সহজেই প্রৌঢ় বলা যায়।

এই সাত বছরে ছায়ার চেহারাও কম পালটায়নি। ওর চেহারা ভারি হয়েছে। কোমরে চর্বির থাক জমেছে। মাথার দু-একগাছা চুলও পেকেছে। চোখে সামান্য প্লাস পাওয়ারের চশমা উঠেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে ওকে আমার দারুণ লাগে। ও যখন আমাকে লক্ষ করে না তখন আমি ওকে খুঁটিয়ে দেখি। যেন কোনও অচেনা মহিলাকে দেখছি। তখন আমার মনটাকে কোনও অপরিচিত পুরুষের মন বলে ভাবার চেষ্টা করি আমি। তারপর ছায়াকে চুলচেরা বিচার করি। তাতেও বারবার একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় আমাকে : ছায়াকে আমার ভালো লাগে। সুতরাং, সময় তার নিয়মমাফিক ছাপ ফেললেও চেনা-অচেনা ছায়াকে ভালোবেসে আমার দিন কাটতে লাগল। সন্তানের অভাব ও আমাকে টের পেতে দেয়নি কখনও।

ছায়া অফিস থেকে সাধারণত আমার আগেই ফেরে। মেট্রো রেলে যাতায়াত করে বলে ওর ধকল অনেক কম হয়। কারণ, রোজই দেখি, অফিস থেকে ফেরার পরেও ওর হালকা মেকাপ নিজেকে স্নিগ্ধভাবে জানান দেয়।

বাড়িতে ফিরে ছায়া রান্নাবান্নার কাজ নিয়ে পড়ে। ঠিকে লোক এসে বাসন মেজে দিয়ে যায়। তার হয়তো খানিকপরেই আমি ফিরি। আসামাত্রই আমাকে সুন্দর এক কাপ চা করে খাওয়ায় ও। নিজেও এক কাপ নিয়ে বসে পড়ে ডাইনিং টেবিলে। টিভির সুইচ অন করে আনমনাভাবে যে-কোনও প্রোগ্রাম দেখি আমরা। আর নিজেদের মধ্যে দরকারি-অদরকারি কথা বলি।

জুন মাসের এক সন্ধেবেলা চা খেতে-খেতে ছায়া হঠাৎই বলল, 'তোমাকে কখনও বোধহয় অরুণাভর কথা বলিনি, না?'

'না তো। কে অরুণাভ?'

'আমাদের কোম্পানির জুনিয়ার ড্রাফ্ট্‌সম্যান। মাসছয়েক হল ঢুকেছে। বাচ্চা ছেলে। বড়জোর বছর বাইশ-তেইশ হবে।'

'কী করেছে ও?' আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আলতো করে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম।

একটু ইতস্তত করে ছায়া বলল, 'ছেলেটা মনে হয় আমার ওপর উইক হয়ে পড়েছে।'

'তার মানে?' আমার বেশ একটু মজাই লাগল। উনচল্লিশের মহিলার চক্করে বাইশ বছরের ছোকরা!

'নানারকম ছলছুতোয় অরুণাভ আমাদের ঘরটায় আসে। কাজের নামে এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে, আর আমার দিকে বারবার তাকায়। রোমি আর ইলাদি এ নিয়ে রোজ আমার পেছনে লাগে।'

রোমি আর ইলাদি ছায়ার অফিসের দুই লেডি টাইপিস্ট। ছায়ার মুখে ওদের কথা আগে শুনেছি।

'যাকগে, অরুণাভ এর বেশি কিছু করেনি তো?' আমি ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলাম, 'নাকি সিনেমা-টিনেমায় যাওয়ার কথা বলেছে?'

'না, না এসব নয়। ছেলেটা এমনিতে বেশ ভদ্র, আর...লাজুক টাইপের। ও শুধু আমাদের ঘরে এসে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমার এতে ভীষণ অস্বস্তি হয়। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগে।'

'এ তোমার কল্পনা, ছায়া। এসব নিয়ে বেশি ভেবো না।'

কিন্তু ছায়ার মুখে অস্বস্তির ছাপটা লেগে রইল। ও একটু আনমনাভাবে বলল, 'ব্যাপারটা ভীষণ অদ্ভুত। আমি বলতে গেলে ওর মাসি-পিসির বয়েসি। তা ছাড়া অফিসে সুন্দর-সুন্দর দেখতে অনেক ইয়াং মেয়ে আছে। ও তাদের পেছনে না লেগে আমার কাছে মরতে এসেছে কেন কে জানে!'

'ব্যাপারটা যদি তোমার বিরক্তির কারণ হয় তাহলে ওকে ডেকে একদিন কড়া করে মুখ করে দিলেই পারো—।'

কিন্তু কথাটা বলামাত্রই আমার মনে হল এ নিতান্ত অসম্ভব। কারণ, ছায়া কাউকে রূঢ়ভাবে কিছু বলতে পারে না। ও বড্ড নরম।

'যাকগে...এইরকম তাকাতে-তাকাতে একদিন ক্লান্ত হয়ে বেচারা রণে ভঙ্গ দেবে। যখন দেখবে ওর হিপনোটাইজ করার ক্ষমতা আমার ওপরে কাজ করছে না তখন অন্য মেয়ের পেছনে ছুটবে।'

অরুণাভ অধ্যায়ের সেখানেই ইতি। অন্তত আমি তাই ভেবেছিলাম।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার সময় ছায়া সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলা দরকার...।'

আমি চশমার কাচ পরিষ্কার করছিলাম। ওর গলায় একটা দুশ্চিন্তার সুর আমাকে থামিয়ে দিল। আমি তাকালাম ছায়ার দিকে। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'সারাটা সন্ধে এই একটা ব্যাপার আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে...।' ও বলল।

'কী ব্যাপার?'

'মনে আছে, তোমাকে অরুণাভ বসুর কথা বলেছিলাম?'

'অ-রু-ণা-ভ ব-সু?' আমি মনে করার চেষ্টা করলাম।

'ওই যে, আমাদের অফিসের জুনিয়ার ড্রাফট্‌স্‌ম্যান ছেলেটা—অরুণাভ।'

'ওহ্‌ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—যে তোমাকে মাঝে-মাঝে বিরক্ত করত।' একটু থেমে ওকে জিগ্যেস করলাম, 'কেন, সে আবার কী করল?'

'সোমবার ছুটির সময় ও বিল্ডিং-এর মেন গেটের কাছে অপেক্ষা করছিল। আমি জানি, ও আমার জন্যেই ওয়েট করছিল। আমাকে বেরোতে দেখামাত্রই ও কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, "টা-টা। কাল আবার দেখা হবে।" কাল, মঙ্গলবারও ঠিক

একই ব্যাপার। আর আজ ছুটির সময় ছেলেটা আমাকে এসে বলে কিনা "আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" '

'তুমি কী বললে?' বুঝতে পারছিলাম, আমার কপালে বাড়তি ভাঁজ পড়ছে।

'আমি বললাম, "কী কথা? এখানে বলুন।" তাতে ছেলেটা কী বলল জানো?'

'কী বলল?' ব্যাপারটাতে আমি আর প্রথম দিনের মতো মজা পাচ্ছিলাম না।

'ও বলল, "এখানে বলা যাবে না। কাল লাঞ্চ আওয়ারে চলুন কোথাও গিয়ে বসি—সেখানে বলব।" '

আমি একটা ঝাঁকুনি খেলাম এবার। জিগ্যেস করলাম, 'তাতে তুমি কী বললে?'

'আমি বললাম, "আপনার যদি কিছু বলার থাকে অফিসে বলবেন। আপনার সঙ্গে আমার আনঅফিশিয়াল কোনও কথা নেই।" তারপর আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছি। ও আমাকে ফলো করেনি বটে, কিন্তু তবুও আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছিল। যখন মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নামছি তখন আমার পা কাঁপছিল। ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি পড়ে যাব।'

আমি ছায়াকে কাছে টেনে নিলাম 'এসব নিয়ে আর ভেবো না। তুমি যেভাবে ওকে বলেছ তাতে ও আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

'না এলেই ভালো।' একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছায়া বলল, 'ওকে দেখে মনে হয় না ওর মাথায় কোনও গোলমাল আছে। কিন্তু ছেলেটাকে দেখলেই আমার কেমন ভয়-ভয় করে। রোমিকে এ-কথা বলেছিলাম—ও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, "তুই কোনও চিন্তা করিস না, শিগগিরই মিস্টার রোমিও টায়ার্ড হয়ে পড়বে।" '

'রোমি ঠিকই বলেছে।'

'হয়তো বলেছে...কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, রোমি আর ইলাদিও ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তায় পড়েছে। অফিসে এত অল্পবয়েসি সুন্দরী-সুন্দরী মেয়ে রয়েছে—ছেলেটা সেদিকে নজর দিতে পারত। তা না, আমার মতো সাদামাঠা ডবল বয়েসি মহিলার দিকে ওর যত ইন্টারেস্ট!'

আমি ছায়াকে বললাম যে, ও আমার চোখে মোটেই সাদামাঠা নয়। আমি ওর অফিসে চাকরি করলে হয়তো অরুণাভর মতোই কাণ্ড করে বসতাম।

ছায়া আমার গায়ে শরীরের ওজন ছেড়ে দিয়ে বসেছিল। মাথা নিচু করে আলতো গলায় বলল, 'তোমার কথা আলাদা।'

পরদিন সন্ধেবেলা আমি ওকে জিগ্যেস করলাম ওই ছোকরাটা ওকে আর বিরক্ত করেছে কি না। তাতে ছায়া বলল যে, ওকে সারাদিনে দ্যাখেনি। কিন্তু পরদিন, শুক্রবার, ও বলল যে, পারসোনেল ম্যানেজারের টেবিলে ও অরুণাভর মেডিক্যাল লিভের অ্যাপ্লিকেশান দেখেছে। ও ক'দিনের জন্যে ছুটি নিয়েছে। মাইগ্রেন না কী যেন হয়েছে। তবে সামনের সপ্তাহের গোড়ার দিকেই জয়েন করবে।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'ব্যর্থ প্রেমই কি এই মাইগ্রেনের কারণ?'

ছায়া হাসল না। বরং সিরিয়াস মুখে বলল, 'বোধহয় না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'আমি কখনও চাই না আমার জন্যে কেউ কষ্ট পাক।'

ওর কথার মধ্যে কী যেন একটা ছিল যা আমাকে নাড়া দিল। মনে হল, অরুণাভ বসুর ব্যাপারটা আমার আরও সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার।

এর মোটামুটি সপ্তাহদুয়েক পর একদিন আমি আর ছায়া ইভনিং শো-তে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎই আমার অরুণাভর কথা মনে পড়ল।

'এই ছায়া, অরুণাভ ছোকরার খবর কী বলো তো?'

আমরা হেঁটে বাস স্টপেজের দিকে যাচ্ছিলাম। বাতাসে আমাদের চুল উড়ছিল। আমার প্রশ্নে ছায়া হঠাৎই যেন শক্ত হয়ে গেল। চলার গতি সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ও ঠিকই আছে।'

'কোনওরকম ঝামেলা করছে না তো?'

'এখানে নয়। চলো, বাড়ি গিয়ে বলছি— ।'

আমি ছায়ার মুখের দিকে তাকালাম। মুহূর্তে যেন মেঘ জমেছে সেখানে। আমি আর কোনও কথা বললাম না।

আধঘণ্টা পর বাড়িতে ফিরে কফি তৈরি করতে-করতে ছায়া বলল, 'অরুণাভর ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।'

'তার মানে?'

'প্রতিদিন সকালে ও অফিস বিল্ডিং-এর মেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে—আমার জন্যে। আমাকে দেখামাত্রই "গুড মর্নিং" বলে। তারপর সারাদিন নানান ছলছুতোয় আমাদের ঘরে আসে। আবার ছুটির সময় সেই একই ব্যাপার। মেন গেটে দাঁড়িয়ে থাকে আমার জন্যে। দেখতে পেলেই কাছে এসে বলে, 'টা-টা। কাল দেখা হবে।'" '

'এ-কথা আর বলেনি যে তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে?'

'না। তবে আজ ছুটির সময় বোধহয় ও-কথা বলত, কিন্তু ইলাদি আমার সঙ্গে ছিল। তাতে অরুণাভ বেশ খানিকটা হতাশ হয়েছে বলে মনে হল। ইলাদির দিকে কেমন একটা অদ্ভুত ঠান্ডা চোখে তাকাল।'

'ঠান্ডা চোখে মানে?'

'সে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে ব্যাপারটা ইলাদিও টের পেয়েছে। আমাকে বলল যে, ছেলেটাকে দেখলে রক্ত হিম হয়ে যায়।'

'যাঃ, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি।'

আমাকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে ছায়া বলল, 'সত্যি বলছি, ছেলেটাকে দেখলে আমি কেমন নার্ভাস হয়ে যাই। আমার বুকের ভেতরটায় কেমন করতে থাকে। অথচ তার পরেই মনে হয়, ছেলেটা বোধহয় অসুস্থ, নিজের ওপরে কোনও বশ নেই। তখন বেচারার জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

আমি কফির কাপে শব্দ করে চুমুক দিয়ে বললাম, 'থাক, ওকে আর দয়া দেখিয়ো

না। অপাত্রে এসব দয়া দেখিয়ে লাভ নেই।'

'কিন্তু সত্যিই যদি ওর ভেতরে কোনও গন্ডগোল থাকে...মানে, ধরো, ও যা করে বুঝে-শুনে করে না। অনেকসময় এমন হয় না যে, মনটা একবগ্‌গা হয়ে যায়...।'

কেন জানি না, ছায়ার কথায় আমি ভীষণ বিরক্ত হলাম। ওর ওই 'একবগ্‌গা' শব্দটা হঠাৎই যেন আমাকে ধাক্কা দিল। একটু চড়া গলাতেই বলে উঠলাম, 'ও, তোমার তাই ধারণা? একবগ্‌গা মন?'

ছায়া চোখ নামাল। ইতস্তত করে বলল, 'ইলাদি বলছিল, কয়েকমাস আগে "ফেমিনা" ম্যাগাজিনে এইরকম ব্যাপার নিয়ে একটা আর্টিক্‌ল বেরিয়েছিল। তাতে নাকি লিখেছে, অনেক সময় অল্পবয়েসি ছেলেরা বয়স্কা মহিলার দিকে অ্যাট্রাক্‌টেড হয়। এটাকে বলে ফিক্সেশান। তখন সেই মহিলার উচিত ছেলেটাকে একটুও উৎসাহ না দেওয়া। তাতে দেখা গেছে, ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে যায়...নয়তো ছেলেটা অন্য কোনও মহিলার দিকে অ্যাট্রাক্‌টেড হয়।'

'তুমি ওকে এনকারেজ করো না তো?'

আমার প্রশ্নে ছায়া চমকে উঠে চোখ তুলে তাকাল। দেখলাম, ওর চোখে জল। ও চাপা অথচ তীব্র গলায় বলল, 'এটা কি একটা প্রশ্ন হল? তুমি কী ভাব আমাকে?'

আমি ছায়াকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

সে-রাতে একটু তাড়াতাড়িই আমরা শুয়ে পড়লাম। অন্ধকারে ছায়াকে অনেক আদর করলাম বটে কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গিয়েছিল। শরীরের সঙ্গে মন ঠিকমতো সায় দিতে পারছিল না। আমাদের শরীর তৃপ্ত হলেও মন অতৃপ্ত হয়ে রইল। অন্ধকার বিছানায় ক্লান্ত শরীরে আমরা চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

একসময় ছায়া বলল, 'ছেলেটা শুধু অফিসেই আমার কথা ভাবে, নাকি সবসময় ভাবে...কে জানে!'

আমি কোনও উত্তর দিলাম না, কিন্তু ওর কথাটা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল।

ছায়া খুব শিগগিরই ঘুমিয়ে পড়ল, অথচ আমার চোখে ঘুম এল না। পুবের আকাশ যখন ফরসা হয়ে এল তখন আমার খানিকটা তন্দ্রা মতন এসেছিল।

পরদিন রাত থেকে টেলিফোনের ব্যাপারটা শুরু হল।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

আমি মন দিয়ে টিভি দেখছিলাম। তাই ছায়াকে ইশারা করে ফোনটা ধরতে বললাম।

ছায়া ফোন ধরতেই আমি টিভির ভলিয়ুমটা কমিয়ে দিলাম।

আমি শুধু ছায়ার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

'হ্যাঁ। বলছি।'

'কী চান আপনি?'

'আগেই তো বহুবার বলেছি, সম্ভব নয়।'

'এভাবে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ছায়া।

'কে, অরুণাভ নাকি?' আমি জিগ্যেস করলাম। স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, একটা চাপা উৎকণ্ঠা ঢুকে পড়েছে আমার কথায়।

'ছেলেটা নির্ঘাত পাগল! নইলে এ-সময়ে কেউ ফোন করে! জানে তুমি বাড়িতে থাকবে—।'

'কী বলছিল তোমাকে?'

'ওই এক কথা—।'

'কী কথা?'

ছায়া যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল। মাথা সামান্য নুইয়ে বলল, 'বারবার বলছিল, আমার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চায়। অফিসে নয়, বাইরে কোথাও।'

'যাকগে, তুমি ঠিকই জবাব দিয়েছ। ও হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে এখানে চিঁড়ে ভিজবে না।'

ছায়া মাথার একপাশটা টিপে ধরে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমাকে এক গ্লাস ঠান্ডা জল খাওয়াবে?'

আমি তাড়াতাড়ি ওকে ফ্রিজের জল এনে দিলাম। নিতান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়লে ছায়া সহজে আমকে ফরমাশ করে না। বুঝলাম, টেলিফোনটা ওকে ভীষণরকম ধাক্কা দিয়েছে।

পরদিন রাতে আবার টেলিফোন বেজে উঠতেই আমি ফোন ধরলাম। যে ফোন করেছিল সে আমার গলা পেয়েই লাইন কেটে দিল।

একঘণ্টা পর আবার ফোন এল। আবার আমি ফোন ধরলাম, আবারও লাইন কেটে দিল লোকটা।

তৃতীয়বারে ছায়া ফোন ধরল। আমি ওর পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

'হ্যালো, কাকে চাই?'

'তো-তোমাকে....।' একটি পুরুষের কণ্ঠস্বর ইতস্ততভাবে বলল।

'আপনি কে বলছেন?' কড়াভাবে প্রশ্ন করল ছায়া।

'আ-আমি, আমি।'

'কী চান আপনি?' ছায়া বিরক্তভাবে বলল।

আমি ওর হাত থেকে রিসিভারটা টেনে নিয়ে কানে চেপে ধরলাম।

'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, ছায়া। একদিন—একটা দিন আমার সঙ্গে একটু বাইরে দেখা করো, প্লিজ—।'

'এই যে, শুনুন—' আমি রাগী সুরে বললাম, 'আমার ওয়াইফকে এভাবে বিরক্ত করা যদি আপনি বন্ধ না করেন, তাহলে ব্যাপরটা আমি পুলিশে জানাব।'

'ওয়াইফকে' শব্দটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সে ফোন ছেড়ে দিল।

ছায়া কাতর গলায় বলল, 'এভাবে চলতে পারে না। প্রত্যেকবার টেলিফোন বাজলেই আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করে ওঠে।'

আমি কয়েক মিনিট ভেবে বললাম, 'কাল আমি তোমার সঙ্গে অফিসে যাব। অরুণাভকে স্পষ্ট জানিয়ে দেব, ও যদি এই রকম অসভ্যতা করতে থাকে তাহলে আমি ওকে ছেড়ে কথা বলব না।'

জানি না আমার এ-কথায় ছায়ার কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আমি আশা করেছিলাম। হয়তো ভেবেছিলাম, ও আমাকে কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ভেবে তারিফ করবে। কিন্তু আমাকে হতবাক করে দিয়ে ও বলে উঠল, 'না, না, ওসবের কোনও দরকার নেই।'

'তার মানে?' আমি বেশ বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'মানে, নিজের ওপরে অরুণাভর ঠিক কন্ট্রোল নেই। ও...ও...আমার চিন্তাটাকে বোধহয় মাথা থেকে বের করতে পারছে না।

আমি চোয়াল চেপে বললাম, 'আমার অ্যাক্‌টিভ হেল্‌প পেলে পারবে।'

সে-রাতে আমরা দুজনে দু-পাশ ফিরে শুয়ে রইলাম। একটু পরে টের পেলাম ছায়া ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার চোখে ঘুম এল না। অরণাভ বসুর দুশ্চিন্তাটা আমার মাথার ভেতরে জাঁকিয়ে বসে রইল।

পরদিন সকাল ন'টায় পৌঁছে গেলাম টাটা সেন্টারের কাছে।

জওহরলাল নেহরু রোডে অফিস টাইমের ব্যস্ততা। বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট কার ছুটে চলেছে রুদ্ধশ্বাসে। অফিসযাত্রীরা হনহন করে হেঁটে চলেছে ফুটপাথ ধরে। কেউ-কেউ ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছে। বয়স্ক অফিসযাত্রীদের মুখে কেমন একটা নির্লিপ্ত ছাপ। সে-তুলনায় তরুণরা যথেষ্ট চনমনে।

টাটা সেন্টারের উলটোদিকের ফুটপাথে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎই আঙুল তুলে একজনকে দেখিয়ে ছায়া আমার কানে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ওই যে, অরুণাভ। রোগা মতন, লম্বা। ব্রাউন শার্ট পরে মেন গেটের ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছে।'

আমার প্রতিপক্ষকে আমি ভালো করে দেখলাম।

রোগা, লম্বা চেহারা। গায়ে বাদামি রঙের ফুলহাতা শার্ট, আর ছাইরঙা প্যান্ট। ফ্যাকাসে ফরসা মুখ। এলোমেলো চুল কপালের ওপরে এসে পড়েছে। চোখ দুটো চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে—বোধহয় ছায়াকে খুঁজছে।

সব মিলিয়ে ছেলেটার চেহারায় কেমন যেন এক সৌন্দর্য মাখানো রয়েছে। ওর মুখের উদাস ভাব যেন বলতে চাইছে, ও কবি।

বুকের ভেতরে ঈর্ষার কাঁটা টের পেলাম আমি।

'ওকে উলটোপালটা কিছু বোলো না যেন।' ছায়া চাপা গলায় বলল।

সকালে যখন ছায়াকে বলেছি, আমি ওর অফিসে যাব, অরুণাভর সঙ্গে কথা বলব,

তখন থেকেই ও আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে। যে-কোনও ব্যাপারেই কোনও অপ্রীতিকর শোরগোল হোক এটা ছায়া চায় না। ওর মনটা বড্ড নরম। এত বেশি নরম মন নিয়ে আজকের দুনিয়ায় চলা যায় না।

ওর এই শেষ অনুনয় আমার কাছে অসহ্য মনে হল। অরুণাভ ছায়াকে উলটোপালটাভাবে অনেক বিরক্ত করেছে। আর আমি ওকে উলটোপালটা কিছু বললেই যত দোষ!

আমি ছায়াকে বললাম, 'তুমি এগোও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেই চলে যাব। রাতে দেখা হবে।'

একটু ইতস্তত করে ছায়া এগিয়ে গেল।

ওকে রাস্তা পার হওয়ার সময় দিলাম আমি। তারপর আমিও রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম টাটা সেন্টারের দিকে।

অরুণাভকে আমি লক্ষ করছিলাম।

ছায়াকে দেখামাত্রই ও যেন সজীব হয়ে উঠল। ছায়া ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ও ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলতে চাইল ছায়াকে। ছায়া একটুও না থেমে ঘাড় না ঘুরিয়ে হনহন করে ঢুকে গেল ড্রাইভওয়েতে।

অরুণাভ ছায়ার চলে যাওয়া দেখছিল। সেইজন্যেই বোধহয় আমাকে খেয়াল করেনি। আমি যখন ওর খুব কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'আপনিই তো অরুণাভ বসু?' তখন ছেলেটা সাঙ্ঘাতিক চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। থতমত খেয়ে কোনওরকমে বলল, 'হ্-হ্যাঁ, আমিই...ইয়ে...অরুণাভ...।'

'আপনিই আমার ওয়াইফকে রোজ বিরক্ত করেন? বলেন যে, ওর সঙ্গে আপনার অনেক প্রাইভেট কথা বলার আছে?'

'বিরক্ত তো করি না। আমি শুধু...ওর সঙ্গে একটু...কথা বলতে চাই।'

'ওর সঙ্গে!' ছেলেটার দেখছি কোনওরকম কাণ্ডজ্ঞান নেই! আমার সামনে ছায়াকে 'তুমি' করে বলছে!

'আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে কোনও বাজে কথা বলতে চায় না।' আমি শক্ত গলায় বললাম।

অরুণাভ যেন কুঁকড়ে গেল। চাপা গলায় বলল, 'সরি। আমার ভুল হয়ে গেছে।'

'সরি বললেই সব মিটে গেল! আপনার এই অসভ্যতা আমাদের কাছে একটা নুইস্যান্স হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আই অ্যাম সরি...' ছেলেটা আবার বলল।

'ওসব সরি-টরি বাদ দিন। এভাবে কিছুতেই চলতে পারে না। যদি আপনি ওকে আবার বিরক্ত করেন, ওর আশেপাশে ছোঁকছোঁক করেন, ওর সঙ্গে উলটোপালটা কথা বলেন বা ওকে ফোন করেন, তাহলে ব্যাপারটা আমি আপনার ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজারকে জানাব—' একটু থেমে জোর দিয়ে বললাম, 'আর পুলিশকেও জানাব।'

অরুণাভ বসু কী বুঝল কে জানে। আমার কথায় বাধ্য ছেলের মতো বারকয়েক

ঘাড় নাড়ল।

আমি এতে বেশ স্বস্তি পেলাম। ছেলেটার হাবভাবে মনে হল ও পথে এসে গেছে। একটু কড়া বকুনিতেই কাজ হয়েছে দেখছি!

'তাহলে আপনি কথা দিচ্ছেন যে, ওকে আর বিরক্ত করবেন না?' আমি গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করলাম।

'বিরক্ত? ছায়াকে? কী বলছেন আপনি!' অরুণাভ ওর টানা-টানা চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে আমার চোখে সরাসরি তাকাল।

'কী বলছি বুঝতে পারছেন না?'

ছেলেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস গলায় বলল, 'আমি ছায়াকে ভালোবাসি।'

এরপর আমি যা করেছি সেটা কোনও ভদ্রলোক করে না। কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল না। তা ছাড়া সে-কাজের জন্যে কোনওরকম অনুশোচনাও আমার নেই।

আমি ওর জামা খামচে ধরেছি বুকের কাছটায়। তারপর ওকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছি কয়েকবার। ওর হাত-পা তালপাতার সেপাইয়ের মতো ল্যাকপ্যাক করছিল। শেষে ওকে এক জোরালো ধাক্কা দিয়ে আমি ছিটকে ফেলে দিয়েছি।

অরুণাভর পলকা দেহটা ছিটকে পড়েছিল কয়েকহাত দূরে। শান বাঁধানো ড্রাইভওয়েতে মাথা ঠুকে গিয়ে ওর মারাত্মকভাবে ব্যথা লাগতে পারত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরকম কিছু হল না। ও ছিটকে পড়েই দু-একবার গড়াগড়ি দিয়ে মাকড়সার মতো উঠে দাঁড়াল। হাত দিয়ে জামা-প্যান্ট ঝেড়ে নিয়ে প্রায় দৌড়ে ঢুকে গেল বিল্ডিং-এর ভেতরে।

আমার কাছাকাছি দু-তিনজন লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। একজন জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, দাদা?'

আমি মাথা নেড়ে 'কিচ্ছু না' বলে হনহন করে বেরিয়ে এসেছি রাস্তায়। আমার মাথার ভেতরে কোথায় যেন একটা শিরা দপদপ করছিল।

সেদিন রাতে ছায়া খেতে বসে ইতস্তত করে বলল, 'তুমি ওরকম করে ওর গায়ে হাত না তুললেই পারতে।'

আমি ওকে জিগ্যেস করলাম যে, ছুটির সময় অরুণাভ ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে সুযোগ খুঁজছিল কি না।

উত্তরে ছায়া বলল, 'না—ছুটির সময় ওকে দেখিনি।'

'তাহলেই দ্যাখো, আমার ওষুধে কাজ হয়েছে। অরুণাভ ওর ভুল বুঝতে পেরেছে।'

এর কয়েকমিনিট পরেই টেলিফোন বেজে উঠল।

আমি রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, 'হ্যালো—।'

'আমি অরুণাভ বলছি।' অল্পবয়েসি পুরুষ কণ্ঠস্বর বলল।

'আজ সকালেই আপনাকে বারণ করলাম, আর আপনি...।'

আমার কথার ওপরে কথা বলল যুবক, 'ছায়ার সঙ্গে একটু কথা বলব। জাস্ট এক মিনিট কথা বলব।'

'ব্লাডি বাস্টার্ড।' বলে আমি ঠকাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ছায়ার দিকে ফিরে বেশ উত্তেজিত গলায় বললাম, 'ছেলেটা সহজে শোধরাবে বলে মনে হচ্ছে না। দাঁড়াও, ওর ব্যবস্থা করছি।'

'কী করবে তুমি?' ভয়ার্ত স্বরে ছায়া জানতে চাইল।

'কাজে করে না দেখাতে পারলে ফালতু হুমকি দেওয়ার মানে হয় না।'

'না, না, কিছু করতে যেয়ো না। প্লিজ!'

'এখন আর ফেরার পথ নেই, ছায়া, একটা হেস্তনেস্ত আমাকে করতেই হবে।'

'প্লিজ, আমার কথা শোনো, প্লিজ—।'

ধীরে-ধীরে কীভাবে আমি শান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়লাম তার আর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, সে-রাতে ছায়া আমাকে আদরে-আদরে পাগল করে দিল। ওর কথা শোনার পুরস্কার যদি এতই মধুর হয় তাহলে ওর সব কথা শুনতে আমি রাজি আছি।

তবে মনে-মনে ঠিক করলাম, সুভাষের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে একবার আলোচনা করে দেখব। কিন্তু আমার ইচ্ছের কথাটা ছায়াকে আর জানালাম না।

সুভাষ সেই বরাবরের মতোই হাসিখুশি বেপরোয়া দোস্ত। আমাকে পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'বল, কী হেল্প দরকার? তোর মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে এইমাত্র একটা আস্ত কোলাব্যাঙ গিলে এসেছিস—।'

আমি ওকে অরুণাভর ব্যাপারটা খুলে বললাম। কিছুই বাদ দিলাম না।

সুভাষ বেশ মন দিয়েই আমার কথা শুনছিল। তবে দু-একবার মনে হল ওর ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস ফুটে উঠল।

আমার কথা শেষ হলে ও হেসে বলল, 'এ তো ছায়ার পক্ষে বিরাট একটা কম্‌প্লিমেন্ট। আর তোর পক্ষেও কম্‌প্লিমেন্ট—কারণ, ছায়াকে তুই-ই পছন্দ করেছিস।' একটু থেমে ও সিরিয়াস গলায় যোগ করল, 'তবে ব্যাপারটাতে তোর বিরক্ত হওয়াটাও স্বাভাবিক... বুঝতে পারছি।'

'তুই হলেও কি বিরক্ত হতিস না?' আমি ওর সমর্থন চাইলাম।

টেবিল থেকে একটা পেন তুলে নিয়ে সামনে রাখা খবরের কাগজের ওপরে আঁকিবুকি কাটতে লাগল সুভাষ। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আমি হয়তো বিরক্ত হতাম। কিন্তু তুই তো অনিন্দিতাকে জানিস—।'

অনিন্দিতা সুভাষের বউয়ের নাম। কিন্তু ও ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে পারলাম না।

'মানে, কী বলতে চাইছিস?'

'অনিন্দিতা আর ছায়া তো ঠিক এক টাইপের নয়। অনিন্দিতা হলে এক মিনিটে

ওকে ঠান্ডা করে দিত।'

'ছায়া ঠিক কোল্ড বিহেভ করতে পারে না। ও...একটু নরম টাইপের।'

'জানি। নরম হওয়া তো ভালোই। তার মানে ভাবিস না আমি বলছি ও ছেলেটাকে আশকারা দিচ্ছে।'

'না, সে হয়তো দিচ্ছে না...।'

'আশ্চর্য!' আপনমনেই বলল সুভাষ, 'ছায়ার বয়েসি একজন মহিলার সঙ্গে...কত যেন বয়েস তোর বউয়ের?'

'ঊনচল্লিশ।'

'একজন ঊনচল্লিশ বছর বয়েসের মহিলার জানা উচিত এরকম সিচুয়েশান কীভাবে ট্যাক্‌ল করতে হয়।'

'ছায়া ওসব জানে না। আমি চাইছি ব্যাপারটা যেভাবেই হোক খতম হোক। তুই একটা সাজেশান দে।'

সুভাষ সামান্য ভুরু কুঁচকে কাগজে কালির আঁচড় কাটতে-কাটতে বলল, 'আমার অ্যাডভাইস হল—কিচ্ছু করার দরকার নেই। এর মধ্যেই তুই অনেক কিছু করে ফেলেছিস। টেকনিক্যালি তোর ওপরে অ্যাসাল্টের চার্জ আনা যায়—তুই পাবলিক প্লেসে অনেক উইটনেসের সামনে অরুণাভ বসুর গায়ে হাত তুলেছিস। বরং ছায়াকে বল ছেলেটাকে পাত্তা না দিতে। ও গায়ে পড়ে কথা বললেও ছায়া যেন কোনও জবাব না দেয়। আর যদি ও সবসময়ে কোনও বান্ধবীর সঙ্গে থাকে তাহলে অরুণাভ কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। কোনও পুরুষই এরকম ঠান্ডা লড়াইয়ে বেশিদিন টিকতে পারে না।'

'অরুণাভ ঠিক পারবে। আচ্ছা, ব্যাপারটা পুলিশে জানালে কেমন হয়?'

সুভাষ সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল 'উহুঁ। পুলিশ কী করবে? অরুণাভ তোদের ভয় দেখায়নি। তোদের বাড়িতে কোনও অশান্তি করেনি। শুধু কয়েকবার ফোন করেছে। পুলিশ হয়তো ওকে ডেকে একটু শাসিয়ে দেবে। ব্যস, তারপর আবার যে কে সেই—।'

'তুই যা-ই বলিস আমি কিন্তু একটা স্টেপ নিতে চাই। ওর এগেইনস্টে কেস করলে কেমন হয়? তুই তো উকিল—তুই কিছু একটা করতে পারিস না?'

সুভাষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পেনটা টেবিলে রেখে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। সরাসরি তাকাল আমার দিকে 'এ-দেশটা যে আমেরিকা নয় সেটা ভুলে যাস না। ওখানে যে-কোনও ব্যাপার নিয়ে যে-কেউ মামলা করতে পারে—আর তাতে কাজও হয়। আর আমাদের এখানে খুনের আসামিও অক্লেশে ছাড়া পেয়ে রাস্তায় বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়ায়। মানছি, অরুণাভ ছেলেটা তোর বউকে বিরক্ত করে—কিন্তু এখনও পর্যন্ত গায়ে হাত দেয়নি। গায়ে হাত দিতে পারে এই সম্ভাবনার কথা বলে কি কোনও মামলা করা যায়! এ ছাড়া ফ্যাক্টগুলো একবার দ্যাখ। ছেলেটা অফিসে তোর বউয়ের আশেপাশে

ঘুরঘুর করে। কিন্তু সেটা ছেলেটারও অফিস। ও তোর বাড়িতে কয়েকবার ফোন করে বিরক্ত করেছে। কিন্তু এই ফোনগুলো তো ঠিক অশ্লীল টেলিফোন নয়—তাহলে ব্যাপারটা কোর্টে কতটুকু দাঁড়াবে! এমনিতে ছেলেটা বেশ শান্ত ভদ্র। সুতরাং ওর আচরণকে অশ্লীল বলে প্রমাণ করা খুব শক্ত। সেইজন্যেই বলছি, বেকার এত খরচের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। ক'টা দিন চুপচাপ থাক, দেখবি ব্যাপারটা নিজে থেকেই মিটে গেছে।'

'তার মানে ব্যাপারটা নিয়ে তুই কিছু করতে চাস না?' আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম।

সুভাষের প্রশংসা করতেই হয়। কারণ, আমার কথায় একটুও না রেগে গিয়ে ও হাসি মুখে বলল, 'তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু জেনে রাখ, আমি সবসময় তোর পাশেই আছি। তুই না একটু আগে বললি, কাজে করে না দেখাতে পারলে ফালতু হুমকি দিয়ে লাভ কী। আমার কথাও ঠিক তাই। আমি অরুণাভকে বেশ কড়া করে একটা চিঠি লিখে বলতে পারি যে, আমার মক্কেলের স্ত্রীকে আপনি আর বিরক্ত করবেন না। যদি আপনি এই নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হব। কিন্তু আমি জানি, ওই লেখা পর্যন্তই সার। মামলা করে কোনও কাজের কাজ আমি করে দেখাতে পারব না।' সুভাষ আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলল একবার, তারপর বলল, 'যাই হোক, তুই যদি মনে করিস অন্য কোনও উকিলের সঙ্গেও কথা বলে দেখতে পারিস।'

সুভাষের শেষ কথাটায় বোধহয় একটু অভিমান ছিল, কিন্তু আমার মনের অবস্থাটা ওকে আমি কেমন করে বুঝিয়ে বলব! বুঝতে পারছি, সুভাষ আমাকে ঠিক পরামর্শই দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল আমি দেওয়ালে মাথা কুটে মরছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুভাষ বলল, 'ব্যাপারটাকে তুই হালকাভাবে নে। একটা ঠাট্টা ভেবে উড়িয়ে দে। দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম : 'সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বোধহয় একটু সেকেলে ধাঁচের মানুষ। যাই হোক, তোর অনেক সময় নষ্ট করলাম...।'

'তবে তুই কিন্তু মাথা গরম করে কিছু করে বসিস না। কোনও অবস্থাতেই অরুণাভর গায়ে হাত তুলিস না। তাহলে কেস পুরো ঘুরে যাবে। বরং চেষ্টা কর ব্যাপারটা ঠাট্টা ভেবে উড়িয়ে দিতে। দেখবি ছ'মাসের মধ্যে তুই ওই ছোকরার নামও ভুলে গেছিস।'

না, সুভাষের কথা সত্যি হয়নি। অরুণাভ বসুর নাম আমি ভুলতে পারিনি।

আজ পুরোনো কথা ভাবলে মনে হয়, সবচেয়ে ভালো হত ছায়া যদি ওই চাকরিটা ছেড়ে অন্য কোনও কোম্পানিতে জয়েন করত। কিন্তু ও প্রায় চোদ্দো বছর ওই কোম্পানিতে চাকরি করছে। কোম্পানির সকলেই ওকে বেশ পছন্দ করে। মহিলাদের পক্ষে কাজের পরিবেশও ওখানে খুব ভালো।

এ ছাড়া আমার মনে হয়েছিল, চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া মানে অরুণাভর কাছে হেরে

যাওয়া। জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই সৎ সহজ-সরল মানুষগুলো বিকৃত রুচির স্বার্থপর মানুষের কাছে হেরে যায়। ছায়ার ক্ষেত্রেও ঠিক এরকমটাই যে হবে সেটা আমি কেন যেন মেনে নিতে পারছিলাম না।

এর মধ্যে হঠাৎই একটা সুযোগ এসে গেল।

ছায়াদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের একমাত্র মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে আমি সস্ত্রীক নেমন্তন্ন পেলাম। অর্থাৎ, কোম্পানির প্রত্যেক বিবাহিত কর্মীকে জুটি বেঁধে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল।

ছায়াদের অফিসেই বিরাট পার্টি দেওয়া হল। কলকাতার সবচেয়ে নামী ক্যাটারার আপ্যায়নের দায়িত্ব পেল। স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে দামি পানীয়েরও অফুরান ব্যবস্থা ছিল।

এই নৈশভোজের পার্টিতে ছায়ার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম আমি।

ভদ্রলোকের নাম মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চাশ পেরোনো বয়স। মোটাসোটা চেহারা। মাথার অর্ধেকটাই ফাঁকা। বেশ ছটফটে চনমনে রসিক মানুষ। চওড়া কাঁচাপাকা গোঁফ দেখে মনে হয় এককালে মিলিটারিতে ছিলেন।

ছায়া যখন অন্য অনেকের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত তখন আমি এগিয়ে গেলাম মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে।

নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, 'মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার সঙ্গে একটু আলাদা কথা ছিল।'

ভদ্রলোক সৌজন্যের হাসি হাসছিলেন। আমার কথা শুনেই খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর মুখের ভাবটা এমন করলেন যে, যে-কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্তে যে-কোনও গোপন কথা বলতে পারে।

আমরা লোকজনের ভিড় থেকে একটু দূরে সরে গেলাম।

মিহির বন্দোপাধ্যায় নিচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ—।'

'এখানে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? ওকে আমরা সবাই খুব লাইক করি।' আমি কোম্পানি সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করতে পারি ভেবে মিহিরবাবু ছায়ার আগাম প্রশংসা শুনিয়ে দিলেন।

'না, না, এখানে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এখানে কাজ করে ও খুব স্যাটিস্‌ফায়েড। তবে রিসেন্টলি একটা ঝামেলার উৎপত্তি হয়েছে...।'

'ঝামেলা? কই, ছায়া আমাকে কিছু বলেনি তো!' মিহিরবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল।

আমি তখন অরুণাভ বসুর ব্যাপরটা ওঁকে খুলে বললাম।

আমার গল্প যতই এগোতে লাগল মিহিরবাবুর কোঁচকানো ভুরু ততই মসৃণ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওঁর মুখে প্রতিপক্ষের ভাব ফুটে উঠল। একটা কঠিন পরদা নেমে

এল মুখের ওপরে।

'আপনার বোধহয় কিছুতে সর্পভ্রম হয়েছে।' মিহির বন্দোপাধ্যায় ঠান্ডা গলায় বললেন, 'অরুণাভ খুব ভালো ছেলে। প্রচণ্ড ডেডিকেটেড আর এফিসিয়েন্ট।'

'আমি ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো ওঁর সঙ্গে এ-ব্যাপারে একটু কথা বলবেন—।'

চুকচুক শব্দ করে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন মিহিরবাবু। কারও নির্বোধ মন্তব্যে অতিরিক্ত জ্ঞানী পণ্ডিতের মতো অনুকম্পার হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, 'ছেলেমানুষি ছাড়ুন মশাই। আমরা দু-হাজার সালের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি এটা ভুলবেন না! একটা কচি ছেলে আপনার ওয়াইফকে দেখে একটু...ইয়ে...অ্যাট্রাক্টেড হয়েছে। এর মধ্যে দোষের কী আছে! বরং ছায়ার এতে প্রাউড ফিল করা উচিত যে, এই বয়েসেও শি ইজ স্টিল অ্যাট্রাক্টিভ। অরুণাভ ওর সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি—শুধু কথা বলতে চেয়েছে। এতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড।' গলা একটু নামিয়ে মিহিরবাবু বললেন, 'অফিসে কাজ করতে-করতে এরকম বন্ধুত্ব অনেক হয়। সে আপনিও জানেন, আমিও জানি। এতে ক্ষতি তো কিছু নেই—বরং লাভ। কোম্পানির টোটাল আউটপুট অনেক বেড়ে যায়। তা ছাড়া কুকাজের ইচ্ছে থাকলেও তারা অফিসে তো আর কিছু করতে পারছে না! প্রথমত, দুজনের একই ইচ্ছে থাকা দরকার। আর সেকেন্ডলি, ওদের কোনও সুটেব্‌ল প্লেস খুঁজে বের করতে হবে।'

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্লজ্জ ইঙ্গিতগুলো শুনতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম, আমার কান গরম হয়ে গেছে। মাথার দপদপানি শুরু হয়ে গেছে।

ইতস্তত করে আমি বললাম, 'আমি ঠিক সে-কথা বলতে চাইনি। অরুণাভ যেভাবে আমার ওয়াইফকে বিরক্ত করছে তাতে...।'

আমাকে বাধা দিয়ে মিহিরবাবু একটু শক্ত গলায় বললেন, 'এটা আমাদের কোম্পানির কোনও প্রবেলম নয়, আপনার প্রবলেম। তা ছাড়া ছায়া যদি ঠিক থাকে তাহলে কেউই ওকে ডিসটার্ব করে কোনও সুবিধে করতে পারবে না। আর অরুণাভ খুব ভদ্র, এফিসিয়েন্ট, আর ডেডিকেটড এমপ্লয়ি। ওকে ছেড়ে দিলে কোম্পানির ক্ষতি হবে।'

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় যা বোঝাতে চাইলেন তা বোধহয় সাদা কথায় এই : অরুণাভ এক নম্বর কাজের ছেলে। যতক্ষণ ওর কাছ থেকে আমরা ঠিকঠাক কাজ পাচ্ছি ততক্ষণ ও ক'জন লেডি টাইপিস্টের সঙ্গে শুল সে-নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

'আপনি তাহলে এ-ব্যাপারে কোনও হেল্‌প করতে পারবেন না?' আমি নছোড়বান্দা হয়ে জিগ্যেস করলাম।

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় মশা-মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন 'এ-ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। ভুলে যাবেন না, এটা চার্নকের আমল নয়।' তারপর আমার কাঁধে আলতো চাপড় মেরে বললেন, 'ছেলেমানুষি ছেড়ে দিন—খান-দান, এনজয়

করুন—।'

আলোচনার সেখানেই ইতি।

আমার মনে হল, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দু-গালে দুটো থাপ্পড় কষিয়ে গেলেন।

পরে ছায়া আমাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে অত কী কথা বলছিলে?'

আমি মিথ্যে কথা বললাম, 'তোমাদের কোম্পানির ডিরেক্টরসাহেবের জীবনী শুনছিলাম—।'

আমার মনে হয়েছিল, সত্যি কথা বললে ছায়ার সেটা পছন্দ হবে না।

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণাভ বা ছায়াকে এ-ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু সেই নেমন্তন্নের পর থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হতে লাগল। ছায়াকে যখনই জিগ্যেস করি অরুণাভ ওকে আর বিরক্ত করেছে কি না, ও বলে 'আজ সারাদিনে ওকে দেখতে পাইনি,' অথবা 'যখন আমি অফিস থেকে বেরোচ্ছি তখন ও একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল—তবে আমাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হয় না।'

ছায়ার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। হয়তো টেনশানটা কেটে গেছে বলেই ও সহজ স্বাভাবিক উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে আবার। ও রোজ সকালে মেদ কমানোর হালকা ব্যায়াম করতে শুরু করল। সকালের 'স্টে ফিট' আর 'গুড মর্নিং ইন্ডিয়া' প্রোগ্রাম দেখতে লাগল টিভিতে। আমি যখন বললাম, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ ফিগারের দিকে নজর?'

তার উত্তরে ছায়া বলল, 'না গো, বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছি। অল্প একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে উঠি। ইলাদিকে একদিন বলছিলাম...তখন ইলাদিই সাজেশান দিল। জানো তো, ইলাদি দারুণ স্লিম—।'

কয়েকমাসের মধ্যেই ছায়া বাড়তি মেদ অনেক কমিয়ে ফেলল। ওর বয়েস যেন কমে গেল দশ বছর। ওর টানা-টানা চোখ অনেক বেশি সজীব আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল—অন্তত আমার চোখে। ওর হাঁটা-চলা-কথা যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। অরুণাভর বিশ্রী ব্যাপারটা ও যেন ভুলেই গেছে।

আমি কিন্তু অরুণাভর ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। তা ছাড়া খবরের কাগজ পড়ার সময়, টিভি সিরিয়াল দেখার সময়, রাস্তাঘাটের কোনও ঘটনায় এক কণা সুযোগ পেলেই ওই ব্যাপারটা নোংরাভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল।

খবরের কাগজের পাতা খুললেই অবৈধ সম্পর্ক, ত্রিকোণ প্রেমের পরিণামে খুন, আস্তাকুঁড়ে সদ্যোজাত শিশু—শুধু এইসব খবর। আগে এ-জাতীয় খবরগুলো আমি পড়তাম না, হেডিং পড়েই জোর করে পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম অন্য খবরে। কিন্তু এখন অদ্ভুত এক আকর্ষণ এই খবরগুলো পড়তে যেন আমাকে বাধ্য করে।

এ ছাড়া রয়েছে রগরগে টিভি সিরিয়াল।

অবৈধ সম্পর্ক আর খুনোখুনি ছাড়া যেন আর কোনও বিষয়বস্তুই খুঁজে পায় না

এই সিরিয়ালের প্রযোজকরা। তার ওপর হিন্দি ছবির যেসব গানের দৃশ্য দেখানো হয় তা যেন আগাপাস্তলা যৌনতায় মোড়া। তাকিয়ে দেখা যায় না এমন সব কুরুচিকর দৃশ্য।

রাস্তাঘাটে চলার সময় আমি কি আগে চোখ বন্ধ করে চলতাম? নইলে বাসস্টপের ক্যানোপির থামের গায়ে, লাইটপোস্টে, পাবলিক ইউরিনালে 'ঋতু বন্ধ' বা 'যৌন রোগের সমস্যা' হেডিং দেওয়া নির্লজ্জ পোস্টারগুলো এতদিন আমার চোখে পড়েনি কেন!

সব মিলিয়ে বলতে গেলে আমাদের গোটা সমাজটাই যৌনতার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। ভালোই হয়েছে আমার আর ছায়ার কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। হলে সে-ও তো এই গা-রি-রি করা যৌনতার মধ্যে মানুষ হত!

এ ছাড়া 'অরুণাভ' নামটাও আমার নজর কাড়তে লাগল।

রাস্তার পোস্টারে ফাংশানের বিজ্ঞাপনে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়, টিভি সিরিয়ালের কলাকুশলীদের নামের মধ্যে, টেলিফোনের ডিরেক্টরিতে, আমার অফিসের কাগজপত্রে—এককথায় সর্বত্র ওই নামটা আমাকে যেন তাড়া করে বেড়াতে লাগল।

মোদ্দা কথা হল, সেক্স আর অরুণাভ—এই দুটো ব্যাপার যেন আমাকে আকঁড়ে ধরল। মা মারা যাওয়ার পর এই প্রথম আমার মনে আবার সংশয় দেখা দিল : আমি কি মনের দিক থেকে সুস্থ? যে-জিনিস আমি অপছন্দ করি ঠিক সেটাই আমি দেখতে চাই—তা থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। আমি কি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না? মানসিক সুস্থতার ব্যাপারেও কি আমি পিছিয়ে পড়ছি? আজকের আধুনিক সমাজে শিক্ষিত মানুষরাও ভাবে বিবাহিত জীবনেও দু-চারটে বাড়তি খুচরো প্রেম থাকাটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়! শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর চেয়ে শিরদাঁড়া কাত করে বিছানায় শুয়ে পড়াটাই বড় কথা!

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা দপদপ করতে থাকে, চোখে ঝাপসা দেখি, হাত থেকে কফির কাপ খসে পড়তে চায়।

একদিন সকালে বারান্দায় চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে সূর্য ওঠা দেখতে-দেখতে হঠাৎই আমার মনে হল, আধুনিক সমাজে আমি যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না তার কারণ, আমাদের সমাজটাই অসুস্থ। সেখানে আমার মতো সুস্থ মানুষ কেমন করে নিজেকে মানিয়ে নেবে! এই অসুস্থ সমাজের চারপাশে শুধুই যৌনতা। যৌনতা দিয়ে এরা ব্রেসিয়ার থেকে শুরু করে সাবান পর্যন্ত নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি করে। এই সমাজের একজন মাথা শ্রীমিহির বন্দ্যোপাধ্যায় অনায়াসে বলতে পারেন 'একটা কচি ছেলে আপনার ওয়াইফকে দেখে একটু...ইয়ে...অ্যাট্রাক্টেড হয়েছে, এর মধ্যে দোষের কী আছে!' এই অসুস্থ সমাজের একজন তরুণ উদ্ধতভাবে ছায়ার স্বামীকে বলতে পারে, 'আমি ছায়াকে ভালোবাসি'। এই অসুস্থ মানুষগুলোই তো জোট বেঁধে একটা অসুস্থ আধুনিক সমাজ তৈরি করেছে!

নেহাতই আমার কপালজোর বলতে হবে যে, এই অসুস্থ সমাজে বড় হয়ে উঠেও

আমি সুস্থ থাকতে পারছি। এজন্যে মায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।
এরপর একদিন গোলাপ ফুলের ঘটনাটা ঘটল।

আমাদের জীবনটা ক্রমশ যেন একঘেয়ে হয়ে আসছিল। প্রতিদিনকার কাজগুলো যেন কোনও এক অদৃশ্য নিয়মে রুটিনমাফিক হয়ে যাচ্ছিল।

বিয়ের পর সেই যে শিলং-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম, তারপর আমাদের আর সেভাবে কোথাও যাওয়া হয়নি। তাই একঘেয়েমি কাটাতে ঠিক করলাম, ক'দিনের জন্যে পুরী বেড়াতে যাব। অনেকদিন আমি সমুদ্র দেখিনি।

ছায়াকে প্রস্তাবটা দিতেই ও খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। তবে এও বলল যে, অফিস থেকে ও সাতদিনের বেশি ছুটি পাবে না। আমি বললাম, সমুদ্রের পাড়ে সাতটা দিনই অনেক। উত্তরে ছায়া মজা করে বলল, শুধু সাতটা দিন নয়, সাতটা রাতও আছে বোনাস হিসেবে।

সুতরাং আগাম সব ব্যবস্থা করে ফেললাম আমি। যাওয়া-আসার টিকিট আর হোটেলের অ্যাডভান্স বুকিং-এর স্লিপ ছায়াকে দেখিয়ে বললাম, 'এবার বলো, পুরীতে গিয়ে সাতদিন কী করবে, কোথায়-কোথায় বেড়াবে?'

ছায়া বলল, 'তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি—ওসব মাথাব্যথা তোমার।'

তখন দুজনে মিলে নানান জল্পনাকল্পনা শুরু করে দিলাম।

যদিও রওনা হতে তখনও প্রায় দু-মাস দেরি।

পুরী রওনা হওয়ার সাতদিন আগে, এক রবিবার, আমরা ঠিক করেছিলাম সকালেই ট্রেন ধরে ব্যান্ডেল চার্চে বেড়াতে যাব। ছায়া বেশ কয়েকবার ব্যান্ডেল চার্চের কথা বলেছে, কিন্তু আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

অথচ এমনই কপাল যে, সেদিন সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি, আকাশের মুখ ভার।

আমি বৃষ্টির মধ্যেই বেরোতে চাইছিলাম, কিন্তু ছায়া বলল, 'কী দরকার! যদি পট করে ঠান্ডা লেগে যায়! তাহলে ও-সপ্তাহে পুরী যাওয়াটাই মাটি হয়ে যাবে।'

আমিও ভেবে দেখলাম, কথাটা ও ঠিকই বলেছে। তাই আমরা বাড়িতেই থেকে গেলাম। বর্ষার সঙ্গে তাল রেখে ছায়া খিচুড়ি আর ডিমভাজা করল।

সে-রাতে সবে আমরা খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ করেছি এমন সময় কলিংবেল বাজল।

আমি এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুললাম।

বাইরে কেউ নেই। নির্জন গলিতে মাঝারি তালে বৃষ্টি পড়ছে।

কে বাজাল কলিংবেল!

বিরক্ত হয়ে চলে আসছি, হঠাৎই নজরে পড়ল দরজার পাশেই নীল রঙের একটা

পলিথিনের প্যাকেট পড়ে রয়েছে। প্যাকেটের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা লেগে আছে।

ইতস্তত করে ওটা তুলে নিলাম। উঁকি মেরে দেখি প্যাকেটের ভেতরে রয়েছে একগুচ্ছ লাল গোলাপ।

ফুলের তোড়াটা বের করে নিয়ে ভাবছি এরকম কাজ কে করতে পারে, এমন সময় ছায়া আমার পেছনে এসে দাঁড়াল 'কে এসেছে?'

আমি বললাম, 'কাউকে তো দেখছি না—।'

কথাটা বলে আমি এক পা বাইরে বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্যেহ যতদূর চোখ যায় দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেরকম কাউকে নজরে পড়ল না।

প্যাকেটটা আমার বাঁ হাতে ধরা ছিল। ছায়া তার মধ্যে কী একটা দেখতে পেয়ে বলে উঠল, 'প্যাকেটের ভেতরে ওটা কী?'

নজর করে দেখলাম, সত্যিই প্যাকেটের ভেতরে ভাঁজ করা একটা কাগজ রয়েছে।

আমার বুকের ভেতরে আচমকা একটা টিপটিপ শব্দ শুরু হল।

ঠিক তখনই ছায়া 'ও মা, কী সুন্দর গোলাপ!' বলে আমার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা টেনে নিল। নাকের কাছে নিয়ে চোখ বুজে ঘ্রাণ নিল। ওর অজান্তেই যেন মুখ দিয়ে তৃপ্তির 'আঃ—' শব্দ বেরিয়ে এল অস্ফুটে।

ততক্ষণে আমি কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করেছি।

ছায়াকে, অফুরন্ত ভালোবাসা নিয়ে। —অরুণাভ

আমার গা রি-রি করে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলাম, 'বাস্টার্ড।' তারপর চিঠিটা ছায়ার হাতে দিলাম।

ও বিস্ময় মাখানো চোখে পড়ল চিঠিটা। আমি ওর হাত থেকে এক ঝটকায় গোলাপের তোড়াটা কেড়ে নিলাম। গলিতে এক পা এগিয়ে ওটা আবর্জনার স্তূপে ছুড়ে ফেলতে যাব, ছায়া আমার উদ্যত হাত চেপে ধরল 'ফুলগুলো ফেলছ কেন! ওরা কী অপরাধ করেছে?'

ছায়ার মাথায় মুখে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। ও টানা-টানা চোখে সরাসরি দেখছে আমাকে। আমিও অবাক হয়ে আমার বউকে দেখতে লাগলাম। একটা দুশ্চরিত্র পাগল ছেলে ওকে গোলাপের তোড়া উপহার দিয়েছে। সেই উপহার ও কাছে রাখতে চায়!

আমি ছায়ার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফুলগুলো ছুড়ে দিলাম বৃষ্টি-ভেজা গলিতে। কিন্তু ছায়া শেষ মুহূর্তে আমার হাত ধরে টান মারায় আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?' বলে ছায়া বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে গিয়ে ফুলের তোড়াটা তুলে নিয়ে এল। প্রায় আদর করার ঢঙে ওটা বুকের কাছে আগলে নিয়ে এল বাড়ির ভেতরে। তারপর বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

আমিও পালটা ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'মাথা খারাপ আমার হয়নি—হয়েছে তোমার।'

সেই মুহূর্তে আমি ভুলে গেলাম, ছায়া ফুল ভালোবাসে। একসময় আমিই ওকে বলেছি,

ও আগের জন্মে ফুল ছিল।

ছায়া আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ফুলের তোড়াটা নিয়ে ঢুকে পড়ল বসবার ঘরে। ফুলগুলো সেন্টার টেবিলের ওপরে ফুলদানিতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল। আপনমনেই গুনগুন করে বলল, 'কী সুন্দর গন্ধ!'

আমি গুম হয়ে ছায়ার নির্বিকার কার্যকলাপ লক্ষ করছিলাম। আর লাল রঙের ফুলগুলো আমাকে বারবার রক্তের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল।

'তোমার এই আদিখ্যেতা দেখলে অরুণাভ খুব খুশি হত।'

আমি বলতে চাইনি, কিন্তু কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যেন কোনও ঈর্ষাকাতর অসুস্থ মানুষ আমার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল শব্দগুলো।

ছায়া ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল। সে-দৃষ্টি আমি কোনওদিনও ভুলব না। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার শীত-শীত করে উঠল।

আর একটাও কথা না বলে ছায়া ফুলদানিটা তুলে নিয়ে নির্বিকার মুখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তখনই খেয়াল করলাম, অরুণাভর চিঠিটা ঘরের এক কোণে পড়ে রয়েছে।

সে-রাতে তিনটে স্লিপিং পিল খেয়েও আমার ঘুম এল না। অন্ধকারে জেগে-জেগে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখলাম। মনে হল, অরুণাভ বসু আমাকে সহজে রেহাই দেবে না।

স্বর্গদ্বারের তুলনায় চক্রতীর্থ জায়গাটা অনেক নিরিবিলি, শান্ত। সেইজন্যেই সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন সবসময়েই স্পষ্ট শোনা যায় হোটেল থেকে। হোটেলটার নাম 'ডলফিন'। বেশ ছড়ানো আধুনিক পাঁচতলা হোটেল-বিল্ডিং। রেট একটু বেশি, তবে আরামের ব্যবস্থাও মাঝারি হোটেলের তুলনায় অনেক ভালো।

আমাদের ঘরটা তিনতলায়, সমুদ্রের দিকে।

জানলা খুললেই উড়িয়ে নেওয়া হু-হু নোনা বাতাস, সমুদ্রের গন্ধ আর নীল। সমুদ্র আর আকাশ হাতে হাত ধরে মেশামিশি। সেই সঙ্গে রোদ-চিকচিক বালি আর সাদা ফেনা। সব মিলিয়ে একেই বোধহয় বলে প্রকৃতির কোল।

পুরীতে এসে একদিনের মধ্যেই আমাদের মন একেবারে বদলে গেল। আমরা ভুলে গেলাম, কলকাতা নামে একটা শহর আছে, সেখানে আমরা চাকরি করি, আবার সেখানে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

সমুদ্র ভালো না পাহাড়, এই নিয়ে ছায়ার সঙ্গে তর্ক বেঁধে গেল। অনেকক্ষণ মজা করে তর্ক করার পর ও গম্ভীর গলায় বলল, 'এবার ফিরে গিয়ে মত পালটাব ভাবছি।'

হাসি ঠাট্টা আদরে আমাদের বয়েস খুব তাড়াতাড়ি কমে যেতে লাগল।

ছায়া কথায়-কথায় বারবার বলতে লাগল, 'এখানে এসে দারুণ লাগছে।'

আর আমিও বললাম, 'আমারও—।'

কথায় বলে, সুখের সময়টাকে কখনও সেই মুহূর্তে চেনা যায় না। চেনা যায় পরে। তখন মনে হয়, কী সুখেই না ছিলাম!

ঠিক সেই ব্যাপারটাই হল দ্বিতীয় দিন রাতে—হোটেলের ডাইনিং হলে খেতে বসে। হঠাৎই আমার বেড়ানোর আনন্দটা তেতো হয়ে গেল।

আমাদের ঠিক দুটো টেবিল পরেই একটা টেবিলে বসে মেনু-কার্ড দেখছে অরুণাভ বসু।

'সর্বনাশ করেছে!' অসহ্য বিরক্তিতে বলে উঠলাম আমি।

'কী হল?' ছায়া অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

'ওই দ্যাখো—।'

ছায়ার ফরসা মুখে একঝলক রক্ত এসেই চলে গেল। ওর মুখটা অদ্ভুত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। প্রায় ভয় পাওয়া গলায় ও বলে উঠল, 'আশ্চর্য! আমি তো ভাবতেই পারছি না!'

সেই মুহূর্তে মেনু-কার্ড থেকে চোখ তুলল অরুণাভ। দেখল আমরা দুজনে হতবাক হয়ে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। চোখাচোখি হতেই ও ছোট্ট করে হাসল।

'তুমি কি জানতে ওই শয়তানের বাচ্চাটা পুরী বেড়াতে আসছে?' চাপা গলায় ছায়াকে জিগ্যেস করলাম।

ছায়া সামান্য ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে : 'না। কী করে জানব!'

'নিশ্চয়ই ও কোনওভাবে জানতে পেরেছিল তুমি পুরীতে বেড়াতে আসছ—।'

'সে হতে পারে। অফিসে তো অনেকেই জানে আমি সাতদিনের ছুটিতে পুরী যাচ্ছি। ও হয়তো কারও কাছে শুনেছে।'

আমি বললাম, 'চলো, দূরের কোনও একটা টেবিলে গিয়ে বসি। ওই বাস্টার্ডটা মুখের কাছে বসে থাকলে আমাদের খাওয়াটাই মাটি হয়ে যাবে।'

'প্লিজ, এটা নিয়ে কোনও সিন ক্রিয়েট কোরো না—' ছায়া অনুনয় করে বলল। ওর এই শান্ত নরম স্বভাবই যত ঝঞ্ঝাটের মূল।

কিন্তু গলা উঁচিয়ে কোথাও একটা ফাঁকা টেবিল দেখতে পেলাম না।

'নাও, তাড়াতাড়ি অর্ডার দাও। খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে—' ছায়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় বলল।

আমার তখন খিদে মাথায় উঠেছে। শুধু ভাবছিলাম, অরুণাভ নিশ্চয়ই এই হোটেলেই উঠেছে। আরও চারটে দিন...পাঁচটা দিন একই জায়গায় একই হোটেলে ওকে সহ্য করতে হবে!'

সেই সবে শুরু।

তারপর থেকে অরুণাভকে যত্রতত্র দেখা যেতে লাগল। হোটেলের লাউঞ্জে, সি বিচে, ডাইনিং হলে, স্বর্গদ্বারের দোকানে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে, কোথায় নয়! ওর একজোড়া ক্ষুধার্ত চোখ সবসময় আমাদের নজরবন্দি করে রাখল। শুধু যেন আমাদের তিনতলার

ঘরের চৌহদ্দিতে আমরা নিরাপদ—ওর কাছ থেকে পালানোর জায়গা বলতে এই একটাই।

ঘরে ফিরে ছায়া হয়তো ঘোরাঘুরির ক্লান্তিতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু আমার চোখে সহজে ঘুম নামত না। অরুণাভর কথা ভেবে-ভেবে আমার মাথার ভেতরে যেন আগুন জ্বলত। সেই সময় ও যদি এসে আমাদের দরজায় নক করত, তাহলে আমি হয়তো ওকে গলা টিপেই খতম করে দিতাম।

কিন্তু আমার ধৈর্য হারালে চলবে না। অরুণাভ এখনও কোনওরকম অভদ্র আচরণ আমাদের সঙ্গে করেনি। সুভাষের কথা মনে পড়ল আমার '...তুই কিন্তু মাথা গরম করে কিছু করে বসিস না। কোনও অবস্থাতেই অরুণাভর গায়ে হাত তুলিস না।'

সুতরাং, আমি গোটা ব্যাপারটাকেই হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মনকে বারবার বোঝাতে লাগলাম। ঠিক করলাম, অরুণাভ যদি গায়ে পড়ে কথা বলতেও আসে তাহলেও ওকে একটুও পাত্তা দেব না।

আরও দেড়দিন এইভাবে কাটিয়ে দিলাম। ওকে দেখেও না-দেখার ভান করতে লাগলাম। কিন্তু ছেলেটাও আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলার চেষ্টা করল না।

একদিন সি বিচে বসে আমি বিরক্ত হয়ে ছায়াকে বললাম, 'ছেলেটার বোধহয় মাথার গোলমাল আছে।'

ছায়া বলল, 'ওর জন্যে মায়া হয়। একটা বন্ধুবান্ধব নেই—নইলে এভাবে কেউ একা-একা পুরী বেড়াতে আসে!'

আমি কোনও জবাব দিলাম না। লক্ষ করলাম, দূরে বালির ওপরে ছেলেটা আঙুল দিয়ে কী যেন আঁকিবুকি কাটছে।

কিছুক্ষণ পর আমি আর ছায়া উঠে পড়লাম। আমার কী খেয়াল হল, অরুণাভ যেখানে বসে ছিল সেদিকটায় তাকালাম। দেখি, ও নেই। তবে বালির ওপরে বেশ কতকগুলো দাগ চোখে পড়ছে।

ছায়াকে নিয়ে সেই জায়গাটার পাশ দিয়ে আমি হেঁটে গেলাম। তখনই বালির ওপরে লেখাগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ছেলেটা আঙুলের ডগা দিয়ে অসংখ্যবার ছায়ার নাম লিখেছে বালিতে।

আমার বুকের ভেতরে পাগলাঘণ্টি বাজতে শুরু করল।

ছায়া ব্যাপারটা দেখতে পায়নি। আমিও ওকে কিছু বললাম না।

পরদিন আমরা কোনারক দেখতে গেলাম। ট্রাভেল এজেন্সি মারফত টিকিট বুক করাই ছিল। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ লাক্সারি কোচ আমাদের হোটেল থেকে তুলে নিল।

ছোটখাটো কয়েকটা দ্রষ্টব্য দেখার পর বাস ছুটে চলল কোনারকের দিকে।

সমুদ্রের গা ঘেঁষে টানা রাস্তা। সকালের রোদে নীল সমুদ্রকে যেন জীবন্ত মনে হচ্ছে। আমি ছায়ার গায়ে হেলান দিয়ে সিটে গা এলিয়ে বসে আছি। চোখ বুজে আসতে চাইছে

আমেজে। বাসের ভেতরে টুরিস্ট বাসের গাইড তখন বলে চলেছে, 'আমরা এখন এগিয়ে চলেছি কোনরাকের দিকে। "কৌনিক অর্ক' থেকে এই সূর্য মন্দিরের নাম হয়েছে "কোনার্ক।" তা থেকে চলতি কথায় "কোনারক।" বহু বছর আগে...।'

কোনারকে পৌঁছতে-পৌঁছতে বেশ বেলা হয়েছিল। শরীরে অবসাদও টের পাচ্ছিলাম খানিকটা। কিন্তু ছায়া দেখলাম উৎসাহী। কোনারক নিয়ে ও নানান কথা বলতে লাগল আমাকে।

কোনারকে নেমে আমরা সবাই স্বাধীনভাবে ঘুরতে লাগলাম। কোনারক মন্দিরের স্থাপত্য আর শিল্প যেমন বহু মানুষকে মুগ্ধ করেছে তেমন আমাদেরও করল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, পুরীতে বেড়াতে আসাটা আমার আর ছায়ার পক্ষে খুব দরকার ছিল। আমাদের বেড়ানোটা হয়তো আরও ভালো হত যদি না অরুণাভকে একই হোটেলে দেখতে পেতাম।

কোনারকেও অরুণাভকে দেখতে পেলাম আমি।

আমরা সবাই খেয়ালখুশি মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমি আমার মতো এদিক-ওদিক দেখছিলাম, আর ছায়া উৎসাহী দর্শকের মতো উচ্ছলভাবে এখানে-সেখানে প্রায় ছুটোছুটি করছিল। একসময় ও মন্দিরের একটা ভাঙা অংশে ঢুকে পড়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো পাথরের ধাপে পা রেখে নীচে নামতে শুরু করল। আমাকেও ডাকল, কিন্তু আমার তেমন উৎসাহ না থাকায় বললাম, 'তুমি ঘুরে এসো—তবে সাবধানে যেয়ো।'

মন্দিরের এই অংশটা অনেকটা পাতাল-ঘরের মতো। ছাদের দিক থেকে নেমে যাওয়া যায় নীচে। ওপর থেকে দেখা যায়, মেঝেটা বালিতে ঢাকা। সূর্যের আলো সেখানে সরাসরি ঢুকতে পারে না।

ছায়ার মতো দু-একজন উৎসাহী টুরিস্ট নীচে নামতে শুরু করল। কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েও তাদের গার্জেনদের কাছে বায়না করে অনুমতি আদায় করে দিব্যি তরতর করে নীচে নেমে গেল।

দু-পাঁচ মিনিট পরে আমি ছায়ার খোঁজে সেই ভাঙা ঘরের ছাদের কিনারাতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম, বাচ্চাগুলো চিৎকার করে বালির ওপরে দৌড়োদৌড়ি করছে।

আমার চোখ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ছায়াকে খুঁজতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ওকে দেখতে পেলাম। ছাদ-খোলা বিশাল পাতাল-ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ও অরুণাভর সঙ্গে কথা বলছে। অরুণাভ হাত-মুখ নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে ছায়াকে, আর ছায়া মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে।

আমি ওপর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করছিলাম। একটা ঠান্ডা রাগ স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছিল আমার শিরায়-শিরায়।

অন্তত পাঁচ মিনিট পর ছায়া রীতিমতো ব্যস্ত পায়ে পাথরের ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। অরুণাভ তখনও ওর দিকে তাকিয়ে। আমি সরে এলাম ছাদের কিনারা থেকে।

একটা কথা ভেবে অবাক লাগছিল অরুণাভ কী করে জানতে পারল যে, আজ আমরা কোনারককে বেড়াতে আসব। ও কি চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের ওপরে নজর রাখছে? না কি...।

ছায়া আমার কাছে এসে পাতাল-ঘরের নানা বিবরণ দিচ্ছিল, কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছিল না।

একটু পরেই ও বলল, 'অরুণাভ ছেলেটা এখানেও আমাকে ধাওয়া করেছে!'

আমার বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। আমি ভাবছিলাম, ছায়া বোধহয় অরুণাভর ব্যাপারটা আমার কাছে চেপে যাবে।

আমি ওর কথার কোনও উত্তর দিলাম না।

আমার থমথমে মুখ দেখে ছায়া নরম গলায় বলল, 'ছেলেটার সত্যিই বোধহয় মাথার গন্ডগোল আছে। ওর নিজের ওপর কোনও কন্ট্রোল নেই।'

'সেই বস্তাপচা ফিক্সেশান!' আমি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম।

'প্লিজ, এ-নিয়ে আবার একটা সিন ক্রিয়েট কোরো না। ওইজন্যেই তোমাকে কিছু বলতে ভয় করে।'

'যাকগে, ছোঁড়াটা কী বলছিল?'

'ও-ই সব উলটোপালটা কথা—।'

আমার মনে হল, ছায়া বোধহয় প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছে। তাই নাছোড়বান্দার মতো বললাম, 'উলটোপালটা মানে?'

ছায়া অদ্ভুত চোখে আমাকে একপলক দেখল। তারপর বলল, 'ওই সেই এক কথা। আমার সঙ্গে নাকি ওর অনেক জরুরি কথা আছে। আমি প্রসঙ্গ পালটানোর জন্যে জিগ্যেস করেছি, "পুরীতে কি একাই বেড়াতে এসেছেন?" তাতে ও কী বলল জানো? বলল, "একা কোথায়! আমি তো তোমার সঙ্গে এসেছি। তোমার ছায়া হয়েই রয়েছি দিনরাত।" ' ছায়া বেশ মজা করে হেসে উঠে বলল, 'পাগল আর কাকে বলে!'

ফেরার পথে বাসে আমি তেমন সহজভাবে ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না।

রাতে বিছানায় শুয়ে আমি ওর গায়ে হাত রাখলাম। গতকাল স্বর্গদ্বার থেকে ছায়া শিং-এর তৈরি একটা হাত কিনেছিল। সেটা দিয়ে পিঠ চুলকোতে-চুলকোতে বলল, 'ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।'

আমি আলতো করে জিগ্যেস করলাম, 'অরুণাভ আর কী কথা বলছিল?'

মোষের শিং-এর হাতটা রেখে দিয়ে ও হাই তুলল, বলল, 'সেরকম কিছু নয়।'

'তবু শুনি—।'

'ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। আলো নিভিয়ে দাও।' আবার হাই তুলল ছায়া।

'অরুণাভ কোনারক নিয়ে তোমাকে কিছু বলছিল?'

কোনারকের যৌনতা মাখা শিল্পকলায় সব ভদ্রলোকই শুধু শিল্পকলা দেখতে পায়— যৌনতা দেখতে পায় না। আমার কাছে এই খোলামেলা যৌন প্রদর্শনী জঘন্য লাগে।

আমি জানি, আমাকে হয়তো সবাই অশিক্ষিত সেকেলে ভাববে, কিন্তু কিছু করার নেই। অরুণাভ শিল্প আলোচনার নাম করে ছায়াকে অন্য আলোচনায় টেনে নামাতে চাইছিল কি না কে জানে!

ছায়া আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি। তাই প্রশ্নটা আবার করলাম আমি। ছায়া ঘাড় ঘুরিয়ে স্তম্ভিত চোখে আমাকে দেখল। তারপর বলল, 'প্লিজ, এসব আজেবাজে কথা এখন ভাল্লাগছে না। আলো নিভিয়ে দাও না—!'

আমি সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলাম। ঘর অন্ধকার হতেই সমুদ্রের গর্জন যেন হঠাৎই আরও জোরালো হয়ে উঠল।

আমি ছায়ার বাহুতে হাত রেখে নরম গলায় জিগ্যেস করলাম, 'অরুণাভ অতক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে আর-কী কথা বলছিল?'

'অতক্ষণ ধরে মানে?' ছায়ার বিরক্ত গলা শোনা গেল অন্ধকারে।

'তোমরা প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট ধরে কথা বলছিলে—।'

'পাঁচ-সাত-মিনিট! তুমি কি ঘড়ি দেখছিলে নাকি?'

'এভাবে বলার মানে?'

ছায়া কোনও উত্তর দিল না।

'ছায়া, কথার জবাব দাও। ও কী বলছিল তোমাকে?'

'ওঃ, তখন থেকে তো বলছি, এখন এসব ভালো লাগছে না। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।'

অন্য কোনও পুরুষ হলে হয়তো এখানেই থামত। কিন্তু আমার কেমন যেন জেদ চেপে গেল। অরুণাভ ছেলেটার ওপরে একটা গনগনে রাগ বাঘের মতো ফুঁসতে লাগল আমার বুকের ভেতরে।

'ছায়া—।'

'কী?'

'আমার কথার জবাব দাও। কী বলছিল অরুণাভ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছায়া। অন্ধকারেই টের পেলাম, ও আমার দিকে ঘুরল। তারপর রুক্ষ গলায় বলল, 'কিচ্ছু মনে নেই। তুমি যেভাবে ওপর থেকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিলে তাতে কিছু মনে রাখার জো আছে!'

'আমি মোটেই তাকিয়ে থাকিনি। অত মাথাব্যথা আমার নেই।'

ছায়া অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

'হাসছ কেন?'

কোনও উত্তর নেই।

'আমি ওপর থেকে একবার দেখলাম, অরুণাভ তোমার সঙ্গে কথা বলছে—' আমি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করছিলাম 'তাই জিগ্যেস করছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার আমি সেই একই প্রশ্ন করলাম, 'ও কী বলছিল, ছায়া?'

'শুনে কী লাভ!'

'আমার লাভ আছে।'

'তুমি অরুণাভকে নিয়ে আবার একটা সিন ক্রিয়েট করতে চাও? সেই সেদিনের মতো?'

বুঝলাম, ও টাটা সেন্টারের মেন গেটের ঘটনাটার কথা বলতে চাইছে। ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম আমি 'তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি কোনও সিন ক্রিয়েট করব না—প্লিজ, ও কী বলছিল?'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছায়া। তারপর বলল, 'ও জিগ্যেস করছিল, আমরা কবে ফিরব। কবে আমি অফিসে জয়েন করব—এইসব।'

'ব্যস, আর কিছু না!'

'প্লিজ, এবার ক্ষান্ত দাও। আমার চোখ বুজে আসছে—।'

'ও আর কী বলল, ছায়া?'

'মনে নেই।'

'মনে নেই বললেই হবে! বলো না, আর কী বলছিল—।'

'তোমাকে নিয়ে মজা করছিল—।'

'আমাকে নিয়ে? কী মজা করছিল?'

'বলছিল, "তোমার এই বৃদ্ধ হাজব্যান্ডকে ছেড়ে আমার কাছে চলে এসো।" '

'তাতে তুমি কী বললে?'

'সত্যি, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। এবার দয়া করে চুপ করো—।'

'তুমি কী বললে? বললে যে, "আমি সিন ক্রিয়েট করা পছন্দ করি না। সুতরাং তুমি আমাক যা খুশি তাই করতে পারো।"?'

হঠাৎই খেপে গেল ছায়া। ওর উত্তর চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল আমার কানে: 'হ্যাঁ, তাই বললাম—বললাম যে, "তুমি আর ক'টা দিন ওয়েট করো, আমি ওই বুড়োটাকে ছেড়ে তোমার সঙ্গে ইলোপ করব।" এবারে খুশি হয়েছ তো! এখন দয়া করে আমাকে ঘুমোতে দাও।'

আমি কোনও উত্তর খুঁজে পেলাম না।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ছায়ার হালকা নাক ডাকার শব্দ কানে এল।

অন্ধকারে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম আমি। শরীরে মনে এক অদ্ভুত জ্বালা। ছায়ার কথাগুলো মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল আমার মনের দেওয়ালে। দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের ফোঁসফোঁসানি যেন আমারই উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

একটু পরেই নিজেকে বোঝাতে পারলাম, আমার একঘেয়ে জেদি প্রশ্নে জেরবার হয়ে ছায়া তিতিবিরক্ত হয়ে শেষ কথাটা বলেছে। আমি হলেও হয়তো তাই বলতাম। সুতরাং, ছায়ার ওপর রাগ পড়ে গেল আমার। কিন্তু একইসঙ্গে অরুণাভর ওপরে রাগ বেড়ে গেল। ওই নাছোড়বান্দা শয়তান ছোঁড়াটার জন্যেই আজ আমাদের অকারণে ঝগড়া হল। তা ছাড়া এরকম ভয়ঙ্কর প্রস্তাব অরুণাভ ছায়াকে দেয় কেমন করে! আমি 'বৃদ্ধ

হাজব্যান্ড'! কেন, আমার মাথায় টাক পড়ে গেছে বলে! সেইজন্যেই ছায়া কোনারকে ওই ভাঙা মন্দিরের নীচে দাঁড়িয়ে ঘন-ঘন মাথা নেড়ে 'না' বলছিল!

আজকের দিনটা তো এরকম তেতো হয়ে গেল—কাল কী হবে! বাকি ক'টা দিন কি আমাদের শান্তিতে কাটবে? কখ্খনও, না। অরুণাভ ওর ওই একবগ্‌গা মন নিয়ে ছায়াকে ফলো করে যাবে। কে জানে, এইভাবে একনাগাড়ে চালিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত ও হয়তো জিতেই যাবে। অসুস্থ সমাজের একটা বিকৃত রুচির স্বার্থপর মানুষের কাছে আমি হেরে যাব!

এইরকম একটা লোকের সঙ্গে কী করে লড়াই করা যায়? এই অদ্ভুত লোকটা যুক্তি বোঝে না, ভালো-মন্দ বোঝে না, মারধোরের ভয় পায় না, পুলিশের পরোয়া করে না। তা ছাড়া সত্যিই তো ও ভদ্র, শান্ত, আর লাজুক প্রকৃতির। ওর শুধু একটাই গন্ডগোল—ছায়াকে ওর চাই। এই চাওয়া কখনও শেষ হবে না—অন্তত যতক্ষণ ও বেঁচে আছে। সুতরাং, অরুণাভ নৃশংসভাবে ওর স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। কোনও বাধাই ওকে বাধা দিতে পারবে না। ও ছায়াকে ফুল পাঠাবে, চিঠি লিখবে—খুবই ভদ্র চিঠি, আর কানে দিনরাত্তির ফুসমন্তর দেবে। এইভাবে লেগে থাকতে-থাকতে একদিন-না-একদিন ও ছায়াকে টলিয়ে দেবে। তখন আমিও ছায়ার শত্রু হয়ে যাব।

ছায়া এমনিতে খুবই নরম মেয়ে। কাউকে ব্যথা দিয়ে কথা বলতে পারে না, কোনও ভিখারিকে খালি হাতে ফেরায় না। অরুণাভও তো প্রেমের ভিখারি। সুতরাং, ওর এই চাপ কতদিন ছায়া সইতে পারবে? একদিন ওকে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হবে। হয়তো ব্যাপারটা অফিসেই হতে পারে। মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ইচ্ছে থাকলেও অফিসে ওরা কোনও কুকাজ করতে পারবে না। কিন্তু সে-কথা আমি মানতে পারছি না। অতবড় বিল্ডিং—সেখানে কি অফিস ছুটির পরে দারোয়ানকে ঘুষ-টুস দিয়ে কোনও লাগসই জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না! চাই কি ছায়ার টাইপের টেবিলেও ব্যাপারটা হতে পারে। সন্ধে পেরিয়ে গেলে অরুণাভ ছায়ার কাছে আসবে। ছায়াকে একা ঘরে পেয়ে দরজাটা লক করে দেবে। তারপর টাইপ মেশিনটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে টাইপিস্টকেই তুলবে টেবিলের ওপরে। এবং এলোপাতাড়ি বোতাম টিপে যত খুশি টাইপ করবে—কেউ বাধা দিতে পারবে না। ছায়াও নিশ্চয়ই 'সিন ক্রিয়েট' করে ওকে বাধা দেবে না, কিংবা বাধা দিতে মন চাইবে না। তারপর...।

দার্শনিকরা বলে থাকেন, কোনও সমস্যা ঠিকমতো উপলব্ধি করার অর্থ হল তার সমাধানটাও খুঁজে পাওয়া। আমিও ঠিক তেমনিই সমস্যাটা উপলব্ধি করতে পারলাম, আর তার একমাত্র সমাধানটাও খুঁজে পেলাম।

পরের দিনটা ছায়া একেবারে গুম মেরে রইল। শত চেষ্টা করেও ওকে হাসিখুশি করতে পারলাম না। সারাটা দিন ও হোটেলেই বসে রইল।

আমার মনের ভেতরে যে-উত্তাল ঝড় উঠেছিল তা খাঁচায় বন্দি বুনো বাঘের মতো ফুঁসে বেড়াচ্ছে বুকের ভেতরে। সেই অবস্থাতেই অরুণাভর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

তখন সন্ধে সাতটা হবে। হোটেলের কাছাকাছি সি বিচে বসে ছিল অরুণাভ। সমুদ্রের হু-হু বাতাসে ওর চুল উড়ছে। উদাস নয়নে ও অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ঢেউয়ের ভাঙা-গড়ার খেলা দেখছে।

আমি আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খুব সন্তর্পণে ওর কাছাকাছি গিয়ে বসলাম। তারপর সামনের সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে ওকে ডাকলাম।

তিনবারের বার ও আমার ডাক শুনতে পেল। আমার দিকে ঘুরে তাকাল। বেশ অবাক হল আমাকে দেখে।

আমি বললাম, 'আজ রাতে বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ হোটেলের ছাদে থাকবেন।'

'কেন-কেন?' ইতস্তত করে জানতে চাইল অরুণাভ।

আমি হেসে বললাম, 'কোনও ভয় নেই। ছায়ার ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব। ছায়াকে আমি ডিভোর্স করতে চাই—।'

অরুণাভর চোখ চকচক করে উঠল, কিন্তু ও কোনও কথা বলল না।

আমি বিষণ্ন গলায় বলে চললাম, 'ওকে নিয়ে আমি খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। কিন্তু সে-কথা ওকে ডাইরেক্টলি বললে ও হয়তো সুইসাইড করবে। ও খুব নরম মনের মেয়ে। ওর এখনও বিশ্বাস আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি—' আমি তেতো হাসি হাসলাম। তারপর প্রসঙ্গ পালটে জরুরি গলায় বললাম, 'রাতে ছাদে দেখা হবে। তখন সব বলব। আর কাউকে এ-কথা বলবেন না।'

অরুণাভ সাত-তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল কয়েকবার। অন্ধকারেও যেন ঠাহর করতে পারলাম, উত্তেজনায় ওর হাত-পা কাঁপছে।

আমি ওর কাছ থেকে উঠে পড়লাম। চতুর্দশীর চাঁদের আলো তখন সাগরের জলে রুপোর কুচি ছড়িয়ে দিয়েছে।

রাতে অনেক আগেই ডিনার সেরে নিলাম, যাতে ছায়া তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত এগারোটা নাগাদ ছায়ার গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আরও প্রায় আধঘণ্টা পর আমি চুপিচুপি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। স্যান্ডো গেঞ্জির ওপরে একটা জামা পরে নিলাম। তারপর ঘুম-না-আসা টুরিস্টের মতো পা বাড়ালাম ছাদের দিকে। কপাল ভালো বলতে হবে, কারও সঙ্গেই আমার দেখা হল না।

ছাদের দরজা খুলতেই সমুদ্রের বাতাস আমাকে যেন উড়িয়ে নিল। আকাশপথে চাঁদ এখন অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। চাঁদের আলোয় এপাশ-ওপাশ দেখলাম : কেউ

নেই। না থাকারই কথা। বারোটা বাজতে এখনও পনেরো-কুড়ি মিনিট বাকি।

ছাদের ডানদিক ঘেঁষে চারটে বড়-বড় জলের ট্যাঙ্ক। আমি এদিক-ওদিক চলে যাওয়া জলের পাইপ ডিঙিয়ে ট্যাঙ্কগুলোর কাছে গেলাম। দুটো ট্যাঙ্কের মাঝখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসলাম। সেখান থেকে ছাদের দরজার দিকে নজর রেখে অরুণাভর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঠিক বারোটার সময় অরুণাভ এল। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ছাদের দক্ষিণ দিকের পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উদাস চোখে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। আর মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল ছাদের দরজার দিকে।

প্রায় মিনিট কুড়ি পর আমি ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলাম। অরুণাভ এখন বোধহয় ধরেই নিয়েছে, আমি দেখা করতে আসব না। কারণ, এখন ও ক্বচিৎ-কদাচিৎ ছাদের দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি যখন পা টিপে-টিপে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম তখন ও গালে হাত দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। ওর ঠিক পেছনে এসে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়লাম আমি। দুটো হাত ওর পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে এক হ্যাঁচকায় ওর রোগা-পটকা শরীরটাকে টপকে দিলাম পাঁচিলের ওপারে। নীচে পড়ার সময় অরুণাভ রক্ত-হিম-করা এক ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়ে উঠল। তারপরই একটা বীভৎস ভোঁতা শব্দ শুনতে পেলাম। ওর দেহটা নীচে গিয়ে আছড়ে পড়েছে।

আমি দৌড়ে ছাদের দরজার দিকে এগোতে যাব, হঠাৎই চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল অরুণাভর এক পাটি চটি ছাদে পড়ে আছে। কী করে যেন খুলে গেছে ওর পা থেকে। সেই মুহূর্তে নিঃসঙ্গ চটিটাকে আমার জীবন্ত বলে মনে হল। তাড়াতাড়ি ওটা তুলে নিয়ে নীচে ফেলে দিলাম। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, ওটার চেহারা আমি কোনওদিনও ভুলতে পারব না।

তারপর আমি চটপটে পায়ে তিনতলায় নেমে এলাম। অন্ধকার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। জামাটা ছেড়ে আবার শুয়ে পড়লাম বিছানায়। আমার বুকের ভেতরে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছিল। আমার ভয় হচ্ছিল, ছায়া সেই শব্দে জেগে না ওঠে।

আমি কান খাড়া করে অপেক্ষা করছিলাম। অরুণাভর আর্তনাদ কি কেউই শুনতে পায়নি! কিংবা ওর নীচে আছড়ে পড়ার শব্দ? সমুদ্রের গর্জন আর নোনা বাতাস কি এই শব্দগুলো চাপা দিতে পেরেছে?

একটু পরেই লোকজনের কথাবার্তার শব্দ কানে এল। জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম, কয়েকটা ঘরে-বারান্দায় আলো জ্বলে উঠছে।

আরও কিছুক্ষণ পর কথাবার্তার শব্দ তিনতলা হয়ে ছাদের দিকে চলে গেল। ব্যস্ত পায়ে আনাগোনার শব্দও শুনতে পেলাম। কিন্তু আমি বিছানায় কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। ঘুমন্ত ছায়ার দিকে দেখলাম কয়েকবার। ওর শরীরটা গভীর ঘুমের ছন্দে কোমলভাবে উঠছে-নামছে।

সারাটা রাত আমার জেগেই কেটে গেল।

পরদিন ব্রেকফাস্টের সময় বেয়ারাকে জিগ্যেস করে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। অরুণাভ বসু নামে হোটেলের একজন বোর্ডার কাল রাতে হোটেলের ছাদ থেকে লাফিয়ে সুইসাইড করেছেন। কাল রাতেই পুলিশ এসেছিল। আজ আবার আসবে।

কথাটা শুনে ছায়া ভীষণ একটা ধাক্কা খেল।

জিগ্যেস করলাম, 'কেন সুইসাইড করল জানা গেছে?'

'না, স্যার, কোনও লেখা-টেখা কিছু পাওয়া যায়নি।'

বেয়ারাটা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পরই ছায়া মাথা নিচু করে কাঁদতে শুরু করল। কাঁদবেই তো! একে অরুণাভ ওর অফিস কোলিগ, তার ওপর ও খুব নরম মনের মেয়ে।

কিন্তু আমার মনে এতটুকু অপরাধবোধ বা দুঃখ ছিল না। একটা অপদার্থ পাগল ছেলে আমার বউকে ভালোবাসার গোঁ ধরে আমাকে সহ্যের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। কোনও সুস্থ মানুষ এ-অবস্থায় যা করত, আমিও তাই করেছি। একমাত্র অসুস্থ সমাজ ছাড়া আর কেউ বলবে না যে, আমি অন্যায় করেছি। নিজেকে বহুরকম প্রবোধ দিলেও চাঁদের আলোয় ছাদে পড়ে থাকা নিঃসঙ্গ চটিটার কথা আমি কিন্তু ভুলতে পারছিলাম না।

ছায়াও বিশ্রীভাবে ভেঙে পড়ল। সারাদিন ঘরে বসে রইল, আপনমনে কাঁদতে লাগল। আমি বারবার জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে?' কিন্তু ও কোনও উত্তর দিল না। একদিনেই ওর শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেল।

রাতে আমরা ঘরেই বসে ছিলাম। ঘর অন্ধকার করে সব ক'টা জানলা খুলে দিয়েছি। আকাশের তারা আমাদের দেখছে, নোনা বাতাস আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ছায়াকে আঁকড়ে ধরে আমি জানলার কাছে বসে ছিলাম। আলতো গলায় ওকে বললাম, 'আর কোনও ভয় নেই—অরুণাভ তোমাকে আর কখনও বিরক্ত করবে না।'

ছায়া ডুকরে উঠে বলল, 'ও আমার জন্যেই সুইসাইড করেছে।'

'সে করলে করেছে। তোমার তাতে কোনও দোষ নেই।' আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম।

'না গো, আমারই দোষ। সেদিন কোনারকে যখন ও আমাকে বলেছিল তোমাকে ছেড়ে দিতে, তখন আমি ওকে খুব মুখ করেছিলাম। বলেছিলাম, আমার হাজব্যান্ডকে আমি যে কত ভালোবাসি সে আপনি ভাবতেও পারবেন না।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম 'সে কী! তুমি তো আমাকে অন্য কথা বলেছিলে!'

ছায়া বলল, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম—কারণ, তোমার প্রশ্নে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার তখন চুপ করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল। আমি জানতাম, সত্যি কথাটা বললেই তুমি আমাকে আদর করতে শুরু করবে। বুঝতে পারছ না, তখন যে আমার কিচ্ছু ভালো লাগছিল না!'

আমি বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লাম 'কী জানি।' তারপর একটু সময় নিয়ে ওর মন

ভালো করার জন্যে বললাম, 'যাই বলো, তোমার জন্যে অরুণাভ সুইসাইড করেনি।'

অন্ধকারে জল-ভরা চোখে ছায়া তাকাল আমার দিকে 'হ্যাঁ, আমার জন্যেই করেছে। আমাকে অরুণাভ বলছিল, আমাকে না পেলে ও হোটেলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দেবে। জবাবে আমি বলেছিলাম, "আপনি ঝাঁপ দিলে আমি অন্তত হাঁপ ছেড়ে বাঁচব।" '

কথা শেষ করেই ছায়া হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। সে-কান্না আর কিছুতেই থামতে চায় না।

আমার দোষে ছায়া কষ্ট পাক এ আমি কখনও চাইনি। তাই কলকাতায় ফিরে এসে ওকে সব খুলে বলেছি। ও অবাক হয়ে অপলক চোখে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, 'এই পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে দুজনে কখনও এক ছাদের নীচে থাকে যায়, বলো!' আর একইসঙ্গে কাঁদতে শুরু করেছে।

ও বলল, আমার উচিত পুলিশে ধরা দেওয়া। তাতে আমার যতদিন জেল হয় হোক— ও আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আবার নতুন করে জীবন শুর করব আমরা।

সুভাষ আমার জন্যে মামলা লড়ার দায়িত্ব নিয়েছে। ও আমাকে বারবার করে বুঝিয়েছে, 'যদি আমরা জজসাহেবকে বোঝাতে পারি যে, সেই সময় তুই কিছুদিনের জন্যে অ্যাবনরমাল হয়ে পড়েছিলি, তাহলে সাজাটা কমানো সহজ হবে। অনেক সময় অনেকেরই টেম্‌পোরারি অ্যাবনরমালিটি দেখা দেয়। তুই আমার কথায় রাজি হয়ে যা— তাহলে ছায়ার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারবি।'

ওর কথার পয়েন্ট আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু ভীষণ অদ্ভুত লাগছে। আমি মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সকলের সামনে ভান করতে হবে আমি অসুস্থ। ওরা কেন বুঝতে পারছে না, অরুণাভ মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল, আমি নয়।

সামান্য ঝুঁকি

অন্যান্যবার মায়ার কাছে এসে বড়জোর দু-দিন কি তিনদিন থেকেছি, তার বেশি নয়। কিন্তু এবারে একেবারে সাতদিনের প্রোগ্রাম। কারণ কী? না সিদ্ধার্থ সাতদিনের জন্যে দিল্লি যাচ্ছে। মায়া যে ভয়-টয় পেয়ে আমাকে সাতদিন থাকার জন্যে নেমন্তন্ন করেছে তা নয়। বরং আমিই ওর জন্যে দুশ্চিন্তায় পড়েছি। চার বছরের টনিকে নিয়ে ও একা থাকবে। যেখানে একটা পাগল খুনি খুনের নেশায় মত্ত হয়ে এই এলাকায় এলোপাতাড়ি খুন করে বেড়াচ্ছে। তার খুনের ধরন দেখে কাগজওয়ালারা তার নাম দিয়েছে 'আয়রনম্যান'।

খবরের কাগজের অফিসের কাজ বড় ঝামেলার। এক সপ্তা দিনে ডিউটি তো পরের সপ্তায় রাতে। মেয়ে বলে আমাকে নিউজ এডিটর মোটেই খাতির করে না। লোকটার দয়া-মায়া বলে কিছু নেই। একেবারে পাষণ্ড। সেইজন্যেই বোধহয় এই পাগল খুনির রহস্য রিপোর্ট করার জন্যে আমাকে লাগিয়ে দিয়েছে।

রোববার দিনটা আমার ছুটি থাকে। তাই সন্ধের দিকে মায়ার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সিদ্ধার্থও বাড়িতেই ছিল। দরজা খুলে আমাকে দেখেই বলে উঠল, 'দিদি, আজ রাতে খেয়ে যাবে—মুরগি এনেছি।' তারপর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মায়া, তোমার গ্রেট এলডার সিস্টার এসেছে—।'

সিদ্ধার্থ মুডে থাকলে দারুণ মজা করতে পারে। কিন্তু মাঝে-মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ ওকে মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখেছি। মায়া জিগ্যেস করলে বলে, 'কিচ্ছু হয়নি।'

আজ আমার কপাল ভালো। ওকে দেখে মনে হচ্ছে মেজাজে আছে।

রাতে ডিনার-টেবিলে বসে তারিয়ে-তারিয়ে মুরগির হাড় চিবোচ্ছি, হঠাৎই সিদ্ধার্থ বলল, 'দিদি, কাল আমি দিল্লি যাচ্ছি—বিকেলে ডিলাক্সে—।'

আমি খাওয়া থামিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ক'দিনের জন্যে?'

'সামনের সোমবার চলে আসব।'

'সা-ত দি-ন!' কথাটা আমি এত জোরে বলে উঠেছি যে, মায়ার পাশে বসা টনি চমকে উঠেছে, ওর হাত থেকে একটা আলুর টুকরো খসে পড়ে গেছে থালায়। আমি সেসব ভ্রূক্ষেপ না করে বললাম, 'মায়া এ-বাড়িতে একা-একা সাতদিন থাকবে!'

কথাটা বলেই মনে হল, এভাবে চেঁচিয়ে না উঠলেই ভালো হত। সিদ্ধার্থ কী মনে করল কে জানে! মায়ার কাছেই শুনেছি, মাঝে-মাঝে ও যেরকম হঠাৎ করে মুখে কুলুপ এঁটে বসে পড়ে, তারপর ওর মেজাজ ফেরানোই এক ঝকমারি।

মায়া বোধহয় একই ভয় করছিল। কারণ, লক্ষ করলাম, খেতে-খেতেই ও আড়চোখে ওর ভালোবাসার মানুষটিকে দেখল একবার। কিন্তু না, সিদ্ধার্থর মুখে আলতো হাসিটুকু লেগেই রইল।

সুতরাং, হালকা হয়ে মায়া বলল, 'কেন, টনি রয়েছে না! ও আমাকে বিপদে-আপদে বাঁচাবে।'

সেইরকমই বটে! চার বছরের বাচ্চা ছেলে, যে এখনও ভালো করে চাঁদ আর সূর্যের তফাত বুঝতে শেখেনি, সে বাঁচাবে তার মাকে!

আমার খাওয়া তখনও অচল, কপালে বোধহয় বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। সেটা লক্ষ করেই মায়া হয়তো হেসে বলল, 'দিদি, তোর আবার একটু বেশি-বেশি। নে, মন দিয়ে খা তো!' তারপর সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি মিছিমিছি ভেবো না। আমার এত ভয়-টয় নেই।'

ব্যাপারটা 'বেশি-বেশি' মোটেই নয়। অন্তত আয়রনম্যানের কীর্তিকলাপ যারা জানে তারা নিশ্চয়ই বুঝবে। গত দেড়মাসে আয়রনম্যান নামের এই পাগল খুনি মোট ছ'-ছ'টা খুন করেছে। ভারি ধাতব কোনও অস্ত্র দিয়ে সে বীভৎসভাবে থেঁতলে দিয়েছে ছ'জন তরুণীর মাথা। আর ঘটনাস্থল থেকে চুরি গেছে তাদের কিছু অন্তর্বাস—অন্তত তাদের বাড়ির লোকেরা সেইরকমই বলেছে জবানবন্দিতে।

প্রথম খুন হয়েছিল মুরারিপুকুরের একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে, দেড়মাস আগে। তারপর একে-একে শ্যামবাজারে, মানিকতলায়, আর হাতিবাগান অঞ্চলে দুটো। এ ছাড়া শেষ দুর্ঘটনাটা ঘটেছে অরবিন্দ সেতুর কাছাকাছি—মাত্র দিনদশেক আগে।

মৃত তরুণীদের মধ্যে বেশ কয়েকটা মিল লক্ষ করা গেছে। তারা প্রত্যেকেই ঘোর যুবতী, সুন্দরী ও বিবাহিতা। খুনের সময় তাদের স্বামীরা কেউই বাড়িতে ছিল না। দুজন তো একেবারে কলকাতার বাইরেই গিয়েছিল—সিদ্ধার্থ কাল যেমন যাচ্ছে। আর খুনের সময় তারা কেউই টুঁ শব্দটি করতে পারেনি।

খুনের কায়দাটা মোটামুটি একই। পাঁচিল টপকে কোনও কৌশলে দরজার ছিটকিনি খুলে খুনি ঘরে ঢুকেছে। অথবা, দরজায় আলতো টোকা দিয়ে মেয়েটিকে দরজা খুলতে প্ররোচিত করেছে। কারণ, তিনটি খুনের ঘটনায় মৃতদেহ পাওয়া গেছে রক্তাক্ত বিছানায়। হয়তো শিকারকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই খতম করেছে খুনি। আর অন্য তিনটে ঘটনায় মৃতদেহ পড়ে ছিল দরজার কাছেই, মেঝেতে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মেয়েগুলোকে যেন দুরমুশ পেটানো হয়েছে। এবং তারা মারা যাওয়ার পর তাদের ঘর থেকে শায়া অথবা ব্রেসিয়ার, যা হোক কিছু একটা নিয়ে সরে পড়েছে খুনি।

কোনও খুনের ঘটনাতেই কোনও অচেনা হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। ফলে পুলিশের ধারণা, খুনি গ্লাভ্‌স ব্যবহার করেছে। তা ছাড়া ছ'জন মেয়ের একজনকেও খুনির হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়নি। এ পর্যন্ত যে একটিমাত্র সূত্র পুলিশ পেয়েছে সেটা হল একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি অকুস্থল থেকে সরে পড়ার সময় খুনিকে এক প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা দেখে ফেলেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মহিলা লোকটিকে দেখেছেন রাতের বেলা, চাঁদের আলোয়, এবং পেছন থেকে। যে-মেয়েটি খুন হয় সে তার স্বামীর সঙ্গে মানিকতলায় একতলার

একটি ফ্ল্যাটে থাকত। সেই বাড়িরই দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন ওই সাক্ষী ভদ্রমহিলা। ঘটনার দিন রাতে বেড়ালের ঝগড়ায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। রাত তখন প্রায় আড়াইটে হবে। সামনের ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াতেই একটি লোককে দেখতে পান তিনি। বাড়ির উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। মহিলাটি এতই ভয় পেয়ে যান যে, চিৎকার করতেও পারেননি।

এই সাক্ষ্যে পুলিশের তেমন কোনও সুবিধে হয়নি। কারণ, শুধুমাত্র পোশাক-আশাক আর চেহারার আন্দাজই দিতে পেরেছেন তিনি। মহিলার কথা মতো, খুনির পোশাক ছিল কালো অথবা গাঢ় নীল রঙের। ঢোলা জামা, চাপা প্যান্ট। হাতে ছোট একটা ব্যাগ ছিল। উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট আট-ন' ইঞ্চি, আর ওজন সত্তর কেজির মতো হবে।

আমি কিছুটা সামলে নিয়ে ধীরে-ধীরে বললাম, 'মায়া, আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। তুই-ই বল্, এখান থেকে অরবিন্দ সেতু, মানিকতলা কীই-বা এমন দূর!'

মায়া বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল। তারপর টনির মুখে ভাত গুঁজে দিয়ে বলল, 'আমাকে খুন করা অত সহজ নয়। ভুলে যাস না, আমি এখনও যোগব্যায়াম করি।'

না, এ-কথাটা মিথ্যে নয়। মায়া ছোটবেলা থেকেই যোগব্যায়াম শেখে। তা ছাড়া ওর গড়নটা শক্তপোক্ত। কিন্তু আয়রনম্যানের শক্তির কাছে ওর শক্তি কতটুকু!

সিদ্ধার্থ হেসে বলল, 'এলডার সিস্টার, তুমি তোমার ইয়ংগার সিস্টারকে চেনো না। আমার গলায় ঝুলে পড়েছে, আমি জানি এ কী জিনিস। আয়রনম্যানের বাবার ক্ষমতা নেই এই বস্তুটির গায়ে আঁচড় কাটে।'

মায়া কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'ইয়ারকি না, হাতাহাতি লড়াই হলে তোমাদের মতো অনেক ছেলেকে আমি ঘোল খাওয়াতে পারি—।'

সিদ্ধার্থ মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানানোর ভঙ্গি করে বলল, 'সেটা আমার চেয়ে কে আর ভালো জানে, ম্যাডাম। সে-কথাই তো এলডার সিস্টারের মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করছিলাম।'

আমি অল্প হেসেই নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, 'ঠাট্টা নয়। যে-ভদ্রমহিলা খুনিকে দেখেছেন তিনি বলেছেন লোকটার চেহারা বেশ ভালো। এই সিদ্ধার্থের মতোই হবে। তার সঙ্গে তুই কী করে—।'

সিদ্ধার্থ খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাস তুলে নিয়েছিল। হাতের একটা ভঙ্গি করে বলল, 'চেহারা আমার মতো! তাহলে তো বেচারার জেতার আর কোনও আশাই দেখছি না—।'

মায়া আমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোট। বরাবরই খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমার কথা বেশ শোনে। কিন্তু বিয়ের পরই যেন লায়েক হয়ে গেছে। তার ওপর আমি বিয়ে-টিয়ে করিনি বলে আমাকে আর আমল দিতে চায় না। উলটে ও-ই যেন আমার গার্জেন হয়ে উঠতে চায়।

আমি চুপচাপ খাওয়া শেষ করলাম। সিদ্ধার্থ যেই টেবিলে ছেড়ে উঠতে গেছে অমনই ওকে ডেকে বসলাম। সামনে ঝুঁকে পড়ে বেশ গম্ভীর মুখে বললাম, 'সিদ্ধার্থ, তুমি তো জানো, আয়রনম্যানের কেসটা আমি রিপোর্ট করছি। আমাদের কাগজে যেসব খবর ছাপা হয়েছে সেগুলোই সব নয়। পুলিশমহলের রিকোয়েস্টে বেশ কিছু খবর সব কাগজেই চেপে গেছে। কারণ, তাদের মনে হয়েছে, এই খবর ছাপা হলে গোটা নর্থ ক্যালকাটায় প্যানিক ছড়িয়ে পড়বে। তার ওপরে পলিটিক্যাল চাপ তো আছেই। এই ছ'টা খুন নিয়ে পুলিশের তরফে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তা থেকে বলা যায়, আয়রনম্যান লোকটা শক্তিশালী, নৃশংস, আর ছিটকিনি কাটতে বা হুড়কো খুলতে এক নম্বরের ওস্তাদ। এমনকী দরকার হলে নিঃশব্দে জানলার গ্রিল কেটেও ঢুকে পড়ছে। এরকম একটা অবস্থায়—।'

মায়া টনিকে নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল মুখ ধুতে। যাওয়ার আগে আমাকে আর সিদ্ধার্থকে একপলক দেখে নিল।

সিদ্ধার্থ কয়েক লহমা কী ভাবল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'কী যে করি! অফিসের ট্যুর, না-ও বলা যায় না—।'

সিদ্ধার্থ টেবিল ছেড়ে উঠল। সেই সঙ্গে আমিও। মায়া টনিকে মুখ-টুখ মুছিয়ে নিয়ে আমাদের কাছে এল। বলল, 'এবার দিল্লিতে ইলেকট্রনিক্সের নানান জিনিসপত্তর দেখাবে। কী-একটা এক্সিবিশান আছে। তাই কোম্পানি থেকে ওকে পাঠাচ্ছে।'

টনি মায়ার আঁচল টানছিল আর ঘ্যানরঘ্যানর করছিল। মায়া 'আসছি' বলে ওকে টেনে নিয়ে গেল শোয়াতে।

সিদ্ধার্থ হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তারপর আমিও।

ডাইনিং স্পেসের একপাশে সোফা সেট পাতা। তার মুখোমুখি কিছুটা দূরে টিভি। সিদ্ধার্থ টিভি অন করে দিল। ইংরেজি খবর হচ্ছিল। আমরা দুজনেই সোফায় কিছুটা দূরত্বে বসলাম।

সিদ্ধার্থ বলল, 'এবারে দিল্লিতে ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যানুয়াল কনভেনশান হচ্ছে। সেইসঙ্গে নতুন-নতুন প্রোডাক্টের এক্সিবিশান। আমাদের কোম্পানিও পারটিসিপেট করছে। আমার না গেলেই নয়। তা ছাড়া...।'

আমি জানি সিদ্ধার্থ কী বলবে। ও শুধু যে একটা ইলেকট্রনিক্স ফার্মের সেল্‌স অ্যান্ড সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার তা নয়, নিজেও টিভি-ভি. সি. আর. এসব সারানোর কাজ করে। কোম্পানির কাজে মাঝে-মাঝেই ওকে দু-চারদিনের জন্যে বাইরে যেতে হয়। এবারের এক্সিবিশানে অনেক নতুন-নতুন জিনিস ও দেখতে পাবে। এ-সুযোগ ছাড়া ওর পক্ষে মুশকিল। তবে সাতদিনটা বড্ড বেশি।

সিদ্ধার্থ টিভি-ভি. সি. আর. সারানোর সার্টিফিকেট কোর্স করেছে। ভেবেছিল এই লাইন নিয়েই ব্যাবসা ফাঁদবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চাকরিটা পেয়ে যায়। চাকরিটা ওর পছন্দ হওয়ায় মায়া সেটা আর ছাড়তে দেয়নি।

সব মিলিয়ে সিদ্ধার্থর যা আয় তাতে ওদের ছোট্ট সংসার দিব্যি চলে যায়। আড়াইজনের সংসারে কাজের লোক দুজন। একজন ঠিকে, আর একজন রাতদিনের খুকি। তবে সল্ট লেকের এই জায়গাটা এমনিতেই নির্জন। সেখানে মায়া, টনি আর বাচ্চা মেয়েটা থাকবে সাতদিন!

আমি আর থাকতে পারলাম না। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই বসলাম, 'সিদ্ধার্থ, তুমি কী মনে করবে জানি না। তবে এই সাতদিন আমি মায়ার কাছে থাকব।'

সিদ্ধার্থ টিভির দিক থেকে মুখ সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একচিলতে হাসল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'সে তো ভালোই—তবে তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

আমি বললাম, 'রিপোর্টারদের সবই গা-সওয়া—।'

এমন সময় মায়া ঘরে এসে ভুরু উঁচিয়ে জানতে চাইল, কী ব্যাপার?

ওকে আমার মতলব খুলে বললাম।

ও বলল, 'বাড়িতে অসুবিধে হবে না?'

বাড়িতে লোক বলতে আমাদের বৃদ্ধ বাবা আর ছোট ভাই অলক। অলক চাকরি করে। এখনও বিয়ে দেওয়া হয়নি, তবে চেষ্টা চলছে। সংসারের দিকে ওর খুব নজর। আমাকে বেশ কয়েকবার বিয়ের পিঁড়িতে তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমার জেদ ভাঙতে পারেনি। আমি জানি আমাকে কীরকম দেখতে। তা ছাড়া আমার বিয়ের বয়েসও পেরিয়ে গেছে।

মায়াকে বললাম যে, কোনও অসুবিধেই হবে না, কাল সন্ধের পরই আমি তল্পিতল্পা নিয়ে আসছি।

মায়া বলল, 'তাহলে তো ভালোই। আমিও একটু ভরসা পাব। তবে তোর ভয় নেই রে, আয়রনম্যান আমাকে কিছু করবে না। লোকটা শুধু সুন্দরী মেয়ে দেখে খুন করে।'

সিদ্ধার্থ টিভি দেখতে-দেখতেই ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল বউয়ের দিকে। বলল, 'তাতে তুমি মোটেই বাদ পড়ছ না।'

সিদ্ধার্থের গলায় ঠাট্টা ছিল না। ভালোবাসা ছিল। চোখেও।

মায়া স্বামীর দিকে চেয়ে আদুরে হাসি হাসল। কিন্তু মায়ার চোখ দেখে আমি স্পষ্ট বুঝলাম, নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনওরকম ভুল ধারণা ওর নেই। ও যদি 'সুন্দরী' হয়ে থাকে তাহলে সেটা স্রেফ সিদ্ধার্থের চোখেই। যদি একটিমাত্র বিশেষণ ব্যবহার করে মায়ার বর্ণনা দিতে হয় তাহলে আমি এক-কথায় ওকে বলব 'সাদামাঠা'। না, মায়া কুৎসিত নয়। তবে নেহাত প্রেমে অন্ধ না হলে 'ওকে কেউ 'সুন্দরী' বলে ভাববে না। এমনিতে ওর চেহারা রোগার দিকে, নাকটা বেশি লম্বা, আর গায়ের রং মাজা।

সোজা কথায় ওকে দেখতে আমার মতোই। শুধু আমি ওর চেয়ে ইঞ্চি-দুয়েক লম্বা আর স্বাস্থ্যও বোধহয় একটু ভালো। তা ছাড়া আমার চোয়ালের হাড় একটু উঁচু হওয়ায় প্রতিযোগিতায় মায়ার কাছে হয়তো আমি হেরেই যাব। সেইজন্যেই কাগজের অফিসে

কাজ করতে কখনও অস্বস্তিতে পড়তে হয়নি আমাকে। কেউ আমাকে একা-একা দেখা করার নেমন্তন্ন করেনি। সিনেমা দেখাতে চায়নি কেউ। আর অসাবধানে কেউ ধাক্কাও মারে না, আর হাত-টাত চেপেও ধরেনি কখনও। শুনেছি, আড়ালে কেউ-কেউ আমাকে পি. টি. উষা বলে ডাকে। সেটা নিশ্চয়ই আমার দৌড়ের বাহাদুরির জন্যে নয়।

রূপ না থাকুক, মায়ার গুণ অনেক। ভীষণ সমঝদার, দায়িত্বপরায়ণ, আর কাজপাগল। তা ছাড়া ওর ব্যবহারটাও বেশ মিষ্টি। সিদ্ধার্থ মায়ার ব্যাপারে রীতিমতো পাগল। সুতরাং সে যে বউকে সুন্দরী দেখবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

সত্যি কথা বলতে কি, যখন হঠাৎই মায়ার সঙ্গে সিদ্ধার্থকে প্রথম দেখি, তখন রীতিমতো অবাক হয়েছিলাম। কারণ সিদ্ধার্থর কাঠামো লম্বা, গঠন মজবুত, গায়ের রং ধবধবে ফরসা, মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল—সব মিলিয়ে দেবতার মতো চেহারা। এ ছাড়া ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে যার জন্যে ওকে সবাই ভালোবাসে। মেয়েদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, বাবা আর অলকও দেখি সবসময় ওর প্রশংসা করে। মাঝে-মাঝে ওর যে গম্ভীর খামখেয়ালিপনা তাও যেন মোটামুটি মেনে নিয়েছে সবাই।

মায়াকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু আমার মধ্যেও তো একটা মেয়ে রয়েছে। যে-মেয়েটা চিরকাল পুরুষের ভালোবাসার কাঙাল হয়ে রইল। যে-মেয়েটার নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও নেই। সেইজন্যেই হয়তো সিদ্ধার্থ-মায়ার সম্পর্ক জানার পরই একটা নাম-না-জানা গোপন প্রতিক্রিয়া কাজ করেছিল আমার মনে। মায়াকে কি হিংসে করতে শুরু করেছিলাম আমি? মায়ার মতো একটা অতি সাদামাঠা মেয়ে, যৌবনও যার সাদামাঠা, কী করে এই সুপুরুষ সুন্দর যুবককে বেঁধে ফেলল প্রেমের বাঁধনে? এত আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে দুনিয়ায়!

পরে মায়ার কাছে যখন ওদের ব্যাপারটা সবিস্তারে শুনেছি, তখন আমি আর তেমন অবাক হইনি।

'মন নিকেতন' নামে একটি মনোরোগ চিকিৎসাকেন্দ্র আছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে। সেখানে সাইকিয়াট্রিক নার্সের কাজ করত মায়া। ওর পড়াশুনো ছিল সাইকোলজি নিয়ে। অনার্স নিয়ে পাশও করেছে। তারপর নার্সিং-এর ট্রেনিং নিয়ে কী করে যেন চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল ওখানে। সে-সময়ে আমার খবরের কাগজের চাকরি বছর-চারেকের পুরোনো হয়ে গেছে। সুতরাং, মায়ার যে চাকরি করাটা খুব দরকার ছিল, তা নয়, কিন্তু ও আমার বা বাবার বারণ শোনেনি। অলক তখনও পড়াশুনো করছে, ছাত্র। আর মা-তো মালা-দেওয়া ছবি হয়ে গেছে সেই কোন কালে।

সুতরাং, মায়া লেগে পড়েছিল চাকরিতে। আর বেশ ফুর্তিতেই ছিল। ওর চাকরি যখন মাস-পাঁচ-ছয়েকের পুরোনো হয়েছে তখন সিদ্ধার্থ এসে ভরতি হয় ওই 'মন নিকেতন'-এ। সিদ্ধার্থ চাকরি করত একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ইরেকশন সাইটে—হলদিয়ায়। সেখানে প্ল্যান্টের প্রায় তেরো মিটার উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়ে যায় নীচে।

কিন্তু আশ্চর্যভাবেই ও তেমন আঘাত পায়নি শরীরে। নীচে একটা জাল থাকায় অনেকটা বেঁচে যায়। সুতরাং অল্প ক'দিনেই ও সেরে ওঠে। কিন্তু তখন ধরা পড়ে যে, ওর মনে একটা ভয়ানক ক্ষত রয়ে গেছে। ফলে মনের চিকিৎসার জন্যে সিদ্ধার্থ কলকাতায় চলে আসে।

মন যাদের ভাঙা তারা ভালোবাসা আর অনুভবে ঘেরা একটা জগৎ খুঁজে বেড়ায় প্রাণপণে। মায়ার কাছেই শুনেছি, রুগি আর ডাক্তার যদি দুজনেই পুরুষ অথবা মেয়ে হয় তাহলে তাদের মধ্যে সাময়িকভাবে পিতা-পুত্র বা মা-মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, প্যারেন্ট কমপ্লেক্স। আর যদি তাদের একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে হয়, তাহলে অনিবার্যভাবেই গড়ে ওঠে এক বিচিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক। নার্স বা ডাক্তাররা এই ব্যাপারটা বোঝেন, কিন্তু রুগি তখন বোঝার মতো অবস্থায় থাকে না। পরে সেরে উঠলে অবশ্য তাদের এই ভ্রম কেটে যায়।

যেসব রুগির অসুখ তেমন গভীর নয় তাদের জন্যে ডাক্তারবাবুরা স্বাভাবিক কারণেই বেশি সময় দেন না। ফলে তাদের 'সম্পর্ক' গড়ে ওঠে নার্সের সঙ্গে। কিন্তু অভিজ্ঞ নার্সরা জানেন, এই সাময়িক ভালোবাসা স্রেফ একটা অসুখের ঘোর।

সিদ্ধার্থ যখন প্রথম 'মন নিকেতন'-এ ভরতি হয় তখন তার মানসিক অবস্থা গোলমেলে ছিল। কিন্তু সামান্য চিকিৎসার পরেই ও আশ্চর্যরকমভাবে দ্রুত সেরে উঠতে থাকে। তখন ওর একমাত্র ওষুধ ছিল ঘুমের ট্যাবলেট আর বিশ্রাম। আর মায়া ছিল ওর পরিচর্যার দায়িত্বে। সুতরাং সিদ্ধার্থের মন আঁকড়ে ধরেছিল ওকে। মায়া জানত এটা নেহাতই অসুখের ঘোর, অসুখ সেরে গেলেই এই ভালোবাসা মিলিয়ে যাবে। এর আগেও এরকম হয়েছে দু-একবার। কিন্তু ওর কাছেই শুনেছি, সিদ্ধার্থ এমনভাবে ওর সঙ্গে কথা বলত, ওর দিকে চেয়ে থাকত যে, সেটাকে নেহাত ঘোর বলে ভাবা মুশকিল ছিল।

সিদ্ধার্থ ক্রমেই সেরে উঠেছিল, কিন্তু মায়ার প্রতি ওর ভালোবাসার অসুখটা কিছুতেই সারছিল না। মায়া আমাকে একদিন হেসে বলেছিল, 'দিদি তোকে কী বলব, তখন আমার অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। সিদ্ধার্থকে একবার না দেখে দশটা মিনিটও স্থির হয়ে থাকতে পারতাম না।'

সেই সময়ে মায়া নাকি মনে-মনে ভাবত, 'ইস, সিদ্ধার্থের এই অসুখের ঘোরটা যদি সত্যি হয়, তাহলে কী দারুণ হয়।'

শেষ পর্যন্ত মায়ার অনুমানই ঠিক দেখা গেল। সিদ্ধার্থ প্রায় সরাসরিই ওকে জানাল নিজের ভালোবাসার কথা। তখন মায়ার বয়েস সাতাশ, আর সিদ্ধার্থরও তাই। সুতরাং ব্যাপারটা যে নেহাত ছেলেমানুষি কচি প্রেম তাও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়া ভয় পাচ্ছিল। সিদ্ধার্থর মতো একজন রূপবান সুপুরুষ সত্যি-সত্যি ওর মতো একজন অসুন্দরী সাধারণ মেয়ের প্রেমে পড়বে, এই ব্যাপারটা ও ঠিক মেনে নিতে পারছিল না। ও ভাবছিল, সিদ্ধার্থের বোধহয় ঘোর কাটতে দেরি হচ্ছে। তাই ও সিদ্ধার্থকে বলে আরও

সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে।

ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থর মা-বাবা নেই। কাকা-কাকিমার কাছে মানুষ। মায়া ওকে বলে, একমাস সিদ্ধার্থ যেন ওর সঙ্গে দেখা না করে; কোনও চিঠিপত্রও না দেয়। তারপরেও যদি সিদ্ধার্থর এই ঘোর না কাটে তাহলে সে যেন কাকা-কাকিমার অনুমতি নিয়ে মায়ার সঙ্গে দেখা করে। তখন মায়া ওকে আর ফেরাবে না।

না, মায়া ফেরাতে পারেনি সিদ্ধার্থকে। ও আটাশ দিনের শেষেই মায়ার কাছে এসে হাজির হয়েছিল।

মায়া বলেছিল, 'একমাস তো এখনও হয়নি!'

তার জবাবে সিদ্ধার্থ বলেছিল, 'ধরে নাও না এটা ফেব্রুয়ারি মাস—।'

এরপর মায়া আর 'না' বলেনি। আর আমরাও খুশি হয়েই ওদের বিয়ে দিয়েছি। পুরোনো চাকরি থেকে সিদ্ধার্থ পাকাপাকিভাবে ছুটি নিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ইলেকট্রনিক্সে ওর দক্ষতা থাকায় অন্য আর-একটা চাকরিও পেয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। একই-সঙ্গে টিভি-ভি. সি. আর. রিপেয়ারের একটা সার্টিফিকেট কোর্স করে ফেলল। তারপর সল্ট লেকে এই দোতলা ছোট বাড়িটা ভাড়া নিয়ে গুছিয়ে সংসার পাতল।

সিদ্ধার্থর সংসার সামলে উঠতেই মায়া ওর চাকরি ছেড়ে দিল। শুধু মাঝে-মাঝে স্পেশাল কল পেলে 'মন নিকেতন'-এ যায়।

বিয়ের বছরদুয়েক পরেই এল টনি। মায়া মা হয়ে গেল পুরোপুরি। এই সময়ে ওর পেটের রোগ দেখা যায়। তখন ডাক্তারের পরামর্শ মতো ও যোগব্যায়াম শুরু করে। ছোটবেলা থেকেই ও যোগব্যায়াম শিখত, শুধু মাঝে বছর-তিনেক ফাঁক পড়েছিল। যাই হোক, তারপর থেকে কখনও ওর শরীর-টরির বিশেষ খারাপ হয়নি।

মন নিয়ে সিদ্ধার্থের সমস্যা এখনও যে ঠিক পুরোপুরি মিটেছে তা নয়। গোলমালটা স্রেফ মাঝে-মাঝে ওর 'মুড অফ' হয়ে যাওয়া। এইটুকুই। সিদ্ধার্থকে এখন কোনওরকম চিকিৎসা করতে হয় না। ওর যেটুকু তদারকি করার তা মায়াই দিব্যি করতে পারে।

সোমবার রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টিভির সামনে বসে আমি গল্প করছিলাম মায়ার সঙ্গে। টনি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। খোলা জানলার পরদার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার রাত।

সিদ্ধার্থকে স্টেশনে পৌঁছতে যায়নি মায়া। অফিসের গাড়িই ওকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। আমি তল্পিতল্পা নিয়ে এসে পৌঁছেছি সাড়ে সাতটা নাগাদ। তখন বাড়িতে শুধু মায়া, টনি, আর কাজল নামে কাজের মেয়েটা।

গল্প করতে-করতে কী করে যেন এসে পড়ল আয়রনম্যানের কথা। মায়া বলল, 'আর পারি না! এই বছর-দেড়েক আগে গেল স্টোনম্যানের ঝামেলা, আবার এখন আয়রনম্যান। দুটো একই লোক নয়তো রে?'

আমি বললাম, 'না, বরং একেবারেই আলাদা—অন্তত পুলিশের তাই মত।'

তারপর নানা কথার পিঠে আবার এসে গেল সিদ্ধার্থের কথা। মায়াই তুলল। বেশ

খুশি-খুশি মুখে ওদের বিয়ে নিয়ে নানান কথা বলতে লাগল।

একসময় আমি জিগ্যেস করলাম, 'সিদ্ধার্থের মেন্টাল কোনও প্রবলেম এখন আর আছে?'

উত্তর দিতে মায়া এত সময় নিল যে, আমি সোজা হয়ে বসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি কি ওর কোনও নরম জায়াগায় স্পর্শ করেছি?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে মায়া বলল, 'না, সেরকম কিছু নেই। তবে অ্যাকসিডেন্টে ওর বাইরের চেয়ে ভেতরে আঘাতটা লেগেছিল বেশি। তা ছাড়া, আমি তো ওর ব্যাপারটা পুরোপুরি জানি, ওর বরাবরই একটু ইমোশন্যাল প্রবেলেম আছে।'

'তার মানে?' আমার ভুরু কুঁচকে গেল।

'মানে—' একটু ইতস্তত করে মায়া বলল, 'অনেকটা স্কিৎজোফ্রিনিয়া টাইপের।'

'স্কিৎজোফ্রিনিয়া! সে তো রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার!'

'দুর, ভয় আবার কী!' মায়া উঠে গেল টিভির কাছে। টিভি অফ করে পাশের জানলার কাছে গেল। পরদা সরিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'মারাত্মক স্কিৎজোফ্রিনিয়ার রুগি যারা, তাদের নিয়ে ভয় আছে। তবে সিদ্ধার্থরটা খুবই সামান্য টাইপের। তুই তো ঠিক টের পাবি না—তোর অফিসেই হয়তো একডজন লোক আছে, যাদের তুই খুব সাধারণ স্বাভাবিক ভাবিস। দেখা যাবে, তাদের হয়তো হালকা স্কিৎজোফ্রিনিয়ার দোষ আছে।'

আমার দুশ্চিন্তাটা কিছুতেই যেন যেতে চাইছিল না। সেটাই প্রশ্ন হয়ে বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, 'পরে যদি অসুখটা আরও খারাপের দিকে যায়?'

'তুই যেরকম ভয়ের ভাবছিস এটা মোটেই সেরকম নয়।' মায়া আমার কাছে এসে বলল, 'সিদ্ধার্থ এখন যেরকম আছে সেরকমই থাকবে—এর চেয়ে খারাপও হবে না, এর চেয়ে ভালোও হবে না। আমি তো ওর ব্যাপারটা গোড়া থেকে জানি, তা ছাড়া এতদিন ঘর করছি। ওই শুধু মাঝে-মাঝে চুপচাপ হয়ে যাওয়া ছাড়া ওর আর কোনও গোলমাল নেই। ওর মনের ভেতরে আলাদা জগতের মতো একটা জায়গা আছে। ও যখন চুপচাপ হয়ে যায় তখন ওই ভেতরের দুনিয়ায় ঢুকে বসে থাকে। এ ছাড়া ওর আর কোনও প্রবেলম নেই।'

'তোর এত কথার মারপ্যাঁচ আমার মাথায় ঢুকছে না।'

মায়া হেসে আমাকে ছোট্ট ঠেলা মারল একটা 'ঢোকাতে কে বলেছে!'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমাকে ভুল বুঝিস না, মায়া—সিদ্ধার্থকে আমি অপছন্দ করি না। তবে...সব জেনেশুনে তুই ওকে কী করে যে বিয়ে করলি...।'

মায়া অবাক চোখে কয়েকপলক তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বলল, 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে! আমি ওকে ভালোবাসি—।'

'এটা কোনও জবাব হল না। জ্যাক দ্য রিপারকে ভালোবাসলে তুই তাকে বিয়ে করতে পারতিস?'

'এ-কথার কোনও মানে হয় না!'

আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম, 'রাগ করিস না রে! আসলে তোকে আমি বড্ড ভালোবাসি। আমার শুধু যেটা অবাক লাগছে সেটা হল, সাইকোলজি নিয়ে পড়াশুনো করেও কী করে যে তুই একটা স্কিৎজোফ্রিনিককে বিয়ে করলি—।'

'ওঃ, দিদি, সিদ্ধার্থ স্কিৎজোফ্রিনিক নয়। ওর শুধু স্লাইট ওই ধরনের ঝোঁক আছে।'

বুঝতে পারছিলাম, মায়া এবারে বেশ বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু আমারও যে কী হয়েছে! মনে হচ্ছিল, ওকে সিদ্ধার্থ সম্পর্কে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগ্যেস করি। ভালোবাসা কাকে বলে সেটা যে আমার জানা নেই! তাই জানতে ইচ্ছে করে ভীষণ।

মায়াকে সহজ করতে হেসে বললাম, 'তা তোর সাহস আছে বলতে হবে। ওর ওইরকম ঝোঁক আছে জেনেও তুই ওকে বিয়ে করার ঝুঁকি নিয়েছিস।'

মায়া অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হল ও বোধহয় নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত ও হাসল। খানিকটা অবজ্ঞার হাসি। তারপর বলল, 'নাঃ, তোর ওপরে রাগ করব না। তুই আমাকে সত্যিই ভালোবাসিস। তবে একটা পুরুষের সঙ্গে ভালোবাসা যে কী জিনিস সেটা তুই ঠিক বুঝবি না। তুই বলেছিস ঠিকই, ঝুঁকির ব্যাপারটা আমি চিন্তা করেছিলাম। তবে সিদ্ধার্থ যেরকম পাগলের মতো ভালোবাসত আমাকে, তাতে ওই চিন্তাটা শেষ পর্যন্ত টেকেনি।'

আমি চোখ মটকে বললাম, 'সামান্য ঝুঁকি তাহলে রয়েই গেছে বল্!'

মায়া ঠোঁট বেঁকাল, বলল, 'তাতে কী! সিদ্ধার্থ ছাড়া আর কোনও ছেলেও তো দ্বিতীয়বার ঘুরে আমাকে দেখেনি—।'

আমার কপালে বোধহয় ভাঁজ পড়েছিল, কারণ মায়া হাত নেড়ে বলে উঠল তড়িঘড়ি, 'আমাকে তুই ভুল বুঝিস না। ভাবিস না যে, বহুকাল আইবুড়ি থেকে ভালোবাসার খিদেতে যে-সুযোগ হাতের কাছে পেয়েছি সেটাকেই ঝাঁপিয়ে আঁকড়ে ধরেছি। আমি যদি বিশ্বসুন্দরীও হতাম, তাহলেও সিদ্ধার্থর ভালোবাসা ফেরাতে পারতাম না। শুধু চেহারাটা নয়, ওর আরও অনেক গুণ আছে।'

কয়েক সেকেন্ড আমরা চুপচাপ। তারপর সামনের জানলার পরদার দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন জড়ানো গলায় মায়া বলল, 'তুই তো কখনও প্রেমে পড়িসনি! সিদ্ধার্থ যদি বদ্ধ পাগলও হয়, তাহলেও ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ওকে আমি দারুণ ভালোবাসি রে। ওর জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি।'

আমার কেমন যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। তা না হলে ফস করে বলে বসতাম না, 'ও তোকে যদি খুন করতেও আসে, তাহলেও তুই চুপচাপ সেটা মেনে নিবি?'

মায়া হাসল, বলল, 'বুঝেছি, তোর ঝটপট একটা বিয়ের দরকার। সিদ্ধার্থ ফিরে আসুক, ওকে বলছি।'

মায়া হাই তুলে উঠে বসল সোফা ছেড়ে। বলল, 'ওঠ, দশটা বাজে। ঘুম পাচ্ছে।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে চুল ঝাঁকালাম। এলো চুলটা হাত-খোঁপা করে নিলাম। মায়া

আমার শরীরের দিকে অদ্ভুত চোখে দেখছিল। হঠাৎই বলল, 'তোর শেষ প্রশ্নের উত্তরটা এখনও দেওয়া হয়নি। মনে হয়, ও যদি খুনি হয়, তাহলে খুন হতে আমার আপত্তি থাকবে না।'

আমার পিঠ বেয়ে দুটো পাহাড়ি কাঁকড়াবিছে নেমে গেল সরসর করে। ওদের পাগুলো যেন বরফের তৈরি। কী বলছে আমার ছোট বোন! কল্পনায় দেখতে পেলাম, মায়া ভালোবাসা-মাখা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর সিদ্ধার্থ ঝুঁকে পড়ে টিপে ধরেছে ওর নরম গলা। সিদ্ধার্থের চোখ হিংস্র পাগলের মতো বেঁকেচুরে ভয়ানক হয়ে গেছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'বাদ দে তো, ঢের হয়েছে! মোদ্দা কথা, তুই ওকে ভালোবাসিস, আমিও ওকে পছন্দ করি। সিদ্ধার্থর মতো ছেলে হয় না।'

মায়া শোওয়ার ঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছিল, আমি ডাকলাম ওকে, 'তোর কাছে পাতিলেবু আছে? থাকলে একগ্লাস শরবত করে খেতাম—।'

'রান্নাঘরে আছে। চল্, দিচ্ছি—।'

একতলার পেছন দিকটায় রান্নাঘর। বেশ বড়, আর গোছানো। সেখানে পৌঁছে মায়া দুটো গ্লাস নিয়ে রাখল গ্যাস স্টোভের পাশের তাকে। তারপর নিচু হয়ে একটা দেরাজের পাল্লা খুলে ছুরি, চিনি, নুন বের করল। তারপর আমাকে বলল, 'ফ্রিজে পাতিলেবু আছে।'

আমি দূরের কোণে রাখা ফ্রিজ খুলতে গেছি, অমনই নজর গেল সামনের জানলার দিকে। থমকে দাঁড়ালাম। মায়াকে বললাম, 'আলো নিভিয়ে এদিকে আয়—।'

মায়া অবাক হয়ে দেখল আমাকে। তারপর সুইচ টিপে রান্নাঘরের আলোটা অফ করে দিল। এগিয়ে এল আমার কাছে।

আমাদের সামনেই গ্রিল দেওয়া খোলা জানলা। জানলার পরেই একটা সরু অলি-পথ। তার পরেই আর-একটা বাড়ি। বাড়ির একটা জানলা মায়াদের রান্নাঘরের জানলার প্রায় মুখোমুখি।

ও-বাড়ির জানলায় কাচের শার্শি দেওয়া। তবে ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছিল, তাই মেয়েটি বোধহয় খোলা জানলার ব্যাপারটা খেয়াল করেনি।

মেয়েটি হয়তো সবে বাইরে থেকে ফিরেছে। এখন পোশাক ছাড়ছে। পরনে সবুজ আর নীল মেশানো গার্ডেন শাড়ি। গাঢ় নীল ব্লাউজ।

মায়া চাপা গলায় বলল, 'মিসেস কাপুর, মডেলিং করে—।'

আমি মিসেস কাপুরকে দেখছিলাম।

লম্বা, ফরসা, অপূর্ব দেহের গঠন। যে-কোনও পুরুষের মাথা চিবিয়ে খেতে পারেন অতি সহজে। চলাফেরায় এক অদ্ভুত পেশাদারি ছন্দ।

শাড়িটা খসে পড়ল মেঝেতে।

মায়া হাত ধরে টানল আমাকে : 'চলে আয়—।'

আমি ওকে টেনে দাঁড় করালাম। বললাম, 'দেখলে ক্ষতি কী!'

না, লুকিয়ে লোকজনের বাড়িতে উঁকি মারা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু কী যে এক

কৌতূহল চেপে বসল মাথায়...মনে হল, দেখি না। হয়তো অবচেতনে আমার গঠনের সঙ্গে মিসেস কাপুরের গঠনের একটা তুলনা করার লোভও ছিল।

জামাকাপড় ছাড়তে মিসেস কাপুরের বেশ সময় লাগছিল। কারণ ওঁর সব কাজের মধ্যেই একটা গোছানো কেতা আছে।

পরনের শাড়িটা খুলে উনি সেটা পরিপাটি করে ভাঁজ করতে লাগলেন। আর আমরা দেখতে লাগলাম।

একটু পরে উনি সরে গেলেন জানলার কাছ থেকে। যখন ফিরে এলেন তখন ব্লাউজ আর নেই। ব্রেসিয়ারের বাঁধনে জোড়া যৌবন উপচে পড়তে চাইছে। ঢেউখেলানো ফাঁপা চুল থেকে ক্লিপ খুললেন মিসেস কাপুর। মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ছড়িয়ে দিলেন বুকে-পিঠে।

'মডেল হওয়ার মতোই চেহারা—' আমার গলার স্বর কেমন জড়ানো শোনাল। হঠাৎই টের পেলাম, ঠান্ডার আমেজের মধ্যেও ঘাম জমছে আমার হাতের তালুতে।

মাথা ঝুঁকিয়ে ব্রেসিয়ারের সামনের হুক খুলে দিলেন মিসেস কাপুর। তারপর হাত বাঁকিয়ে খুলে ফেললেন অন্তর্বাস। অবিশ্বাস্য গঠনের স্তন সামনে ঝাঁপিয়ে আমাকে অবাক করে দিল। মায়াও নিশ্চয়ই অবাক হয়েছে।

আমার নিশ্বাসে তাপ উঠছিল। হঠাৎই মনে হল, সিদ্ধার্থ কি কখনও এ-দৃশ্য দেখেছে!

এরপর বুকে গলায় বগলে পাউডার মাখতে শুরু করলেন মিসেস কাপুর। পাউডার মাখা হয়ে গেলে একটা হলদে তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে সরে গেলেন জানলা থেকে।

মিনিট-তিন-চারেক অপেক্ষা করেও ওঁকে আর দেখতে পেলাম না।

মায়া আবার আমার হাত ধরে টানল। বলল,'চল্ তো, ঢের হয়েছে—।'

কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি সরে এলাম। মায়া রান্নাঘরের আলো জ্বেলে শরবত তৈরি করতে লাগল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'মিসেস কাপুর প্রায়ই এরকম করে নাকি রে?'

মায়া চামচ নেড়ে গ্লাসে চিনি গুলতে-গুলতে বলল, 'স্বামী বিরাট বিজনেসম্যান। মাসের অর্ধেকদিন বাইরে। আর এদিকে গ্ল্যামার গার্ল বউ মডেলিং করে বেড়াচ্ছে। অবশ্য টাকাও আসছে অনেক।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে—"ড্রিম" সাবানের বিজ্ঞাপনে মিসেস কাপুরের ছবি দেখেছি।'

শরবতে চুমুক দিতে-দিতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। আবার এসে বসে পড়লাম ডাইনিং স্পেসের সোফায়। বুঝতে পারছিলাম, মিসেস কাপুরকে দেখার পর মায়ার ঘুম সাময়িকভাবে হলেও উবে গেছে।

এবারে আসল কথা জিগ্যেস করলাম, 'সিদ্ধার্থ কখনও এ-দৃশ্য দেখেছে?'

'না দেখার কী আছে!' মায়া হালকা চালে মন্তব্য করল, 'আমিই অনেক সময় ওকে হাতেনাতে ধরেছি।'

'মিসেস কাপুর কখনও জানলার পরদা টেনে কাপড় ছাড়ে না?'

মায়া হাসল, বলল, 'হ্যাঁ, যখন স্বামী বাড়িতে থাকে, তখন। মনে হয়, ওর স্বামীই

পরদা টেনে দেয়।'

একটু চুপ করে থেকে মায়া আবার বলল, 'সিদ্ধার্থর ধারণা, মিসেস কাপুরের লোক-দেখানোর বাতিক নেই। সেটা হলে হাবভাব দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যেত। তা ছাড়া, আমি দু-একবার ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। বেশ হাসিখুশি, ভদ্র, আর স্বামীকেও দিব্যি ভালোবাসে বলে মনে হয়। আসলে পরদা টানার ব্যাপারটা হয়তো ঠিক খেয়ালই থাকে না।'

'সিদ্ধার্থ যে ওকে লুকিয়ে-লুকিয়ে দ্যাখে, তাতে তোর খারাপ লাগে না?'

মায়ার হাতের গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছিল। আমারটাও। ও গ্লাস দুটো দু-হাতে নিয়ে উঠে পড়ল, বলল, 'কেন, খারাপ লাগবে কেন? ও তো আর মিসেস কাপুরের সঙ্গে শুতে যাচ্ছে না। বরং এসব দেখলে সিদ্ধার্থের ভালোবাসা চাগিয়ে ওঠে—তাতে আমারই লাভ—' মায়া হেসে উঠল খিলখিল করে। তারপর বলল, 'নে, এবারে শুতে যা, কাল সকালেই তো তোকে আবার কাজে বেরোতে হবে—।'

অগত্যা উঠে পড়লাম।

রাতে ঘুম আসতে বেশ দেরি হল। চোখের সামনে বারবারই মিসেস কাপুরের শরীরটা ভেসে উঠছিল, আর মনে পড়ছিল আয়রনম্যানের কথা।

পরদিন অফিসে যাওয়ার পথে মায়া আর টনির জন্যে আমার দুশ্চিন্তা হতে লাগল।

না, দিনের বেলা যে কিছু হবে সে-ভয় আমি পাচ্ছি না। ভাবছি, অফিস থেকে ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়!

নিউজ এডিটর সুদেব চ্যাটার্জিকে বললাম যে, আপাতত আমি দিন-সাতেক বোনের বাড়িতে আছি, কোনও এমার্জেন্সি দরকার পড়লে যেন সেখানে খবর পাঠানো হয়।

আয়রনম্যানের ব্যাপারে অফিসে দুটো উড়ো টেলিফোন এল। একজন জানাল যে, সে একটি লোককে আয়রনম্যান বলে সন্দেহ করে, কারণ, লোকটা নাকি সবসময় হাতে লোহার রড নিয়ে ঘোরে।

দ্বিতীয় ফোনটি এক মহিলার। তাঁর ধারণা, আজ রাতে তিনিই নাকি আয়রনম্যানের হাতে খুন হবেন।

সুদেব চ্যাটার্জি এগুলো পাত্তা দিলেন না। এরকম উড়ো ফোন প্রায়ই আসে আমাদের দপ্তরে। বরং আমাকে বললেন, লালবাজারে গিয়ে আয়রনম্যানের বিষয়ে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায় কি না দেখতে।

কথাটা ঠিকই। এখন রোজকার কাগজে আয়রনম্যানের খবর থাকা চাই। তা না হলে কাগজের বিক্রি পড়ে যাবে।

দুপুরবেলার দিকে খবর এল, রেসকোর্সের কাছে একটা লোক নাকি মরে পড়ে আছে। তার মাথাটা ভারি কিছু দিয়ে থেঁতলানো। বোঝাই যাচ্ছে, আয়রনম্যানের কাজ নয়,

কিন্তু তবুও সুদেব চ্যাটার্জি বললেন, 'তুমি চলে যাও, যেটুকু পারো খবর নিয়ে এসো। কালকের কাগজে "স্টোনম্যান ফিরে এল?" এই হেডিং দিয়ে মালটা পাবলিককে খাইয়ে দেব। আর ফেরার পথে লালবাজার ঘুরে এসো—।'

এইভাবে সারাদিনের ধকল সামলে অবশেষে সল্ট লেকের পথে।

রেসকোর্সের ঘটনাটা বোধহয় নেহাতই দুর্ঘটনা। কোনও লরি হয়তো লোকটাকে ধাক্কা মেরেছে রাতে। তারপর বডিটা তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছে রাস্তার ধারে গাছতলায়।

উলটোডাঙ্গা-ভি. আই. পি. রোড-এর মোড়ে নেমে পড়লাম কয়েকটা জিনিস কেনাকাটার জন্যে। একটা কোল্ড ক্রিম, একটা নেলপলিশ, আর হজমের জন্যে এক ফাইল কারমোজাইম। এটা আমাকে থেকে-থেকেই খেতে হয়। মাঝে-মাঝে বুঝতে পারি, যৌবন-এলাকার পাঁচিল ডিঙিয়ে আমি বোধহয় ঢুকে পড়তে চলেছি মাঝবয়েসি-এলাকায়।

সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড় আর গাড়ির স্রোত। কোনওরকমে রাস্তা পার হয়ে বাস-স্টপেজে পৌঁছে গেলাম। একটা ভিড়-বাসে ঠেলেঠুলে উঠে পড়লাম। যেতে-যেতে মনে হল, আয়রনম্যান তো এই বাসেই থাকতে পারে। লোকটাকে দেখে মনে হবে সুস্থ স্বাভাবিক সংসারী মানুষ। কিন্তু রাতের বেলায় মানুষটা যাবে পালটে।

মায়ার বাড়ির সামনে নেমে পুরোনো কথাটা আবার মনে হল এলাকাটা বেশ নির্জন। আয়রনম্যানের কাজ সারার পক্ষে আদর্শ। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

মায়ার বাড়ির একতলায় রাস্তামুখো একটা বড় বারান্দা রয়েছে। গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সেখানে টনি তিনচাকার সাইকেল চালাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'ভালোমাসি, এই দ্যাখো, সাইকেল—' তারপর ওর ছোট-ছোট পায়ে প্যাডেল করতে লাগল।

এমন সময় কাজল বারান্দায় এসে আমাকে দেখতে পেল। দেখেই 'দরজা খুলছি' বলে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি টনির সাইকেল চালানো দেখছিলাম। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা! অন্তত ওর জন্যে মায়া সিদ্ধার্থর কাছে ঋণী। বাচ্চাটাকে দেখলে বুকের ভেতরে অন্যরকম আকাঙ্ক্ষা জাগে। টনির সাইকেল চালানোয় উৎসাহ দিতে আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম। ও হেসে উঠল খিলখিল করে।

কাজল দরজা খুলে দিয়েছিল। আমি ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে। শাঁখের আওয়াজ পেলাম। মায়া 'সন্ধ্যা' দিচ্ছে। অজান্তেই আমার হাত উঠে গেল কপালের কাছে। আর একটা চাপা প্রার্থনাও যেন উঁকি মারতে চাইল। অনেক কষ্টে সেটাকে ঢুকিয়ে দিলাম বুকের ভেতরে।

রান্নাবান্নায় কয়েক ঘণ্টা সময় কেটে গেল চোখের পলকে। তারপর একটু ফুরসত পেয়ে মায়া উলবোনা নিয়ে বসল। টনি শোওয়ার ঘরে কাজলের কাছে ছবির বই দেখে-দেখে 'এ বি সি ডি' পড়ছে। আমি আমার ছোট ঘরটায় এসে চটপট একটা রিপোর্টের

কপি তৈরি করে নিলাম। তারপর গালে একটু ক্রিম ঘষে নিয়ে কী করব ভাবছি, হঠাৎই মনে হল ওষুধের শিশিটার মুখটা খুলে রাখি।

প্যাঁচ ঘুরিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের সিলটা ভাঙতে পারলাম না। তখন একটা জুতসই অস্ত্রের জন্যে এপাশ-ওপাশ খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। অগত্যা মায়ার শরণাপন্ন হলাম।

মায়া উল বুনছিল বিছানায় বসে। জিগ্যেস করলাম, 'তোর কাছে স্ক্রু-ড্রাইভার আছে?'

ও বলল, 'দোতলায় চিলেকোঠায় দ্যাখ। ওটা সিদ্ধার্থর টিভি সারানোর ঘর। ওখানে ছাইপাঁশ যা চাস সব পাবি। ঘরে ঢুকেই ডানদিকের দেওয়ালে আলোর সুইচ আছে।'

সুতরাং গেলাম দোতলায় স্ক্রু-ড্রাইভারের খোঁজে।

ছাদের ওপরে ডানদিক ঘেঁষে আট বাই ছয় মাপের ছোট একটা ঘর। আলো জ্বালতেই ঘরের গোটা চেহারাটা ফুটে উঠল।

ঘরের মেঝেতে একপাশে তার, প্লায়ার্স, হাতুড়ি, সল্‌ডারিং আয়রন ইত্যাদি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে তিনটে চৌকোনা কাঠের বাক্স। তার ভেতরে নানান যন্ত্রাংশ—হয়তো টিভি কিংবা ভি.সি.আর.-এর। ঘরের ডানদিকের কোণে একটা টুলের ওপরে বসানো রয়েছে একটা ছোট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি। তার পেছনেই প্লাগ পয়েন্ট।

ঘরের বাঁদিকের দেওয়ালে তিনটে তাক। তাকে তারের কয়েল, টুকিটাকি যন্ত্রপাতি, আর ময়লা কাপড়ের কয়েকটা টুকরো রয়েছে। তাকের পাশেই একটা ছোট কাঠের আলমারি। আলমারির পাল্লা ভেজানো। আলমারির ওপরটা ময়লা, কালচে। সেখানেও কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ল।

ঘরের সিলিং থেকে ঝোলানো একটা তারে লাগানো রয়েছে একটা বাল্‌ব। বাল্‌বের নীচে একটা আধখোলা টিভি সেট। বোধহয় সেটা সারানোর কাজ চলছে।

সব মিলিয়ে ঘরটার চেহারা সত্যিই কোনও মিস্ত্রির ঘরের মতো। কিন্তু হলে হবে কী, আমি তো আমার কাজের জিনিসটা খুঁজে পাচ্ছি না!

এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমি এগিয়ে গিয়ে আলমারিটার দরজা খুললাম।

আলমারির দরজা খুলেও যেন সেই একই দৃশ্য। তবু তারই মধ্যে একটা বড় প্লাস্টিক-বাক্স চোখে পড়ল। বাক্সটা খুলতেই একটা স্ক্রু-ড্রাইভার পেয়ে গেলাম। কিন্তু একইসঙ্গে আরও কয়েকটা জিনিস নজরে পড়ল আমার।

একটা খুব সরু আর লম্বা নোজ প্লায়ার্স। একটা সরু হ্যাক স'। একটা লম্বা চ্যাপ্টা স্টিলের পাত। একটা শিশি—শিশিতে জলের মতো কী যেন রয়েছে। আর-একজোড়া কালো দস্তানা।

শেষ তিনটে জিনিস আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলল। প্রথমে স্টিলের পাতটা চিনতে পারলাম। দরজার হুড়কো বা খিল খোলার কাজে চোর-ছ্যাঁচড়রা এ-ধরনের জিনিস

ব্যবহার করে। মনে পড়ল, একবার লালবাজারে একটা চোরের কাছে এরকম একটা প্যাত দেখেছিলাম।

শিশির বস্তুটি কী জিনিস সেটা ভালো করে দেখার জন্যে শিশিটা তুলে নিলাম হাতে। শিশির ছিপিটা কাঁচের। সেটা খুলতেই গাঢ় ধোঁয়ার কয়েকটা রেখা বেরিয়ে এল বাইরে। সেই সঙ্গে ঝাঁঝালো গন্ধ। অ্যাসিড নাকি? তাড়াতাড়ি ছিপি বন্ধ করে ওটা আবার জায়গামতো রেখে দিলাম।

আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। নোজ প্লায়ার্স, হ্যাক স', স্টিলের প্যাত, অ্যাসিড, কালো দস্তানা—এসব সিদ্ধার্থের কোন কাজে লাগে?

আমার বুদ্ধি যে সাঙ্ঘাতিকরকম একটা কিছু তা নয়। আবার বুদ্ধিতে যে খুব একটা পিছিয়ে আছি তাও নয়। তবু জিনিসগুলো দেখে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, সিদ্ধার্থ এসব অদ্ভুত জিনিস দিয়ে কী করছে!

এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়তো অস্বাভাবিক নয়, তবে এই সামান্য কারণেই কোনও সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়াটাও নিশ্চয়ই বিবেচনার কাজ নয়। তার ওপর সিদ্ধার্থ যেখানে আমার ভগ্নীপতি। সুতরাং, এইসব কুচিন্তাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা দমফাটা কৌতূহল, নাকি রিপোর্টার হওয়ার সহজাত সন্দেহবাতিক অভ্যেস, কাজ করতে লাগল আমার মনের মধ্যে। ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি আলমারিটা হাঁটকাতে শুরু করলাম।

আলমারির একেবারে নীচের তাকটা দেখার জন্যে আমাকে মেঝেতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল। ওটা হাতড়ে কয়েকটা বই পেলাম। বেশিরভাগই বোধহয় ইলেকট্রনিক্সের। তা ছাড়া বেশ কয়েকটা ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের টুকরো। কিন্তু কাপড়ের টুকরোগুলো টানাটানি করার সময়েই বেরিয়ে এল দুটো আধময়লা ব্রেসিয়ার। আরও খোঁজাখুঁজি করতেই পাওয়া গেল দুটো শায়া এবং আরও দুটো ব্রেসিয়ার।

চারটে ব্রেসিয়ার খুঁটিয়ে দেখলাম।

চারটে যে চার ধরনের তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আর সেটা বোঝার জন্যে অন্তর্বাস বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। এ ছাড়া ওগুলোর মাপও সমান নয়।

একবার মনে হল, এই পোশাকগুলো মায়ার নয় তো! কিন্তু আমি ভালো করে জানি, অন্তর্বাসের ব্যাপারে মায়া একটু সেকেলে ধরনের। লেসের স্বচ্ছ কারুকাজ বা সামনে হুক—এসব ওর পছন্দ নয়। অথচ তিনটে ব্রা-তেই এরকম ব্যাপার রয়েছে। চার নম্বরটা অবশ্য সাদাসিধে, তবে তার মাপ মায়ার পক্ষে বেশ বড়।

সুতরাং, শায়া দুটো নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামালাম না। কিন্তু এই ব্যবহার-করা অন্তর্বাসগুলো দেখে আমার হাত-পায়ে মাকড়সা হেঁটে বেড়াতে লাগল।

এইবারে আর মনকে তেমন লাগামে রাখতে পারছিলাম না। ভয়ঙ্কর সব চিন্তা ঘুরতে শুরু করেছে মাথার মধ্যে। কিন্তু যেহেতু সিদ্ধার্থকে আমি পছন্দ করি সেহেতু এগুলোর কোনও সহজ-সরল ব্যাখ্যার কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ব্যাপার আমার মাথায় এল। না, সিদ্ধার্থ আয়রনম্যান নয়। কারণ, মায়ার কথা অনুযায়ী মিসেস কাপুরকে সিদ্ধার্থ বহুবারই নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখেছে। মিসেস কাপুর তরুণী এবং সুন্দরী—আয়রনম্যানের শিকাররাও তাই। তা ছাড়া সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই জানে, মিস্টার কাপুর ব্যাবসার কাজে মাসের অর্ধেকটা সময়ই বাইরে-বাইরে কাটান। সুতরাং সিদ্ধার্থই যদি আয়রনম্যান হবে তাহলে মিসেস কাপুরকে এখনও খুন করেনি কেন?

প্রশ্নটা মনে জেগে ওঠামাত্রই তার উত্তরটাও উঁকি দিল। উত্তরটা সিদ্ধার্থর পক্ষে সুবিধেজনক নয়। যারা পাগল হয় তারা সবসময় বোকা হয় না। বিদেশে এরকম বহু পাগল খুনির নজির আছে যারা ভীষণ চালাক ছিল। যেন, বস্টন স্ট্র্যাংলার, জ্যাক দ্য রিপার এরা। সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই মিসেস কাপুরকে খুন করার মতো বোকা নয়। কারণ, মিসেস কাপুর ঠিক ওর পাশের বাড়িতেই থাকেন। খুন করার পক্ষে বড় বেশি কাছাকাছি।

তা সত্ত্বেও আমি অন্তর্বাসগুলোর অন্য কোনও ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করলাম। আর-কোন কারণে এগুলো এখানে আসতে পারে?

কিন্তু অনেক ভেবেও আর-কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না।

এবার আমি ঘেন্না না করে অন্তর্বাসগুলো শুঁকে দেখতে লাগলাম। মানছি, আমার ঘ্রাণশক্তি কুকুরের মতো জোরালো নয়, কিন্তু আমি তো মেয়ে! গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারব না এই ছ'টা পোশাক ছ'টি আলাদা মেয়ের কি না?

অনেকক্ষণ ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে মাত্র চারটি গন্ধ আলাদা বলে ঠাহর হল।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। আমার দেরি দেখে মায়া কি ওপরে উঠে আসছে?

সুতরাং, যত তাড়াতাড়ি পারি জিনিসগুলো সব জায়গামতো রেখে দিলাম।

প্লাস্টিকের বাক্স বন্ধ করে আলমারির পাল্লা ভেজিয়ে দিলাম আবার। স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দরজা টেনে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি, দেখি মায়া চটি ফটফটিয়ে উঠে আসছে ওপরে।

'কী রে; এতক্ষণ লাগছে তোর স্ক্রু-ড্রাইভার খুঁজতে?'

আমি কষ্ট করে হালকা সুর ফোটালাম গলায় : 'বাব্বাঃ, এত সব যন্ত্রপাতির মধ্যে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়! তা সিদ্ধার্থ ওর কারখানাটা বানিয়েছে ভালো—।'

মায়া আমার আগে-আগে নীচে নামতে শুরু করেছিল। বলল, 'হ্যাঁ, এখানকার অনেকেই ওকে টিভি সারাতে ডাকে।'

যে-ছ'টা খুনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর তারিখ, সময়, সবই আমার জানা আছে। নানা খবরের কাগজে সে-বিষয়ে যেসব রিপোর্ট বেরিয়েছে সেগুলোও অফিসে আমার নিজস্ব একটা ফাইলে রয়েছে। কিন্তু ওই খুনগুলোর সময় সিদ্ধার্থ কোথায়-কোথায় ছিল সেটা কি এখন খুঁজে বের করা সম্ভব, নাকি প্রমাণ করা যাবে!

এটুকু বুঝতে পারছিলাম, খুব ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে এগোতে হবে। পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে আমাকে শতকরা একশো ভাগ নিঃসন্দেহ হতে হবে।

নীচে নেমে মায়া জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, এখন খাবি?'

আমি দেওয়ালে টাঙানো একটা ঘড়ি দেখে বললাম, 'সবে তো ন'টা বাজে। দশটায় ডাকিস—।'

মায়া বলল, 'তাহলে টনি আর কাজলকে খেতে দিয়ে দিই। তারপর পারলে হাতের সেলাইটা একটু এগিয়ে নেব।'

মায়া শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। আমিও ঢুকে পড়লাম আমার জন্যে বরাদ্দ ঘরে। তারপর স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ভেঙে ফেললাম কার্মোজাইমের শিশির সিলটা। দু-চামচ ওষুধ খেয়ে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। কাল স্ক্রু-ড্রাইভারটা রেখে আসার অজুহাতে সিদ্ধার্থর 'কারখানা'য় আর-একদফা তল্লাশি চালানো যাবে।

যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে পুলিশে যেতেই হয়, তাহলে দেখতে হবে সিদ্ধার্থকে অ্যারেস্ট করার সময়ে কিংবা কোর্টকাছারি হওয়ার সময়ে কোনওভাবেই যেন আমার নামটা ফাঁস না হয়। আমি চাই না মায়া একটা খুন-পাগল লোককে নিয়ে ঘর করুক। আবার এও চাই না, এই ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে ওর সমস্ত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাক। সিদ্ধার্থ সত্যি-সত্যি যদি দোষীও হয়, আমি জানি, মায়া কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

সিদ্ধার্থ ফিরছে সামনের সোমবার। ফলে হাতে এখনও দিন-সাতেক সময় রয়েছে।

রাতে খাওয়ার সময় মায়াকে জিগ্যেস করলাম, টিভি-ভি. সি. আর. এসব সারাতে সিদ্ধার্থ কোথায়-কোথায় সাধারণত যায়।

মায়া যেসব জায়গার নাম বলল, তার মধ্যে অরবিন্দ সরণি, মানিকতলা, শ্যামবাজার, মুরারিপুকুর ইত্যাদি রয়েছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কবে কোন বাড়িতে ও রিপেয়ারিং-এর কাজ করতে যায় তার কোনও রেকর্ড আছে?'

মায়া খেতে-খেতেই ভুরু কুঁচকে তাকাল 'কী ব্যাপার, বল্‌তো, তুই যে হঠাৎ গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন শুরু করলি!'

আমি অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না, সেরকম কিছু না।' তারপর হেসে বললাম, 'আসলে ভাবছিলাম, এসব রিপেয়ারের কাজ থেকে সিদ্ধার্থ বোধহয় অনেক টাকা বাড়তি রোজগার করে। তোর কী মজা বল।'

মায়া এবার সহজ হয়ে হাসল। বলল, 'না রে, সেরকম খুব একটা হয় না। এই সাত-আটশো বড়জোর। তা ছাড়া, ও তো খুব গোছানো স্বভাবের নয়। কবে কোথায় কাজ করে কিছুই লিখে রাখে না। অনেকে এই সুযোগে "পরে বাকি টাকা দেব" বলে টাকা মেরে দেয়। ও আবার টাকার জন্যে তাগাদা করতে পারে না—লজ্জা পায়। মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে আমাকে বলে, "সহধর্মিণী, তুমি মাইরি আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে টাকা আদায়ের কাজে লেগে পড়ো—।" তাহলেই বোঝ!'

বাকি কথাবার্তায় নতুন কিছুই আর জানা গেল না।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে লেবুর শরবত করতে গেলাম রান্নাঘরে। মিসেস কাপুরকে আজ দেখতে পেলাম না। হয়তো এখনও ফেরেননি, কিংবা আগেই ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কারণ, ঘরটা অন্ধকার।

একটু যে হতাশ হলাম সেটা মিথ্যে নয়।

রাতে বিছানায় শুয়ে এলোমেলো চিন্তা করতে লাগলাম। নিজের বোনের ঘর ভাঙব? নাকি আয়রনম্যানের হাত থেকে আরও কয়েকটা অসহায় তরুণীর প্রাণ বাঁচাব? আমার সন্দেহের সপক্ষে এখনও তো নিশ্চিত কোনও প্রমাণ পাইনি! সবটাই সন্দেহ। কিন্তু সিদ্ধার্থ দুটো শায়া আর চারটে ব্রা ওর চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়েই বা রেখেছে কেন?

পরদিন অফিসে গিয়ে প্রথমেই আমার দেরাজ থেকে আয়রনম্যানের ফাইলটা বের করলাম। প্রথম থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কোনও-কোনও জায়গায় দরকার মতো লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিলাম। চেষ্টা করলাম, আয়রনম্যানের চরিত্রের একটা আদল খুঁজে পেতে। লোকটার কোনও-কোনও আচরণ কি সিদ্ধার্থর সঙ্গে মেলে?

মনস্তত্ত্ব আমার লাইন নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে মায়ার সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ মনে হচ্ছিল, আমার সন্দেহ-সংশয়ের উত্তর রয়েছে সিদ্ধার্থর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপরে।

এইসব ভাবতে-ভাবতে হঠাৎই ডক্টর রায়চৌধুরির কথা মনে পড়ল। খুব নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট। আমার তেমন চেনা নয়, তবে আমাদের সুবিনয় ভালো চেনে। সুবিনয় মেডিকেল ব্যাপার-ট্যাপার কভার করে। তার মধ্যে ছ'টা হাসপাতালও রয়েছে।

সুবিনয় ওর ডেস্কে বসে কী একটা রিপোর্ট লিখছিল। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'এই যে, একটু হেল্প করতে হবে।'

ও মাথা তুলে বলল, 'ও উষা, বলো কী করতে হবে—।'

সুবিনয় খুব সিগারেট খায়, গাল ভাঙা, গায়ের রং কালো, কপালে অনেক ভাঁজ। বয়েস পেরিয়েছে। তবে চোখ দুটো খুব বুদ্ধিদীপ্ত, কাছে টানে। ও পি. টি. উষা বললে আমার রাগ হয় না। অফিসে ও একাই আমাকে সরাসরি উষা বলে ডাকে।

আমি বললাম, 'ডক্টর রায়চৌধুরির সঙ্গে একটু ইনট্রো করিয়ে দাও—।'

সুবিনয় কপাল কোঁচকাল, ধোঁয়া ছাড়ল কয়েকবার। বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো!'

আমি হেসে বললাম, 'তেমন কিছু না। শুধু সাইকোলজির ব্যাপারে একটু জ্ঞান নেব।'

'আয়রনম্যানের ব্যাপারে?'

সুবিনয়কে বোধহয় বলা যায়। তাই বললাম, 'হ্যাঁ—।'

ও চোখ নাচাল 'কোনও নতুন ক্লু নাকি?'

আমি হাসলাম, মুখের কাছে হাত নেড়ে ধোঁয়া তাড়ালাম, বললাম, 'সরি, এখনও ভাঙতে পারছি না।'

সুবিনয় কিছু মনে করল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। বলল, 'এসো, ফোনে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

মিনিট-দশেকের মধ্যেই সুবিনয়ের কাজ শেষ। বুধবার রাত ন'টায় বাড়িতে ডক্টর রায়চৌধুরি আমাকে সময় দিলেন।

টেলিফোনে ভদ্রলোকের গলা বেশ গম্ভীর শোনাল।

সুবিনয়কে সে-কথা বলতেই ও হেসে বলল, 'উষা, খবরের কাগজের চাকরি মানে পরের হাঁড়ি হাটে ভেঙে পয়সা রোজগার করা। কিন্তু সব হাঁড়ি তো আমরা হাটে ভাঙি না, হাতে রেখে দিই। তাতে অনেক কাজ হয়। যেমন, ডক্টর রায়চৌধুরি ইন্ডিয়ান মেডিকেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের পোস্ট ছেড়ে দিয়েছেন কেন জানো?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। না, জানি না।

সুবিনয় নতুন সিগারেট ধরাল। বলল, 'কেউই জানে না, আমি ছাড়া। এই হাঁড়িটা আমি হাটে ভাঙিনি, হাতে রেখেছি। সুতরাং, তোমার কোনও ভয় নেই। "দিনবাণী"র সুবিনয় চাট্যুজ্যে কাউকে পাঠালে রায়চৌধুরির বাবাও তার সঙ্গে দেখা করবে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী হাঁড়ির খবর, শুনি—।'

এবারে সুবিনয় চাট্যুজ্যের হাসির পালা। ও বলল, 'সরি, এখনও ভাঙতে পারছি না—।'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিকই, ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়।'

তারপর ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ফিরে এলাম আমার ডেস্কে। কাগজের কাটিংগুলো দেখে-দেখে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে নিলাম নোটপ্যাডে। কাল রাত ন'টায় ডক্টর রায়চৌধুরির কাছে যখন যাব, তখন এই বিষয়গুলো আমাকে জানতে হবে।

ডক্টর চিরঞ্জিত রায়চৌধুরির বাড়িটা লর্ড সিনহা রোডে। রাত ন'টায় রাস্তাটা এতই নির্জন যে, গা ছমছম করে। মনে হয় এই বুঝি পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

দু-পাশে যে-ক'টা বাড়ি দেখছি তাদের পাঁচিল-ঘেরা এলাকার ওপিঠে বড়-বড় গাছ— অনেকটা বাগানবাড়ি ধরনের।

ডক্টর রায়চৌধুরির বাড়িটাও তাই। বিশাল লোহার দরজা। দু-পাশে থাম। তার গায়ে পাথরের ফলক। ফলকে স্পষ্ট ইংরেজি হরফে নাম ও হাতখানেক লম্বা ডিগ্রি লেখা।

দারোয়ানকে বলতেই সে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে গেল।

আমি বাড়িটা দেখে আঁচ করতে চাইছিলাম, ডক্টর রায়চৌধুরি মানুষটা কীরকম হবে। বড়লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আচরণ?

মিনিট-দুয়েকের মধ্যেই ডাক এল। তারপর সোজা ভেতরে ডক্টর রায়চৌধুরির ড্রইংরুমের সোফায়।

মানুষটির বয়েস ষাটের কাছাকাছি হবে। চেহারা লম্বা, রোগা, গায়ের রং শ্যামলা।

চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। ঠোঁটে সবসময়েই একটা অহংকারী হাসির রেখা। তবে চোখ দুটো তীব্র ও মমতা মাখানো।

ছিমছামভাবে সাজানো ঘরে দুটো পেইন্টিং আর একটা ফুটচারেক লম্বা অল-গ্লাস অ্যাকোয়ারিয়াম। তাতে লাল, কালো, রুপোলি মাছ সাঁতার কাটছে।

ডক্টর রায়চৌধুরি গম্ভীর স্বরে কথা শুরু করলেন, 'আপনি সুবিনয়বাবুর কোলিগ?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'বলুন কী খাবেন। চা না কফি?'

আমি হেসে বললাম, 'ওসবের জন্যে ব্যস্ত হবেন না। এদিকটা বেশ নির্জন। আমি চটপট কথা সেরেই চলে যাব।'

ডক্টর রায়চৌধুরি হাসলেন শব্দ করে। বললেন, 'কী করব বলুন, রাতে ছাড়া আমার সময় হয় না।'

আমি জানালাম, 'মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল—।'

'পার্সোনাল?'

হেসে জানালাম, অন্তত এখনও সে-অবস্থা হয়নি। আমার প্রশ্নগুলো আয়রনম্যানের বিষয়ে। কারণ, আমাদের কাগজে এই ব্যাপারটা আমিই রিপোর্ট করছি।

ডক্টর রায়চৌধুরির মুখ গম্ভীর হল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কী ভেবে তারপর বললেন, 'বলুন, কী জানতে চান।'

'ধরুন বিয়ে-থা করা একটা সংসারী লোক। বউকে বাচ্চাকে দিব্যি ভালোবাসে। এরকম একটা লোক কি আয়রনম্যান হতে পারে?'

মাথার চুলে হাত চালালেন রায়চৌধুরি। সামনের টেবিলে রাখা ক্ল্যাসিক সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধারালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'খুব পারে। এরকম বহু নজির আছে আমাদের লাইনে। এমনিতে হয়তো খুব স্বাভাবিক মানুষ, বিয়ে-থা করে সুখী, কিন্তু ডেঞ্জারাস সেক্স ক্রিমিনাল। আপনাদের কাগজে, আর অন্যান্য সব নিউজ-পেপারেও আয়রনম্যানের ব্যাপারটা খুব ডিটেইল্‌সে দিয়েছে। পড়ে আমার মনে হয়েছে—।'

গলার স্বর নেমে গেল তাঁর। কিছুক্ষণ মগ্ন, চুপচাপ। তারপর: '—যে, লোকটা সংসারে একা। তবে আপনি যেরকম বলছেন সেরকম হওয়াটাও একেবারে অসম্ভব নয়।'

'আমি একটা লোককে আয়রনম্যান বলে সন্দেহ করছি।' একটু থেমে আবার বললাম, 'আপনি বোধহয় জানেন, লোকটা ভিকটিমদের শায়া-টায়া এইসব চুরি করেছে। মানে পুলিশ তাই বলেছে। তা লোকটা কি এইসব জিনিস নিজের কাছে রেখে দিচ্ছে? মানে...' বারবার কেন যে হোঁচট খাচ্ছি আমি! মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে জোর এনে বললাম, 'ধরুন, লোকটা শায়া-ব্রা এইসব নিজের কাছে জমিয়ে রাখে। এর কোনও এক্সপ্ল্যানেশান দিতে

পারেন?'

ডক্টর রায়চৌধুরি ধোঁয়া ছাড়লেন কয়েকবার। তারপর বললেন, 'আমি সাইকিয়াট্রিস্ট, জ্যোতিষী নই, মিস রায়। যদি আপনি আন্দাজে ঢিল ছুড়তে বলেন তাহলে চেষ্টা করতে পারি। যেমন, লোকটা হয়তো ওইসব আন্ডারগারমেন্টসকে ভিকট্রি সিম্বল বলে ভাবে। সে যে লড়াইয়ে জিতেছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিংবা বেচারার হয়তো মহিলাদের অন্তর্বাস জমানোর হবি আছে। ফ্রয়েডসাহেব তো এ-বিষয়ে অনেক কিছু বলে গেছেন—।'

আমি যে তাঁর কথার মাঝখানেই উসখুস করতে শুরু করেছি সেটা ডক্টর রায়চৌধুরি হয়তো খেয়াল করে থাকবেন। তাই হঠাৎই খুব অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'মিস রায়, আমার মনে হয়, আপনি কোনও প্রবলেমে পড়েছেন। আপনি তো জানেন, আমাদের প্রফেশনে কথা গোপন রাখাটাই বড় কথা। সুতরাং, আপনি মন খুলে আমাকে সবকিছু বলতে পারেন। তাহলে এই বুড়ো লোকটা—' নিজের বুকে আঙুল ঠুকলেন তিনি 'হয়তো তোমাকে দু-একটা উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো—।'

আমার কী যে হল, হঠাৎই চোখের কোণ ভিজে গেল। গলা ধরে এল যেন। বুকে কেমন একটা কষ্ট। আমি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখে দিলাম। ঝাপসা নজরে আড়চোখে দেখলাম পাকা-চুল মানুষটা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে।

আমি আর পারলাম না। ডক্টর রায়চৌধুরিকে সব খুলে বললাম। আমার অবস্থাটা উনি বোধহয় বুঝতে পারবেন।

সব শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'বলো, তোমাকে কীভাবে আমি সাহায্য করতে পারি—।'

লক্ষ করেছিলাম, আমার মুখে গোটা গল্পটা শুনতে-শুনতে তিনি এতটুকু অবাক হননি। মনস্তত্ত্বের রহস্যে-ঘেরা জগতে যাঁদের নিত্য চলাফেরা তাঁরা বোধহয় সহজে অবাক হন না।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'সিদ্ধার্থর কেস হিস্ট্রিটা আপনি একবার খতিয়ে দেখুন। "মন নিকেতন"-এ নিশ্চয়ই আপনার জানা-চেনা আছে। ওর মানসিক রোগের ব্যাপারে আমি আপনার মতামত চাই।'

ডক্টর রায়চৌধুরি অভয় দিয়ে হাসলেন। বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই। তুমি শুধু একটা দিন সময় দাও আমাকে। পরশু সকালে, ন'টা নাগাদ, আমার চেম্বারে দেখা কোরো, সব রিপোর্ট পেয়ে যাবে। এই নাও আমার কার্ড, এতে ঠিকানা ফোন-নাম্বার সব আছে।'

আমি হাত বাড়িয়ে ওঁর দেওয়া কার্ডটা নিলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার হাত কাঁপছিল। সিদ্ধার্থর কেস হিস্ট্রি থেকে ডক্টর রায়চৌধুরি কি নতুন কোনও তথ্য

আবিষ্কার করতে পারেন? তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে....।

মায়ার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছিল। ওকে আমি ভালোবাসি, টনিকেও। তাই বিপদ থেকে ওদের বাঁচাতে চাইছি। ওরা তো জানে না, ওরা আগ্নেয়গিরির ওপরে নিশ্চিন্তে বসে আছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ন'টায় ডক্টর রায়চৌধুরির চেম্বারে গেলাম।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে একটা পুরোনো বাড়ির দোতলায় ওঁর চেম্বার। বাড়ির বাইরেটা যতটা পুরোনো ভেতরটা ততটা নয়। চেম্বার সাজানোর মধ্যেও রুচির ছাপ রয়েছে। চেম্বারের বাইরের ঘরে দুজন লোক বসে ছিল। বোধহয় পেশেন্ট। বেয়ারাগোছের একজনের হাতে স্লিপ দিতেই ডাক এল আমার। সুতরাং দুরুদুরু বুকে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

চিরঞ্জিত রায়চৌধুরি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে 'এসো, এসো, বোসো।'

আমি সঙ্কুচিতভাবে বসলাম।

উনি বোধহয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন, 'বুঝলে, সম্পর্কের চেয়ে একটা মানুষের প্রাণের দাম অনেক বেশি। তুমি কোনও অন্যায় করছ না। তবে এটা মনে রাখবে, কোনও ইনোসেন্ট লোক যেন শাস্তি না পায়—।'

আমার বুকের ভেতরে আবার একটা দম-আটকানো ভাব মাথাচাড়া দিল।

রায়চৌধুরি চশমা খুলে রাখলেন টেবিলে, বললেন, 'তোমার ভগ্নীপতির কেস হিস্ট্রি বেশ ইন্টারেস্টিং। তুমি জানো, সিদ্ধার্থর বাবা ওর মাকে খুন করেছিল—তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছে?'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা তো কখনও মায়ার কাছে শুনিনি! বললাম, 'না জানি না—এই প্রথম শুনলাম। আমার বোন কখনও বলেনি। অবশ্য ও নাও জানতে পারে—।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি জিগ্যেস করলাম, 'এটা কবেকার ঘটনা?'

চশমা আবার চোখে দিলেন ডক্টর রায়চৌধুরি। তারপর থেমে-থেমে বললেন, 'সিদ্ধার্থর তখন মাত্র বারো বছর বয়েস। ওরা তালতলায় থাকত। "মন নিকেতন"-এ ডক্টর পাল ওর কেসের চার্জে ছিলেন। ওঁর কাছেই শুনলাম, সিদ্ধার্থ বলেছে, ওর মা নাকি উচিত শাস্তিই পেয়েছে। সিদ্ধার্থ বাবাকে যেমন ভালোবাসত, ঠিক তেমনই ঘেন্না করত ওর মাকে। ওর কথা অনুযায়ী...।'

টেবিলে রাখা একটা ভাঁজ-করা কাগজ তুলে নিলেন তিনি। সেটা খুলে কী পড়লেন। তারপর কথার খেই ধরে বললেন, 'ওর মা ছিল খুব সুন্দরী, কিন্তু আনফেইথফুল। লুকিয়ে আর-পাঁচটা লোকের সঙ্গে ইয়ে, মানে—ডোন্ট মাইন্ড—নানাজনের সঙ্গে বাজে রিলেশান

ছিল ওর মায়ের। সিদ্ধার্থ সবই জানত, কিন্তু মায়ের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে চুপ করে থাকত। দু-একবার মায়ের কথার অবাধ্য হয়ে সাঙ্ঘাতিক মারও খেয়েছে। সুতরাং, সিদ্ধার্থ একরকম আতঙ্কে চুপ করে থাকত। তারপর একদিন...।'

আবার সেই কাগজটা দেখলেন তিনি। আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল।

'—একদিন ওর বাবা সরাসরি দেখে ফ্যালে ওর মায়ের কেলেঙ্কারি। সিদ্ধার্থ জানত সেদিন বাবা কখন ফিরবে। কিন্তু মাকে ইচ্ছে করেই সেটা বলেনি। ব্যস। ওর বাবার বোধহয় মাথা গরম ছিল। গলা টিপে বউকে খতম করে নিজে ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। সে এক বীভৎস ব্যাপার।'

'এর জন্যে কি সিদ্ধার্থর মনে অপরাধবোধ—মানে, একটা গিল্ট কমপ্লেক্স তৈরি হয়?'

কাগজটা ভাঁজ করে আবার টেবিলে রেখে দিলেন তিনি। হেসে বললেন, 'তোমাদের রিপোর্টারদের নিয়ে এই এক ঝামেলা। সবসময়েই থ্রিলিং এক্সপ্ল্যানেশান খোঁজো। না, না, ডক্টর পাল পরিষ্কার বলেছেন, সিদ্ধার্থর কোনওরকম গিল্ট কমপ্লেক্স ছিল না। আর মনের গোলমাল থাকলেই যে গিল্ট কমপ্লেক্স থাকতে হবে তাই-বা কে বলেছে! এটা ঠিক যে, বাবা মারা যাওয়ায় সিদ্ধার্থ খুবই দুঃখ পেয়েছিল। সবসময়েই বাবার মৃত্যুর জন্যে ওর মাকে ও দায়ী করেছে। আর মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারে ওর যে ইনডায়রেক্ট হাত ছিল তার জন্যে ওর গর্ব হয়। ও ভাবে যে, পাপের জঞ্জাল অন্তত কিছুটা ও সাফ করতে পেরেছে।'

আমি কী বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোনওরকমে বললাম, 'গিল্ট কমপ্লেক্স যদি না হয়, তাহলে কী?'

মাথার চুলে হাত চালালেন ডক্টর রায়চৌধুরি। সকালের রোদ জানলা দিয়ে তেরছাভাবে এসে পড়েছে টেবিলে। রোদের বর্শায় ধুলোর সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু উড়ছে। সেদিকে একবার দেখে গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'এইসব ব্যাপার কখনওই খুব সহজ-সরল হয় না। সিদ্ধার্থর মনের ভেতরে হয়তো হাজার রকম জটিল মারপ্যাঁচ রয়েছে। তবে একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব স্পষ্ট মনে হচ্ছে : সুন্দরী মহিলাদের ও এতটুকু বিশ্বাস করে না। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তাহলে তোমার বোন বোধহয় তেমন সুন্দরী নয়—।'

আমি কোলের ওপরে রাখা হাতব্যাগের দিকে একবার তাকালাম। তারপর মুখ তুলে বললাম, 'ঠিকই ধরেছেন। মায়া একেবারে সাদামাঠা দেখতে—আমারই মতন।'

'হ্যাঁ, হয়তো সেইজন্যেই সিদ্ধার্থ মায়াকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। ওর বিশ্বাস, মায়া ওকে কখনও ঠকাবে না।'

'তার মানে সুন্দরী মেয়েদের ও ঘেন্না করে? যখনই ও কোনও সুন্দরী বিবাহিতা মেয়েকে মাথা থেঁতলে দিয়ে খুন করে, তখনই ও মনে-মনে ধরে নেয় যে ও...।'

'ওর মাকে উচিত শাস্তি দিচ্ছে। দুনিয়া থেকে পাপের জঞ্জাল সাফ করছে।' আমার

মুখের কথা একরকম কেড়ে নিয়েই ডক্টর রায়চৌধুরি বললেন।

আমার মুখে বোধহয় সামান্য একটু আশা-প্রত্যাশা ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করেই তিনি বললেন, 'শোনো, আমি যা বলছি, তার সবই প্রায় থিয়োরিটিক্যাল। সিদ্ধার্থর সঙ্গে দিনসাতেক সিটিং দিতে পারলে হয়তো আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম। এখন যা বলছি তার অনেকটাই যেন পরের মুখে ঝাল খাওয়া। তোমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়...মানে, সিদ্ধার্থই যদি আয়রনম্যান হয়, তাহলে আমি হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করে ওর কাছ থেকে খুনের মোটিভও বের করে ফেলতে পারব—।'

আমি আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হতেই ডক্টর রায়চৌধুরির কথা শুনতে পেলাম। উনি তখন বলছিলেন, '...একটা কথা মোটামুটি শিয়োর হয়ে বলা যায়। যদি খুন হওয়া মেয়েগুলোকে ও ওর মায়ের বদলি ভেবেই খুন করে থাকে, তাহলে মেয়েগুলো শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না, ওদের চরিত্রও খারাপ হওয়া জরুরি—ওর মায়ের মতো।'

আমি বললাম, 'হতে পারে। কারণ ছ'টা মেয়েই ম্যারেড ছিল।'

চশমার কাচ মুছে রায়চৌধুরি ধীরে-ধীরে বললেন, 'তা যদি হয়ও তাহলে সিদ্ধার্থ সেটা কী করে জানবে? কারণ, যতদূর জানি, খুন হওয়া মেয়েগুলোর মধ্যে কোনও কানেকশান ছিল না। সুতরাং, ছ'-ছ'টা বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে সিদ্ধার্থর আলাপ হবে, এমন ঘনিষ্ঠতা হবে যে ও জেনে ফেলবে ওরা আনফেইথফুল—এটা ইম্‌পসিব্‌ল—একেবারে গল্পের মতো শোনাচ্ছে—।'

আমার মাথায় পর-পর যেন বাজ পড়ল কয়েকটা। চোখের সামনে নেচে উঠল সরষে ফুলের ঝাঁক। উত্তেজিতভাবে বলে উঠলাম, 'গল্প হবে কেন? ও তো বাড়ি-বাড়ি টিভি, ভি. সি. আর., এসব সারানোর কাজ করে।'

ভুরু কুঁচকে গেল ডক্টর রায়চৌধুরির। জিগ্যেস করলেন, 'তার মানে?'

আমি তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম।

'সিদ্ধার্থ চাকরি ছাড়াও এসব রিপেয়ারের কাজ করে। সন্ধেবেলা বা রাত্রিবেলা ও এসব সারাতে-টারাতে যায়। তখন হয়তো এইসব মহিলাদের চরিত্রের ব্যাপার ও জেনে থাকবে। ওর যা চেহারা! যেন শ্বেতপাথরে খোদাই করা ডেভিডের মূর্তি। ইচ্ছে করলে ও সিনেমাতেও নামতে পারত। ওকে একা পেয়ে কোনও মেয়ে নষ্টামি করতেও পারে।'

ঠোঁট ওলটালেন ডাক্তারবাবু। কাঁধ নাচালেন ছোট করে। বললেন, 'তাহলে তখনই তো ও সেই মেয়েটিকে খতম করতে পারত।'

আমি যেন ক্রমেই সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে ওকালতি করতে শুরু করেছি। চট করে জবাব দিলাম, 'তখন হয়তো সুযোগ পায়নি। হয়তো বাড়িতে লোকজন ছিল, বাচ্চা-কাচ্চা ছিল। তা ছাড়া বাড়িতে ওর আসা-যাওয়া সবাই দেখে ফেলেছে। এমনও হতে পারে, ওইসব মেয়েদের ইশারায় ও সাড়া দিয়ে পরে একদিন রাতে দেখা করবে বলেছে। তখন রাস্তা

সাফ পেয়েছে। আর ব্যস, নিশ্চিন্তে কাজ হাসিল করেছে। মেয়েগুলো ওর অভিনয় ধরতে পারেনি।'

'ছ'-ছ'টা মেয়েই ওর সঙ্গে প্রেম করতে চেয়েছিল বলছ?'

প্রশ্নটায় সন্দেহের সুর ছিল। তাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, 'না, হয়তো কয়েকজনের বেলায় তাই। আর অন্যদের বেলায় সিদ্ধার্থ হয়তো অবৈধ প্রেমের কোনও ইন্ডিকেশান পেয়েছে।'

আবার তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ বুজে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে তিনি বললেন, 'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে সিটিং না দিয়ে আমি তোমাকে এর বেশি কিছু বলতে পারছি না।' একটু থেমে শান্ত গলায় বললেন, 'এবারে তুমি যা ভালো বোঝো করো—উইশ য়ু বেস্ট অফ লাক।'

আমি খুব দ্রুত ভেবে নিলাম। আর নয়, এবারে লালবাজারে যাওয়া উচিত।

ডক্টর রায়চৌধুরিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসছি, উনি পেছন থেকে আমাকে ডেকে বললেন, 'আই অলসো ফিল ফর য়ু।'

আমি ওঁর দিকে ফিরে মুখে এক চিলতে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম ওঁর চেম্বার ছেড়ে।

আয়রনম্যানের কেসটার দায়িত্বে রয়েছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর সরকার। সুতরাং, রায়চৌধুরির চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম লালবাজারে, সরকারের কাছে।

শক্তপোক্ত দশাসই চেহারা, এখনও বোধহয় ব্যায়াম-ট্যায়াম করে। কথা বলে জোরে-জোরে। বয়েস পঞ্চাশের এদিকেই। পুরুষ্টু গোঁফে পাক ধরেছে। মাথার চুলেও। শরীরের তুলনায় চোখ ছোট-ছোট। আর কথাবার্তায় কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব।

সরকারকে ওর সিটেই পেলাম। দু-তিনটে ফাইল খুলে কাগজপত্র ছড়িয়ে কী যেন করছে। মুখ তুলে আমাকে দেখে হাসল। বলল, 'বলুন, কী চাই? আয়রনম্যানের নতুন কোনও খবর নেই। আরও দু-চারটে লাশ না পড়লে ও শালা ধরা পড়বে না।'

আমি বসে কয়েক মিনিট দম নিলাম। ভাবলাম, বলব কি বলব না। টনির হাসিখুশি মুখটা মনে পড়ল, আর মায়ার সুখী মুখটাও। কিন্তু তারপরই আয়রনম্যানের ভয়ঙ্কর বিকৃত রক্তলোভী মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

চাপা গলায় বললাম, 'মিস্টার সরকার, আয়রনম্যানের কেসের ব্যাপারে একটা মোক্ষম ক্লু দিতে পারি।'

'তাই?' কাজ থামাল না সরকার। আমার দিকে একপলক দেখে আবার কাজে মন দিল।

বুঝলাম, আয়রনম্যানের ব্যাপারটা শুরু হওয়ার পর বহু লোক এসে এরকম বহু 'মোক্ষম' সূত্র জানিয়ে গেছে সরকারের কাছে।

আমি কিছুটা আহত হয়েছিলাম। তাই পরের কথাগুলো একটু জোর দিয়েই বললাম।

'মিস্টার সরকার, প্লিজ, আমি ঠাট্টা করছি না—।'

এবারে কাজ থামাল। হাত দিয়ে ঠেলে কাগজপত্র সরিয়ে দিল একপাশে। বলল, 'বলুন, কী ক্লু?'

আমাদের কাগজে লালবাজারের খবরাখবর যা ছাপা হয় সবই আমি লিখি। তাই এখানে যাতায়াতও বেশকয়েক বছরের। প্রথম-প্রথম মেয়ে বলে অস্বস্তি হত। পরে মনে হয়েছে, আমি নিজেকে যতটা মেয়ে বলে ভাবি, পুরুষরা বোধহয় ততটা নয়। অন্তত সরকারের কথাবার্তায় কখনও আমার মনে হয়নি, ও কোনও মহিলা-সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছে। তবে একটা ব্যাপার আছে। কেন জানি না, ও সবসময় আমাকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু আমি আজ নাছোড়বান্দা।

আমি বললাম, 'সব বলছি, কিন্তু—একটা কন্ডিশান আছে।'

সরকার হেসে হাত নাড়ল। বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কাগজ এক্সক্লুসিভ স্টোরি পাবে, কোনও চিন্তা নেই।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, তা না। এই ক্লু আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন কেউ যেন জানতে না পারে—।'

এমন সময় সরকারের সহযোগী ইন্সপেক্টর দাসচৌধুরি ঢুকে পড়ল ঘরে। আমাকে দেখে হাসল, বলল, 'কী, আয়রনম্যানের কেসের উওম্যান রিপোর্টার, কেমন আছেন?'

আমি বললাম, 'ভালো আর থাকতে দিলেন কোথায়! আয়রনম্যান ধরা পড়লে তবে শান্তি—।'

দাসচৌধুরি বলল, 'সে আর বলতে! পাবলিক আর মিনিস্টার ডেইলি আমাদের মুন্ডুপাত করছে।'

তারপর সে সরকারের সঙ্গে কয়েকটা কাজের কথা বলে চলে গেল।

সরকার আবার আমার দিকে মনোযোগ দিল। বলল, 'শর্ত মঞ্জুর। এবারে বলুন।'

আমি বললাম, 'আরও একটা ব্যাপার আছে। এই কেসের কোনও ব্যাপারে আমার নাম যেন না ওঠে। আমি একেবারে আড়ালে থাকতে চাই—।'

সরকারের চোখ-মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। বলল, 'সেটা কি সম্ভব? কেসে আপনার এভিডেন্স লাগতে পারে—।'

আমি বললাম, 'লাগবে না। ধরে নিন না আমি একজন ইনফরমার—।'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা। তারপর 'ঠিক আছে। আয়রনম্যানকে গারদে ভরতে পারলে আমি আর কিছু চাই না। এবারে বলুন—।'

আমি বুঝতে পারছিলাম, সরকার ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কারণটা

খুব সহজ। আয়রনম্যান ধরা পড়লে তার নাম হবে, প্রোমোশান হবে, খবরের কাগজেও ছাপা হবে ওর কৃতিত্বের কথা।

আমি গোটা গল্পটা ওকে খুলে বললাম। ডক্টর রায়চৌধুরির কথাও বাদ দিলাম না।

আমার কথার ভিত্তিতে ইন্সপেক্টর সরকার মৃত মহিলাদের ছ'জন স্বামীকেই আবার জিজ্ঞাসাবাদ করল। তাদের তিনজন বলল যে, টিভি সারানোর লোক তাদের বাড়িতে এসেছিল। তবে কপাল খারাপ, দু-ক্ষেত্রেই তাদের বউরা টিভি সারানোর ব্যবস্থা করেছিল। মিস্ত্রি যখন এসেছিল তখন স্বামীরা বাইরে ছিল। ফলে কে কোথা থেকে এসেছিল তারা জানে না। অন্য দুজন স্বামী জানাল যে, তারা জানেই না বাড়িতে কোনও টিভি সারানোর লোককে ডাকা হয়েছিল। তাদের স্ত্রীরা যখন মারা যায় তখন তারা কলকাতার বাইরে ছিল। তবে হতে পারে যে, তাদের বউরা টিভি সারানোর ব্যাপারটা জানাতে ভুলে গিয়েছিল। ষষ্ঠজন জানাল, টিভি সারানোর লোকটিকে সে দেখেছে এবং আবার দেখলে মনে হয় চিনতে পারবে। সিদ্ধার্থর একটা ফটো জোগাড় করে তাকে দেখাতেই সে ওকে শনাক্ত করতে পারল। তখন সন্দেহভাজন হিসেবে সিদ্ধার্থকে গ্রেপ্তার করা হল।

কিন্তু সিদ্ধার্থ কলকাতায় ফেরার আগেই ইন্সপেক্টর সরকার কয়েকটা কাজ সেরে নিয়েছিল।

শুক্রবার একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে সরকার হাজির হল মায়ার বাড়িতে। প্রতিশ্রুতিমতো আমাকে আড়ালও করল। হতচকিত মায়াকে সরকার বলল, 'কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম। আর ভয় পাওয়ার তেমন কোনও ব্যাপারও নয়। আসলে আয়রনম্যানের হাতে খুন হওয়া একটা মেয়ের বাড়িতে আপনার স্বামী টিভি সারাতে গিয়েছিলেন। হয়তো অন্যদের বাড়িতেও গিয়ে থাকবেন। সেইজন্যেই পুলিশ আপনার স্বামীর টিভি সারানোর যন্ত্রপাতিগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখতে চায়।'

মায়ার রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। তা ছাড়া আমি ওকে ভরসা দিলাম। ও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ও কী করে বুঝবে, এই সার্চ ওয়ারেন্টের মূলে আমি!

ছোট আলমারি ও তার ভেতরের প্লাস্টিকের বাক্সটা পাওয়া গেল জায়গামতোই। তবে সিদ্ধার্থ আর পাঁচজনের বাড়িতে টিভি সারাতে গিয়েছিল কি না তার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না।

ছাদের ঘর থেকে কয়েকটা বড় রেঞ্চ আর হাতুড়ি নিয়ে নিল সরকার। বলল যে, ওগুলো ফোরেনসিক পরীক্ষা করে দেখা হবে।

শায়া আর ব্রেসিয়ারগুলো দেখে মায়া প্রথমে অবাক হয়ে গেলেও খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। স্পষ্ট গলায় বলল, 'এগুলো আমার—।'

কিন্তু সরকার ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, 'হতে পারে আপনার, কিন্তু আপাতত এগুলো আমরা নিয়ে যাব। যদি সত্যিই আপনার হয় তাহলে পরে ফেরত পাবেন।'

এরপর সিদ্ধার্থ দিল্লি থেকে ফেরামাত্রই হাওড়া স্টেশন থেকে ওকে গ্রেপ্তার করা

হল।

মায়া একেবারে ভেঙে পড়ল। আমি ভাবলাম, ওর আবার নার্ভাস ব্রেকডাউন না হয়ে যায়। ওকে আর টনিকে একা রাখা যায় না। তাই আমি ওর কাছেই থেকে গেলাম। খবর পেয়ে অলকও চলে এল। একদিন থেকে পরদিন ফিরে গেল বাড়িতে। বলে গেল, 'তোরা ভাবিস না, আমি অফিস থেকে ফেরার পথে রোজ একবার করে আসব।'

তার পরদিন নিউজ এডিটরকে বলে আমি আয়রনম্যানের ব্যাপার থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিতে চাইলাম। আমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে আর্জি মঞ্জুর হল। তবে ভেতরে-ভেতরে মারাত্মক কৌতূহল আমাকে খোঁচা মারছিল। তাই গোপনে ইন্সপেক্টর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললাম।

সিদ্ধার্থই যে আয়রনম্যান সে-বিষয়ে সরকারের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কেসটা সাজাতে গেলে গোলমাল ধরা পরছিল বহু জায়গায়। যেমন, সিদ্ধার্থ যে ছ'জনের বাড়িতেই টিভি সারাতে গেছে তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি—যদিও একটা বাড়ির কথা সিদ্ধার্থ প্রাথমিক জেরাতেই স্বীকার করেছে। সরকারের ধারণা, সিদ্ধার্থ খুব চালাক। যখন সে জানে যে, তাকে কেউ শনাক্ত করে ফেলতে পারে, তখন আগেভাগেই সত্যি কথা বলে দিয়েছে। কোনওরকম ঝুঁকি নেয়নি।

অবশ্য এটা ঠিক, আদালতে এ-ব্যাপারটা প্রমাণ করা অসম্ভব। তা ছাড়া ছ'টা খুনই যে নিশ্চিতভাবে আয়রনম্যানের কাজ, এটাও প্রমাণ করা বেশ শক্ত। সুতরাং, দ্বিতীয় যদি কোনও খুনি থাকে, তাহলে এমনও হতে পারে, সিদ্ধার্থ হয়তো নিজের খেয়ালেই ওইসব শায়া আর ব্রেসিয়ার জোগাড় করেছে, কিন্তু কাউকে খুন করেনি।

খুনের রাতে কিংবা সন্ধ্যায় সিদ্ধার্থর অ্যালিবাই আছে কি না সেটাও ইন্সপেক্টর সরকার খতিয়ে দেখছে। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, এর নিষ্পত্তি করা সহজ নয়। সিদ্ধার্থ যেমন নিজের অ্যালিবাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারবে না, তেমনই পুলিশও বোধহয় প্রমাণ করতে পারবে না সিদ্ধার্থ ছ'-ছ'টা অকুস্থলেই খুনের সময়ে হাজির ছিল।

এতসব গোলমাল থাকা সত্ত্বেও ইন্সপেক্টর সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কেস দাঁড় করানো যাবে। বিশেষ করে এই অ্যাসিড, তালা, ছিটকিনি বা হুড়কো খোলার যন্ত্রপাতি—আসামি পক্ষের উকিল এসবের তেমন কোনও জুতসই ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। তা ছাড়া সিদ্ধার্থর বাড়িতে দ্বিতীয়বার তল্লাশি চালিয়ে ওর পোশাকের আলমারিতে একপ্রস্থ কালো পোশাক পাওয়া গেছে। যে-ভদ্রমহিলা মাঝরাতে পেছন থেকে আয়রনম্যানকে দেখেছিলেন তাঁকে ডাকা হল টি. আই. প্যারেডে। বেশ কয়েকজন লোককে কালো পোশাক পরিয়ে আবছা আলোয় হেঁটে যেতে বলা হল। যে-ক'জনকে ভদ্রমহিলা সন্দেহভাজন বলে বেছে নিলেন তার মধ্যে সিদ্ধার্থও ছিল। তা ছাড়া ওর মাথা গোলমালের কেস হিস্ট্রি থেকেও খানিকটা জোর পাওয়া যাবে।

সিদ্ধার্থ অ্যারেস্ট হওয়ার পর থেকে আমি মায়ার সামনে কখনও আয়রনম্যানের

প্রসঙ্গ তুলিনি। বরং ও-ই সমানে উত্তেজিত হয়ে পুলিশ আর কাগজওয়ালাদের নামে সবসময় অভিযোগ করে গেছে। মায়া পুলিশকে যে-স্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে বেশ জোর দিয়েই বলেছে, আয়রনম্যানের খুনের দিনগুলোয় সিদ্ধার্থ ওর কাছে বাড়িতে ছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটা দিন ছিল টনির জন্মদিনের পরের দিন। কাজল সেদিনটার কথা মনে রেখেছিল। ও বলেছে, সেদিন সিদ্ধার্থ সন্ধেবেলা বাড়ি ছিল না। বাড়ি ফিরেছে রাত এগোরোটায়। ব্যস, এই ব্যাপারটাই মায়ার বক্তব্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে।

প্রথমটা ভেঙে পড়লেও তিন-চারদিনের মধ্যেই মায়া বেশ সামলে উঠল। তারপর আমার সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ না করেই কলকাতার খুব নামী ক্রিমিনাল লইয়ার যতীন বসু রায়কে সিদ্ধার্থর কেসের দায়িত্ব দিল। তবে তাঁর সঙ্গে পরে যতবারই ও দেখা করতে গেছে, ততবারই আমি সঙ্গে গেছি। মায়া আর আপত্তি করেনি।

প্রথম-প্রথম মায়া আমাকে খুব ভালো চোখে নেয়নি। হয়তো স্ক্রু-ড্রাইভার খোঁজার ঘটনাটা ওর মনে ছিল। তা ছাড়া কাগজে আয়রনম্যান নিয়ে আমার লেখালিখির ব্যাপারটাতো ও জানতই! কিন্তু কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর ও সহজ হয়ে এল। বুঝতে পারল, ওর এই ব্যাপারে আমিও যথেষ্ট আপসেট হয়েছি। তা ছাড়া আমি যে আয়রনম্যানের কেসটা আর রিপোর্ট করছি না, সে-কথাও জানিয়েছি ওকে।

মামলা আদালতে ওঠার দিন-কুড়ি আগে আমি আর মায়া একদিন গেলাম মিস্টার বসু রায়ের সঙ্গে শেষ জরুরি মিটিঙের জন্যে।

সিদ্ধার্থর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে তিনি একটা ছক কষেছেন।

যতীন বসু রায়ের চেহারা গোলগাল, মাঝবয়েসি, বেশ ভুঁড়ি আছে। কিন্তু এগুলোই বোধহয় তাঁর অস্ত্র। কারণ, তাঁকে দেখলে বোকা-বোকা মনে হয়।

মায়াকে লক্ষ করে তিনি বললেন, 'আপনার স্বামীর এগেইনস্টে যত এভিডেন্স পুলিশ জোগাড় করেছে সবই সারকামস্ট্যানশিয়াল। সুতরাং, প্রসিকিউশানই আগে প্রমাণ করুক যে, আপনার স্বামী দোষী। ভাববেন না যে, আমি প্রমাণ করতে পারব আপনার স্বামী নির্দোষ। আমার কাজ হবে শুধু সংশয় তৈরি করে দেওয়া। দ্যাট উইল বি এনাফ।'

'সেটা করবেন কী করে?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'প্রথমে ওই অ্যাসিড, স্টিলের পাত, নোজ প্লায়ার্স—ওগুলোর কথাই ধরা যাক। প্রসিকিউশান বলবে, ওগুলো দিয়ে দরজার ছিটকিনি, তালা কিংবা জানলার গ্রিল কেটে সিদ্ধার্থবাবু ভিকটিমদের ঘরে ঢুকতেন। আমরা বলব, ওগুলো টিভি বা ভি. সি. আর. সারানোর যন্ত্রপাতি। অ্যাসিড ঠিকমতো ডাইলুট করে নিলে তা দিয়ে যন্ত্রপাতি সাফাইয়ের কাজ হতে পারে। তা ছাড়া ইলেকট্রনিক সারকিট সারাইয়ের কাজে কতরকম টুল্‌স্ লাগে তার কি কোনও হিসেব আছে! সিদ্ধার্থবাবুই আমাকে বলেছেন, ওই স্টিলের পাত দিয়ে উনি ইলেকট্রিক্যাল কনট্যাক্ট টেস্ট করেন। আর তখন ইনসুলেশানের জন্যে গ্লাভ্‌স্‌জোড়া

খুব জরুরি।'

'আর ওই শায়া-টায়াগুলো?' আমি জানতে চাইলাম।

যতীন বসু রায় পাকা হাসি হাসলেন। বললেন, 'আগে তো পুলিশ প্রমাণ করুক ওগুলো আপনার বোনের নয়। যদি তা প্রমাণ করতে পারে তখন ওদের নেক্সট ঝামেলা হবে, ওগুলো যে ভিকটিমদের সেটা প্রমাণ করা। না, না, মিসেস রয়, একদম উয়ারিড হবেন না। এ-কেসটায় এক লক্ষ লুপহোল্‌স রয়েছে।'

'কিন্তু প্রমাণ না করতে পারুক, ওগুলো সিদ্ধার্থের কাছে রয়েছে কেন সেটা তো জানতে চাইবে—' মায়া জিগ্যেস করল।

ছাত্র-ছাত্রী বোকা-বোকা প্রশ্ন করলে পেশাদার মাস্টারমশাই যেভাবে অনুকম্পার হাসি হাসেন, বসু রায় ঠিক সেইভাবে হাসলেন। বললেন, 'ধরুন, শায়া, ব্রা, এসব জমানোটা সিদ্ধার্থবাবুর হবি। কিংবা মেয়েদের অন্তর্বাস হাতের কাছ থাকলে তাঁর উত্তেজনা বাড়ে। জাজ আপনার স্বামীকে পাগল ভাবুক তাতে আমার কিস্যু যায় আসে না। আদালত আপনার স্বামীকে খুনি না ঠাওরালেই হল—তাতে আমি অন্তত খুশি হব। আশা করি আপনারাও হবেন।'

ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এও বুঝলাম, সিদ্ধার্থ যে খুন-হওয়া একটি মেয়ের বাড়িতে টিভি সারাতে গিয়েছিল সেটাকে নেহাত কাকতালীয় বলে প্রমাণ করার জন্যেও উনি যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করছেন।

কথাবার্তা শেষ করে যতীন বসু রায়ের চেম্বার থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম।

কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল, বেকসুর খালাস হতে সিদ্ধার্থর বেশ অসুবিধে হবে। যতীনবাবু সেটা হয়তো আঁচ করেছেন, তাই সংশয় তৈরি করে কেসটা ভন্ডুল করতে চাইছেন। তা ছাড়া মায়াকে হয়তো খানিকটা ভরসা দিতেও চেয়েছেন।

মায়াকে দেখে বুঝলাম, ও-ও সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। ওর ভুরুতে ভাঁজ, চোখ কোঁচকানো। যতীন বসু রায়ের কথার মধ্যে যে খানিকটা ফাঁকা আওয়াজ রয়েছে সেটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে ও। ওর গম্ভীর মুখ দেখে আমি কোনও আলোচনা করতে সাহস পেলাম না।

এর দু-দিন পরেই মায়া আমাকে বলল, ও একটু একা থাকতে চায়। তা ছাড়া এখন ও ঠিক আছে—চিন্তা করার কিছু নেই। আর বাড়িতে আমার আর অলকের তো অসুবিধে হচ্ছে।

আমি ওর ইশারা বুঝতে পারলাম। তাই ওকে বললাম, 'এ-বাড়ি তালা দিয়ে কাজল আর টনিকে নিয়ে তুই আমাদের বাড়ি চল্‌—।'

মায়ার মুখে কেমন একটা জেদ ছিল। বলল, 'না। ক'টা দিন আমি একটু একা থাকতে চাই।'

অগত্যা তাই। তল্পিতল্পা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। তবে একদিন অন্তর একদিন

আমি আর অলক পালা করে ওর সঙ্গে দেখা করতে লাগলাম। এটুকু বুঝলাম, ও বেশ শক্ত ধাতের মেয়ে। এইরকম পরিস্থিতিতে আমি হলে কী করতাম কে জানে!

মামলা আদালতে ওঠার দু-দিন আগে আমাদের কাগজের দপ্তরে একটা ফোন এল। সল্ট লেকে একটা নৃশংস খুন হয়েছে। একটি বিবাহিত মেয়ে মারা গেছে।

অন্য কোনও কাজের ঝামেলা না থাকায় আমি অ্যাসাইনমেন্টটা নিলাম।

অকুস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে আমার চৈতন্য হল। এ তো সিদ্ধার্থর পাড়া!

তার একটু পরেই নির্দিষ্ট বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। মায়াদের ঠিক পাশের বাড়ি!

বাইরের ঘরে বেশ কয়েকজন পুলিশের লোক। তার মধ্যে ইন্সপেক্টর সরকারকেও দেখলাম। এ ছাড়া ডক্টর, ফটোগ্রাফার, ল্যাবরেটরির লোকজনও রয়েছে।

ইন্সপেক্টর সরকার আমার কাছে এল। ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসা একজন বছর-পঁয়ত্রিশের লোককে দেখিয়ে বলল, 'হাজব্যান্ড। আজ সকালেই বম্বে থেকে ফিরেছে।'

ভদ্রলোকের চুল উসকোখুসকো, বেশবাস ঠিক নেই। মুখে হতভম্ব ছাপ।

সরকার বলল, 'চলুন, ভেতরে চলুন—।'

বেডরুমে এসেই বুঝলাম, আমি কোথায় এসেছি।

সেই ঘর। এই ঘরের জানলা দিয়ে মায়ার রান্নাঘরের জানলা দেখা যাচ্ছে। আর বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে রয়েছেন মিসেস কাপুর। পরনে নাইটি। মাথা চুরমার। একটা চোখ অক্ষত থেকে যাওয়ায় বীভৎস ভয়ঙ্কর লাগছে।

'দরজা বন্ধ দেখে মিস্টার কাপুর ধাক্কাধাক্কি করেন। তারপর দরজা ভেঙে এই অবস্থা দেখেন। ওদিকের ওই জানলাটার গ্রিল কাটা। মনে হয়, মার্ডারার জানলা দিয়েই ঢুকেছিল। সেই একই গল্প : মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে খুন, স্বামীর কথামতো দুটো শায়া বোধহয় মিসিং, আর একটা ব্রেসিয়ার। আর সেক্সুয়াল অ্যাসাল্টের কোনও সাইন পাওয়া যায়নি।'

আমি মিসেস কাপুরের বীভৎস মৃতদেহ দেখছিলাম। অথচ যখন বেঁচে ছিলেন তখন কী সুন্দরীই না ছিলেন!

আমি সরকারকে জিগ্যেস করলাম, 'তাহলে সিদ্ধার্থ...?'

সরকার হাসল, বলল, 'বেকসুর খালাস, আর কী! জেল হাজতে বন্দি থেকে সে বেচারা কী করে মিসেস কাপুরকে খুন করবে? এ আসল আয়রনম্যানের কাজ।'

ব্যস, গল্প শেষ।

সিদ্ধার্থ বেকসুর খালাস হয়ে গেল।

মায়া আর টনিকে নিয়ে ওর সুখের সংসার আবার সুখে ভরে উঠল।

এরপর আয়রনম্যান আর কোনও খুন করেনি। কিন্তু ইদানীং একটা সন্দেহ আমার মনে মাথাচাড়া দিচ্ছে।

মায়া একবার বলেছিল, 'সিদ্ধার্থ যদি বদ্ধ পাগলও হয়, তাহলেও ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ওর জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি।'

মনে পড়ল, মায়া প্রায় বরাবরই যোগব্যায়াম চর্চা করে। ও হয়তো তেমন কিছু শক্তিশালী নয়, তবে কোনও মহিলাকে আচমকা কাবু করতে ওর তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মিসেস কাপুরকে তো নয়ই!

আর হাতুড়ি কি রেঞ্চ তো যে-কোনও দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়।

এর পরে ওদের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম। সেদিন টনি আমাকে খেলার জন্যে হাত ধরে টানতে-টানতে ছাদে নিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখি, ছাদের ঘরে রাজ্যের আলমারি আর লেপতোশক সাজিয়ে রাখা। টিভি, ভি. সি. আর. সারানোর কোনও কারখানার ছিটেফোঁটাও সেখানে নেই। কখনও যে সেরকম ছিল তাও বোঝা যাচ্ছে না।

পরে মায়ার কাছে শুনলাম, সিদ্ধার্থ ওসব রিপেয়ারের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কেন ছেড়ে দিয়েছে সে-কথা জিগ্যেস করতে আর সাহস হয়নি। হয়তো মায়াই জোর করে ছাড়িয়ে দিয়েছে। ও সাইকোলজি পড়া মেয়ে। ও জানে, মানসিক খুনিদের কী করে সামলাতে হয়। কী করে তাদের খুনের প্রবণতা দমিয়ে রাখা যায়।

শুধু একটা ব্যাপার খারাপ লাগছিল : মায়ার ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মিসেস কাপুরকে মরতে হল।

খুন করা সহজ

গোল্ডফিশটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হয়নি।

কাচের জারের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মাছটার ছন্দময় অলস সাঁতার দেখছিলাম, তারপর জলের মধ্যে ঢেলে দিলাম ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড। প্রথমে কয়েক ফোঁটা—তাতে মাছটার সাঁতারের গতি অনেক দ্রুত হল—আর তারপর একেবারে গোটা বোতলটা উপুড় করে দিলাম। আমার হাত দস্তানায় ঢাকা। যদি অ্যাসিড লেগে যায়! চুপচাপ দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগলাম, কীভাবে অ্যাসিড ধীরে-ধীরে মিশে যাচ্ছে জলে, উদ্গত ফেনা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে জারের কিনারা থেকে।

মাছটা চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বৃত্ত রচনা করল ওপরে-নীচে। আমার মনে পড়ে গেল মেলায় দেখা নাগরদোলার ঘূর্ণি-খাওয়া কাঠের ঘোড়ার কথা। অ্যাসিড চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতেই মাছটা যেন পাগল হয়ে উঠল। অ্যাসিড ওটাকে কুরে-কুরে খেতে লাগল, ক্রমশ ঢুকে পড়ল ওটার শরীরের অভ্যন্তরে।

কাকাতুয়াটা আর কখনও কাউকে বিরক্ত করবে না। ওটা জারের কাছে এসে দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, মাথা কাত করে দেখত গোল্ডফিশটাকে, যেন এখুনি জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করবে।

কাকাতুয়াটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে খাবার ঘরের টেবিলে রাখা ফলের রস তৈরির যন্ত্রটার দিকে তাকালাম। একদিকে ফল ঢুকিয়ে হাতল ঘোরালেই অন্যদিক দিয়ে রস বেরিয়ে আসে।

কাকাতুয়াটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হয়নি। খাঁচায় হাত ঢোকাতেই ওটা কঁকিয়ে উঠেছিল। আমি ওটাকে চেপে ধরলাম দস্তানা পরা হাতে। যদি কামড়ে দেয়! রস তৈরির যন্ত্রের মুখে ওটার মাথাটা ঢুকিয়ে যখন চেপে ধরলাম, তখনও ওটা চেঁচাচ্ছে। ধীরে-ধীরে হাতল ঘোরাতে শুরু করলাম। কুড়মুড়-কুড়মুড় শব্দ হল। ওর শরীরের থকথকে লাল অবশেষ টেবিলে গড়িয়ে পড়তেই কাকাতুয়াটা চুপ করে গেল। ওটার ছোট্ট কচি হাড়গুলো মড়মড় করে ভাঙতে লাগল। আমি হাতল ঘুরিয়ে চললাম।

কাকাতুয়াটার পালক ও রক্তমাখা থকথকে ঘন অবশেষ হাতে করে চেঁছে তুলে নিলাম। একটা ঠোঙায় ওগুলো ভরে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলাম।

বেড়ালটা আর কখনও কাউকে বিরক্ত করবে না। ওটা কেবলই খাঁচার পাশে রাখা চেয়ারে লাফিয়ে উঠত আর একটা থাবা কাকাতুয়াটার খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা করত।

বেড়ালটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে জ্বলন্ত উনুনের দিকে তাকালাম।

বেড়ালটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হয়নি।

ওটাকে তুলে নিয়ে গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে উনুনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর—একদম আলতো করে ওটাকে বসিয়ে দিলাম উনুনের গনগনে আঁচে। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ালটা লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু ভারী সাঁড়াশিটা দিয়ে ওটাকে চেপে ধরলাম গরম কয়লার সঙ্গে। পোড়া লোমের কটু গন্ধে ঘর ভরে গেল। মাঝে-মাঝে গরম কয়লাগুলো ফটফট শব্দে ফাটতে লাগল।

আরও কিছু কয়লা এনে উনুনে চাপিয়ে দিলাম, বেড়ালটার দগ্ধ হাড়-মাংসের ওপরে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরে নাচতে শুরু করল।

কুকুরটা আর কখনও কাউকে বিরক্ত করবে না। ওটা দিনভর উঠোনে-বাড়িতে বেড়ালটাকে তাড়া করে বেড়াত, ঘেউঘেউ করত বিচিত্র সুরে। অবশেষে বেড়ালটা গাছ বেয়ে উঠে পড়ত, হয়তো লাফিয়ে পড়ত পাশের বাড়ির ছাদে—বাঁচবার জন্যে।

কুকুরটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে রঙের টিনটার দিকে তাকালাম।

কুকুরটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হয়নি।

তবে কুকুরটা বেড়ালটার চেয়েও বেশি ধস্তাধস্তি করেছিল। কারণ, ওটার কখনও কোলে চড়া অভ্যেস ছিল না। ওটাকে কোলে তুলে এক হাতে চেপে ধরে অন্য হাতে রঙের টিনটা তুলে নিতেই বড়-বড় আকুতি ভরা চোখে সে আমার দিকে তাকাল। আধ টিন ঘন নীল রং ঢেলে দিলাম কুকুরটার চোখে-মুখে। ওটা বিচিত্র শব্দ করে বমি করল, পা ছুড়তে লাগল বীভৎসভাবে। ওটাকে চেপে ধরে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু উপায় কী! বাকি আধ টিন রং তো ঢালতে হবে!

বমি মেশানো আঠালো নীল রং গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে, আমার গায়ে। অবশেষে ওটা মারা গেল। ওকে ছেড়ে দিতেই নীল রং ভরা ছোট্ট দেহটা শব্দ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

কুকুরটার জন্যে আমার বউ খুব দুঃখ পাবে—সেইসঙ্গে বেড়ালটার জন্যেও, মাছটার জন্যেও, কাকাতুয়াটার জন্যেও। সবাইকে ও ভালোবাসত। ওদের জন্যে আমার বউটার বড় কষ্ট হবে। আমি আত্মহত্যা করলে ও দুঃখ পেত। আমি মরে গেলে আর কাকে ও দিন-রাত অপমান করবে, যন্ত্রণা দেবে? শাসন করার, বিরক্ত করার আর তো কেউ থাকবে না!

মাছটা, কুকুরটা, কাকাতুয়াটা, বেড়ালটার মতো আমাকেও যদি আমার বউ ভালবাসত, তাহলে কত ভালো হত! অনেক ভালো হত।

এই তো, দরজায় কে কড়া নাড়ছে। আমার বউ এসে গেছে। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিই।

আমার বউয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সামনের রাস্তায় দাঁড় করানো সিমেন্ট মেশানোর যন্ত্রটার দিকে তাকালাম।

আমার বউটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হবে না।

আপনার নির্বাচন

আপনাকে আমি একটু সমস্যায় ফেলতে চাই। খুব বড় মাপের কিছু না হলেও এটাকে মোটামুটি মাঝারি মাপের সমস্যা বলা যায়। আসলে আমাদের গোটা ব্যাপারটাই মাঝারি। যেমন, আপনার বয়েস মাঝারি, মাথার চুল মাঝারি, নয়নের দৃষ্টিশক্তি মাঝারি, কানের শ্রবণ-ক্ষমতা মাঝারি, মাসিক আয় মাঝারি, বুদ্ধিবৃত্তি মাঝারি, যদি বউ থাকে তো বউয়ের সৌন্দর্য মাঝারি, এমন কি উচ্চতা—তাও মাঝারি।

এই মাঝারি মাপের সমস্যাটা হল নির্বাচন আপনার পছন্দ করার ক্ষমতা। উঁহু, ভুল হল। বরং বলা উচিত একই ধরনের একাধিক জিনিসের মাঝ থেকে নিজের পছন্দটি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা।

যেমন ধরা যাক, তিন-তিনটে মেয়েকে আপনি ভালোবাসেন। অথবা ভালোবাসেন বলে নিজে মনে করেন। মেয়ে তিনটির নাম ধরা যাক, রূপবতী, ধনবতী ও কলাবতী। রূপ, ধন ও কলা সংক্রান্ত গুণাবলি ওদের সকলেরই প্রায় সমান-সমান। আপনি ওদের তিনজনকেই চেনেন, জানেন, পছন্দও করেন। এমন অবস্থায় হঠাৎই একদিন আপনাকে বলা হল, তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে আপনার বেছে নিতে হবে। তখন আপনার অবস্থাটা কী হবে একবার ভাবুন তো!

আমি জানি, আপনি তিন-তিনটি রাত জেগে কাটাবেন। দাঁত দিয়ে নখ কাটবেন। কিংবা মাথার মাঝারি-সংখ্যক চুলের বেশ কিছু উপড়ে নেবেন। অথচ এতসবের পরেও আপনি নিঃসন্দেহ হয়ে বলতে পারবেন না কোনটি আপনার পছন্দ।

রূপবতী, ধনবতী, কলাবতী—এই তিন নারীর গোলকধাঁধায় আপনি ঘুরপাক খাবেন। অবশেষে মরিয়া হয়ে যদি বা কিছু নির্বাচন করেন, তাহলে সন্দেহ নেই, কয়েক দিন, কিংবা মাস, কিংবা বছরের পর আপনি সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে যাবেন যে, আপনার নির্বাচনে গলদ ছিল।

এবারে আপনাকে দ্বিতীয় উদাহরণের কথা বলি।

ধরা যাক, আপনাকে বলা হল একজন মানুষ নির্বাচন করতে—যার মতো হতে পারলে আপনার আর কোনও দুঃখ, আপশোস বা ক্ষোভ থাকে না। আপনি একবার ভাবেন নেতাজী হবেন, পরক্ষণেই হতে চান মোহনচাঁদ। তারপর ইচ্ছে হয় রাজেশ খান্না কিংবা অমিতাভ হতে। তারও পরে হাজি মস্তান বা বিবেকানন্দ হতে মন চায়।

এইভাবে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কোনও পছন্দেই আপনার আশ মেটে না, খুঁতখুঁতুনি যায় না। সুতরাং, আপনি শ্রী নিবারণ গলুই বা যা-হোক কিছু, পরিণামে নিবারণ গলুই থেকে গিয়েই ক্ষান্ত হন।

এরপর মনে করা যাক, আপনাকে বলা হল একজন মানুষের নাম করতে—যে মরে গেলে আপনার বাধা-বিপত্তি-অসুবিধে দূর হয়। সোজা কথায় আপনার আশ মেটে।

ব্যস, এ-অনুরোধ করামাত্রই আপনি একটি তালিকা তৈরি করে ফেলতে চেষ্টা করবেন—যে-তালিকায় আপনার আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুবান্ধব অথবা শত্রুদের শুভনাম লিপিবদ্ধ করা আছে।

এরপর আসবে বাছাইয়ের পালা। কারণ, মাত্র একজনকে নিকেশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে আপনাকে। অতএব আপনার মনে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে যাবে। নানান চরিত্রের নানান খুঁটিনাটি ঘটনা টেকনিকালার ছবির মতো সরে-সরে যাবে আপনার মাঝারি-নজরী চোখের সামনে। অনেক তোলপাড় হবে, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। এবং এরকমটা চলতেই থাকবে। কোনও সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছতে পারবেন না।

না, আপনাকে আমি বেহদ্দ শিরদাঁড়াহীন মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছি না। আসলে এই সমস্যাগুলো আমার নিজের। কোনওরকম সমাধানে পৌঁছতে না পেরে আপনার মনে শরণার্থী হয়ে ঢুকে পড়তে চাইছি। যদি আপনার কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য কিংবা পরামর্শ পাওয়া যায়।

যেমন ধরুন, নির্বাচন-সংক্রান্ত আরও একটা সমস্যা হল জননেতা নির্বাচন। কাকে ভোট দেবেন আপনি? অনেকগুলো নাম-ধাম-চরিত্র আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেই ভালো-মন্দয় মেশানো মানুষ। আপনি, শ্রীনিবারণ গলুই, আবার সংকটে পড়ে যান। বন্ধুবান্ধব, এমন কি সহধর্মিণীর পরামর্শও হয়তো চেয়ে বসেন এ-বিষয়ে। না, প্রকৃত কোনও সাহায্য তারা আপনাকে করতে পারবে না—যেমনটা আমার বেলাতেও পারেনি। শেষমেশ মরিয়া হয়ে যা-হোক কাউকে ভোট দিয়ে ফেলেন আপনি—সুনির্বাচিত প্রতীক চিহ্নে সিলমোহর দেগে দেন পরম প্রত্যয়ে। এবং তার পরমুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে যায় বিবেক-দংশন। সিদ্ধান্তের ছোট-বড় গলদ খুঁজে পান আপনি। নিজেকে ধিক্কার দেন নির্বাচনে ভুলভাল করে ফেলার জন্যে। তখন নিজেকে বোকা-টোকা ইত্যাদি বলে মনে হতে থাকে।

যেমন উদাহরণগুলোর কথা আপনাকে বিরক্তিকরভাবে শোনালাম, এসব ঘটনাগুলোই আমার জীবনে বাস্তবে ঘটে গেছে। এবং যথারীতি সব নির্বাচনেই আমি বিলকুল গরমিল করে বসে আছি। আসলে এই সমস্যাগুলো আমার-আপনার সবার। সোজা কথায়, তামাম মাঝারি মানুষের এক মৌলিক সমস্যা।

যাক, এখন আর-একটু সংকটময় বিপজ্জনক নির্বাচনে আসা যাক। কখনও কি ভেবে দেখেছেন, আপনার মতে সবচেয়ে ব্যর্থ এবং অপদার্থ মানুষটি কে? লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে আপনাকে বলা হল সবচেয়ে ব্যর্থ অপদার্থ মানুষটি নির্বাচন করতে। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে আপনার ধন্দময় অনুসন্ধান। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তামাম তালাশি নেওয়ার পর আপনি শূন্য নজরে চেয়ে থাকেন। আমি জানি, কেন। কারণ, সেই বিশেষ মানুষটিকে খুঁজে পাননি আপনি। না, খুঁজে পাননি বললে ভুল বলা হয়, বরং বলা উচিত খুঁজে পেয়েও নির্বাচনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তার নামটি উচ্চারণ করতে আপনার লজ্জা ও সংকোচ হচ্ছে।

হ্যাঁ, এরকম লজ্জা-সংকোচ আমারও হয়েছিল। কারণ, নিজের নাম উচ্চারণ করতে আমরা,-মাঝারি মানুষরা, সবসময়েই লজ্জা পাই। বলুন তো, সত্যি কোনও সন্দেহ কি আছে যে, আপনার বিচারে সবচেয়ে ব্যর্থ এবং অপদার্থ মানুষটি আপনি নিজে? যেমন, আমার বিচারে আমি!

এই নির্বাচনের ফলাফলটুকু আঁচ করার পর আমার মনে হয়েছে, বেঁচে থাকার অর্থ কী? সত্যিই কি আমার, কিংবা আপনার, বেঁচে থাকার কোনও মানে আছে? যথাযথ কারণ আছে কি কোনও?

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি এবং আমি ব্যর্থ। সেরা অপদার্থও যে, তাতেও কোনও সন্দেহ আছে কি? আপনি এখনও ভাবছেন? না, আমার ভাবাভাবির পালা শেষ। কিন্তু তবুও আর-একটা নির্বাচনের সমস্যায় পড়েছি আমি।

আমার সামনে এই মুহূর্তে একটা নাক বোঁচা পিস্তল, তার পাশে বিষের শিশি, আরও আছে ফাঁস লাগানোর নাইলন-দড়ি, কিংবা কেরোসিনের টিন, এবং সব শেষে অতি ধারালো জাপানি ক্ষুর। 'জাপান' শব্দটায় কি গৌরবময় হারাকিরির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আপনার?

সে যাই হোক, এখন আপনি বলুন, কোন অস্ত্রটা আমি নির্বাচন করি! হ্যাঁ, নিজের বিচারে আমি যখন সবচেয়ে ব্যর্থ ও অপদার্থ মানুষ, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কী! অন্তত নির্বাচনের সংকট থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু মুক্তি কই? এই আপন্ন মুহূর্তেও আমি অস্ত্র নির্বাচনের ক্ষুরধার সমস্যায় পড়ে গেছি! নির্বাচনের পর হয়তো বুঝব আমার বিচারে গলদ থেকে গিয়েছিল। তাই আপনার সাহায্য চাইছি আমি।

বলুন, দয়া করে বলুন, পিস্তল, বিষ, দড়ি, কেরোসিন, না ক্ষুর—কোন অস্ত্রটা আমি বেছে নিই। একি নিবারণবাবু, আপনিও গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন? আমারই মতো আপনিও শেষ নির্বাচনের সমস্যায় পড়ে গেলেন?

কী বললেন? ঠিক একইরকম অস্ত্রাবলি এইভাবে সাজিয়ে বহুদিন ধরে একই সংকটে ডুবে আছেন আপনি? পছন্দ-অপছন্দের ঝড়ঝাপটায় ঘুরপাক খাচ্ছেন অসহায়ের মতো!

তাহলে এখন আমি কার কাছে যাই! কে আমাকে সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে এই সমস্যায়!

আচ্ছা আপনি, হ্যাঁ, আপনি—যিনি এই সমস্যার কথা এতক্ষণ ধরে পড়লেন। আপনি একটু সাহায্য করতে পারেন আমাকে? বলতে পারেন, কোন হাতিয়ারটা পছন্দ করি? পিস্তল, বিষ, দড়ি, কেরোসিন, না ক্ষুর?

প্লিজ, ব্যক্তিগত নির্বাচনে এটুকু সাহায্য আপনাকে করতেই হবে! বলা যায় না, এই নির্বাচন হয়তো একদিন আপনার নিজেরও কাজে লাগবে। অতএব দয়া করে বলবেন কি, পিস্তল, বিষ, দ—

শচিপতি ও অশ্বমেধ

বারুইপুরের শচিপতি মল্লিককে দেখলে লোকে এড়িয়েই চলত। কারণ, সে ছিল সেই ধরনের লোক, যারা নিজের বুদ্ধি বিক্রি করে জীবনধারণ করে। সেইসঙ্গে ছিল তার সুচতুর বাক্যালাপের ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই, জুয়ার আড্ডা এবং রেসের মাঠ, এই দু-জায়গাতেই শচিপতি মল্লিককে দেখা যেত—যদিও সে নিজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে খুব কমই।

অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতা, এই দুইয়ের সমন্বয়ে শচি মল্লিক বেশ নির্বিঘ্নেই দিনযাপন করত। হঠাৎই একদিন, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই, এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল তার জীবনে।

কিংবদন্তি আছে, শচি মল্লিক প্রথম কথা বলতে শেখে 'রয়্যাল হার্ট' শব্দটি উচ্চারণ করে। তার বাবা ছিলেন পাক্কা রেসুড়ে। তার মুখ থেকেই ওই বিচিত্র নাম হয়তো সে শুনে থাকবে। এবং পরবর্তী রেসের দ্বিতীয় বাজিতে ওই ঘোড়াটি প্রচুর ডিভিডেন্ড-এ প্রথম হয়। শচিপতির বাবা ক্লিষ্ট হেসে সাড়ে তিন বছরের ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, বাপ কা বেটা...।

বাবার অনুচ্চারিত 'সিপাই কা ঘোড়া' শব্দগুলোই শচিপতির জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ল। রেসের মাঠের বাইরের বে-আইনি বাজিদাররা শচি মল্লিকের পরিচয় পেল তাড়াতাড়িই। এবং ক্রমশ তার ঘোড়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তারা কিনতেও লাগল। ক্রমে-ক্রমে একটা প্রবাদ ছড়িয়ে পড়ল, শচি মল্লিকের গা থেকে নাকি ঘোড়ার গন্ধ বেরোয়।

কোনওরকমে সুতোর দু-মাথা এক করে দিন গুজরান করলেও, নিজের পোশাক আশাকের ব্যাপারে শচিপতি বরাবরই ফিটফাট। তাতে খদ্দের ধরতে সুবিধে হয়। শচিপতিকে কখনও কেউ দুঃখ করতে দেখেনি। মাঝে-মাঝে সে বলত, আমার মতো লোকের কোনওদিনও পয়সার অভাব হবে না। কারণ, পৃথিবীতে যখনই একটা মাথামোটা (শচিপতির খদ্দের) মারা যায়, তখনই তার পরিবর্তে আরও দশটা স্থূলমস্তিষ্কের জন্ম হয়।

সুতরাং, এ-হেন শচিপতির জীবনে আশ্চর্য ঘটনা না ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। অথচ কার্যক্ষেত্রে তাই ঘটল।

দিনটা ছিল শুক্রবার। ১৯৭১ এর ১ জানুয়ারি। বিকেল তিনটেয় 'নিউ ইয়ার্স গিফ্‌ট'-এর দৌড় আরম্ভ। সুতরাং, কিছু খদ্দের ধরার আশায় হসপিটাল রোডের সামনের খোলা মাঠে এক বিশাল অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে ছিল শচিপতি। ঘটনাচক্রে আজই তার পকেটে রেস্ত অন্যান্য দিনের চেয়ে কম।

নির্জন দুপুর। শচিপতির হাতঘড়িতে প্রায় সাড়ে বারোটা। শীতের রোদ্দুরে পিঠ পেতে জনাকয়েক রেস-দর্শনে উৎসাহী মানুষ ঘাসের ওপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। মাঝে-মাঝে

কানে আসছে রাস্তা ধরে ছুটে চলা গাড়ির হর্নের শব্দ। গোখেল রোডের মুখ থেকে কিনে আনা 'দ্য টার্ফ'-এর পাতা ওলটাচ্ছিল শচিপতি। চেষ্টা করছিল চারটে রেসের সম্ভাব্য উইনারদের খুঁজে বের করতে। গত সপ্তাহে তার ভবিষ্যদ্বাণী কাউকে খুশি করতে পারেনি। কারণ, আপসেট ফলাফলে মিডনাইট কাউবয় বাজি মেরে দেয়। তাই বিষণ্ণ শচিপতি মল্লিক কানের কাছে আচমকা কার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো চমকে উঠল।

'মিস্টার মল্লিক—।'

ঝটিতি মুখ ফেরাল শচিপতি।

কালো পোশাক পরা এক বৃদ্ধ তার সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে সাদা দাড়ি, কপালে সাদা ভুরুর নীচে গভীর কটা চোখ। সে-চোখে যেন বিদ্রূপের চাপা বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে।

শচিপতির কাছে আজ খদ্দেরদের ভিড় তেমন হবে না। কারণ, তার গত সপ্তাহের ব্যর্থতা। সেটা ভালো করে জানে বলেই সে এই বৃদ্ধের আকস্মিক সম্বোধনে বিস্মিত হল।

'আপনাকে...আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।' বিহ্বল শচিপতি মনে-মনে আঁচ করতে চেষ্টা করল বৃদ্ধের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় তার আর্থিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটবে কি না।

সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে অস্বাভাবিক ফিসফিসে স্বরে বলল বৃদ্ধ, 'মিস্টার মল্লিক, এককালে ঘোড়দৌড় আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু আজ...।'

অশ্বত্থ গাছের ঘন ছায়ায় বৃদ্ধের কালো চেহারা যেন ধীরে-ধীরে মিশে যেতে চায়।

এবার বিহ্বলতা কাটিয়ে একটু রুক্ষ স্বরেই প্রশ্ন করল শচিপতি, 'কী চাই আপনার?'

'কী চাই? নাঃ, চাওয়ার-পাওয়ার দিন সব পেছনে ফেলে এসেছি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃদ্ধ 'আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে।'

'বলুন—' সংক্রামকভাবে শচিপতির স্বরও ফিসফিসে নিচু পরদায় নেমে আসে। ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে উঠল তার।

'একটা খবরের কাগজ আছে, কিনবেন?' বলে কালো কোটের পকেট হাতড়াতে থাকে বৃদ্ধ 'এই কাগজটা কিন্তু অন্যান্য অর্ডিনারি খবরের কাগজের মতো নয়—বিশ্বাস করুন।'

'তার—মানে?'

শান্ত স্বরে বৃদ্ধ বলল, 'এটা আগামীকালের "আনন্দবাজার পত্রিকা।" ' তারপর সে পকেট থেকে বের করে আনল একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ।

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' এবারে যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করল শচি মল্লিক। পকেট থেকে একটা সিকি বের করে বুড়োর হাতে দিতে গেল 'নিন—এতেই সন্তুষ্ট থাকুন। আজ বাজার বড় খারাপ যাচ্ছে। দেখুন, যদি কপাল ভালো থাকে তাহলে পরের সপ্তাহে একটা গোটা টাকাই দিয়ে দেব।'

বুদ্ধি বিক্রি করে খাওয়া শচিপতি মল্লিকের এই একটা গুণ ছিল। তা হল, সাধ্যসামর্থ্য

মতো গরিবকে সাহায্য করা।

শচিপতি মল্লিকের কথায় অস্ফুট শব্দে হেসে উঠল বৃদ্ধ। দন্তহীন মুখের সে-হাসিতে শচিপতির শিরদাঁড়া বেয়ে যেন নেমে গেল একটা হিমেল স্রোত। তার বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ঠেকল।

'কপাল ভালো থাকলে? ভালো বলেছেন।'

'শুনুন, আমার হাতে সময় কম আছে—আপনি কী চান বলুন তো?' শচিপতির মনে এই রহস্যময় বৃদ্ধ সম্পর্কে আচমকাই যেন একটা সম্ভ্রমের ছায়া জেগে ওঠে।

'মিস্টার মল্লিক, আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। ধন্যবাদ।'

বৃদ্ধ যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তাকে বাধা দিল শচিপতি। উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনাকে বলতেই হবে আপনি কী চান!'

'কিছুই চাই না। শুধু এই খবরের কাগজটা আপনাকে দিতে চাই। আপনার অবস্থা যখন সুবিধের নয়, তখন কোনও পয়সাই আপনাকে দিতে হবে না। এই নিন।' খবরের কাগজটা হতভম্ব শচিপতির হাতে গুঁজে দিল বৃদ্ধ। তার আঙুলের পরশে শিউরে ওঠে শচিপতি। যেন তিনদিন ধরে বরফে ভেজানো আঙুল সেগুলো। বৃদ্ধ বলল, 'এই মুহূর্তে এ-কাগজ পৃথিবীতে মাত্র একটাই আছে। অবশ্য আগামীকাল সকালে এর বহু কপিই আপনার নজরে পড়বে।'

ঘটনার অযৌক্তিকতায় শচিপতির হাসা উচিত ছিল। কিন্তু সে হাসতে পারল না।

বৃদ্ধ তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'এতে আজকের রেসের উইনারদের নাম লেখা আছে। পড়ে দেখুন।'

এবার ভীষণভাবে চমকে উঠল শচিপতি। খবরের কাগজের তারিখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় কোনওরকমে সে উচ্চারণ করল, 'অসম্ভব।' এবং পরমুহূর্তেই চোখ তুলে দেখল, গাছের ছায়ায় সে একা বসে আছে। আশেপাশে কোথাও কালো পোশাক পরা সেই বৃদ্ধকে নজরে পড়ছে না। কিন্তু একটা অদ্ভুত হাসির অস্ফুট শব্দ তার কানে এল। রক্ত-হিম-করা হাসি। হয়তো তার মনের বিভ্রম—ভাবল শচিপতি।

হঠাৎই শচি মল্লিক অনুভব করল, বুকের ভেতর তার অবাধ্য হৃৎপিণ্ডের অশান্ত দুপদুপ শব্দ। কাঁপা হাতে কোনওরকমে কাগজটা খুলে ধরল সে। না, প্রথমবারে যা চোখে পড়েছিল, দ্বিতীয়বার পর্যবেক্ষণেও কোনও ব্যতিক্রম তার হয়নি। আপনমনেই বিড়বিড় করে সে পড়ল, 'শনিবার, ২ জানুয়ারি, ১৯৭১।'

এক মুহূর্ত ভাবল সে।

আজ যে পয়লা জানুয়ারি, এবং শুক্রবার, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও পকেট থেকে ডায়েরি বের করে সে সামান্যতম সংশয়েরও নিরসন করে নিল। তারপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। কাঁপা হাতেই খেলার পাতাটা খুলল সে। দেখল, নীচের দিকে স্পষ্ট হরফে ছাপা : কলকাতা রেসের ফলাফল। এবং স্পষ্টভাবেই ঘোষিত হয়েছে চারটি রেসের প্রথম স্থানাধিকারী চারটি ঘোড়ার নাম:

বুকিটডারা, সোল বাইন্ডার, কিংস কাউন্সেল এবং ফেসন। তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরে ফেলল সে। কপালে হাত দিয়ে অনুভব করল ঠান্ডা ঘামের প্রলেপ। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা প্রচণ্ড দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। জিভটা যেন বড় বেশি শুকনো ঠেকছে।

হাতঘড়ির দিকে চোখ রাখল শচিপতি মল্লিক। বেলা প্রায় দুটো। লোকজনের ভিড় ক্রমে বাড়তে শুরু করেছে। সে চেষ্টা করল গাছের আড়ালে বসতে, যাতে তার হাতের কাগজটা কেউ দেখতে না পায়।

'কোথাও কোনও একটা গন্ডগোল রয়েছে...' আপনমনেই বিড়বিড় করল শচিপতি। খবরের কাগজের তারিখটা আরও একবার পরখ করল। প্রতিটি পাতাতেই প্রায় স্পষ্ট অক্ষরে তারিখটা ছাপা হয়েছে। সে ১৯৭১-এর প্রতিটি সংখ্যা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখার ঢঙে যাচাই করে দেখল। কিন্তু সেখানেও কোনও খুঁত খুঁজে পাওয়া গেল না। ঝটিতি প্রথম পাতাটা খুলে ধরল সে। দেখল, বড়-বড় হেডলাইনে চটকল ধর্মঘটের কথা লেখা রয়েছে। সেটা ১৯৭০-৭১-এরই ঘটনা। অন্য কোনও বছরের নয়।

অতএব কাগজটির অসাধারণত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শচিপতি মল্লিক। নাঃ, সে ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ, প্রথম রেসে সে সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে ব্ল্যাক প্রিন্সকেই ব্যাক করেছিল। কাগজে লেখা রয়েছে, ফেবারিট ব্ল্যাক প্রিন্সকে বেশ কয়েক লেংথে হারিয়ে বুকিটডারা প্রথম হয়েছে।

হঠাৎই শচিপতির নজরে পড়ল, জনাকয়েক উৎসাহী রেসুড়ে বেশ উৎসুক হয়েই তার দিকে তাকিয়ে আছে। সুতরাং, খবরের কাগজটা পকেটে গুঁজে সে মাঠের দরজার দিকে পা বাড়াল।

আজ রেস জমজমাট। তাই ভিড়ও অঢেল। সকলেই এসেছে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। শচিপতি অনুভব করল, ভাগ্য পরীক্ষার যে উত্তেজনা, তা যেন তার মন থেকে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে।

মাঠের দরজায় পৌঁছে পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হতেই মৃদু হাসিতে সম্ভাষণ জানাল শচিপতি। আজ তাকে কেউ টিপ্স-এর কথা জিগ্যেস করছে না। সুতরাং, শচিপতিও যেচে কাউকে কিছু বলবে না।

কাউন্টারে গিয়ে সে খবরের কাগজে উল্লিখিত কম্বিনেশনে ঢেলে দিল পকেটের সমস্ত পয়সা। তেতাল্লিশ টাকার তিন টাকা রেখে, চল্লিশ টাকায় কিনল জ্যাকপটের টিকিট। শচিপতি জানে, সে কত ডিভিডেন্ড পাবে। কারণ, কাগজে স্পষ্ট লেখা আছে একটা টিকিটে প্রায় চোদ্দো হাজার টাকা উঠেছে। সুতরাং, সে নির্বিকার মুখে এগিয়ে চলল কাঠের বেঞ্চের দিকে।

হঠাৎই একজন প্রশ্ন করল, 'এই যে, মল্লিকসাহেব, কোনও খবর-টবর আছে নাকি?'

স্বপ্নাবিষ্টের মতো সে জবাব দিল, 'তৃতীয় বাজিতে কিংস কাউন্সেল আসছে। শিয়োর শট।'

যাওয়ার পথে ধন্যবাদটা ছুড়ে দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আচ্ছন্ন শচিপতি শ্লথ ভঙ্গিতে গিয়ে আসনে বসল।

প্রথম রেস শুরুর মুহূর্তে শচিপতি মল্লিক কিছুটা ছটফটে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু যখনই দেখল তিন নম্বর ঘোড়া, বুকিটডারা, সবার আগে দৌড়চ্ছে তখনই সে শান্ত হয়ে বসল। গোটা মাঠের যুগপৎ আনন্দ ও আক্ষেপের চিৎকার তার কানেই ঢুকল না।

শেষ বাজি শেষ হয়ে যেতেই শচিপতির ঘোর যেন কাটল। সে নির্বিকার মুখে এগিয়ে চলল কাউন্টারের দিকে। তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হবে যেন তার স্ত্রী সদ্য মারা গেছে।

শত কোলাহল ও ভিড় এড়িয়ে সে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভাঙা অনুত্তেজিত স্বরে বলল, 'টাকাটা পাওয়া যাবে? জ্যাকপটের বাজিতে আমার টিকিট লেগেছে।' কাউন্টারের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন সৌভাগ্যবান শচিপতিকে নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল।

একটা ভালো দাঁও-এর পর বরাবরই শচিপতি একটু ফুর্তি-টুর্তি করে। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গলা ভেজানোয় সে কখনও কার্পণ্য করে না। কিন্তু আজ সে চুপচাপ নোটে ঠাসা পকেট নিয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। পরিচিতদের 'কনগ্র্যাচুলেশান্স'-এর উত্তরে সে আচ্ছন্নভাবে শুধু মাথা হেলাল।

একটা অবিশ্বাস্য ঘোরের মধ্যে সে এসে পৌঁছল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। ট্যাক্সিতে উঠে বলল, 'শেয়ালদা স্টেশন—।'

ড্রাইভার দু-একবার জিগ্যেস করার চেষ্টা করল আজকের রেসের পরিস্থিতি ও ফলাফলের কথা। নিস্পৃহ শচিপতির নীরবতায় সে ধরে নিল, শচি মল্লিক দুর্ভাগ্যশালীদেরই একজন। সুতরাং, সে নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল।

ছ'টা পঞ্চান্নর বারুইপুর লোকাল ধরল শচিপতি। ট্রেনের কামরায় ভিড় থাকা সত্ত্বেও বহুদিনকার অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশলে একটা স্বল্প পরিসর জায়গা তৈরি করে বসে পড়ল সে। তারপর নিজের অবিশ্বাসী মনকে ক্রমশ যুক্তিবাদী জগতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। ট্রেনের কামরায় তার দু-একজন রেসুড়ে বন্ধুকেও দেখা গেল। তাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বললেও শচিপতির মন পড়ে রইল সেই রহস্যময় বৃদ্ধের ঘটনায়। সে যেন ভুলতে পারছে না সেই বীভৎস, হাড়-কাঁপানো নিঃশব্দ হাসির কথা। এই মুহূর্তেও শচিপতির শিরদাঁড়াটা কেমন যেন ঠান্ডা-ঠান্ডা ঠেকছে। মনে হচ্ছে...।

হঠাৎই কী মনে করে পকেট থেকে সেই অদ্ভুত কাগজটা বের করে নিল শচিপতি। অবাক চোখে সেটার পাতা উলটে দেখতে লাগল। মনে-মনে ঠিক করল, কাল সকালের একটা কাগজ নিয়ে এটার সঙ্গে সে মিলিয়ে দেখবে। দেখবে, সেই কালো কোট পরা লোকটা সত্যি কথাই বলেছে কি না। অবশ্য এখন আর তার তেমন গুরুত্ব নেই। তবুও কৌতূহল বড় ভীষণ জিনিস।

আচমকা পঞ্চম পৃষ্ঠায় লাইন দিয়ে ঘেরা এক ছোট্ট খবরে তার নজর পড়ল।
একটা অস্ফুট শব্দ করে সোজা হয়ে বসল শচিপতি। তার চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে ঠেলে বেরিয়ে আসবে। মুখ-চোখ হয়ে উঠেছে রক্তাভ। নিশ্বাস হয়ে এসেছে ঘন। উত্তাল হৃৎপিণ্ডকে অস্বীকার করে সে পড়তে লাগল

বিজয়ীর প্রস্থান

গতকাল জ্যাকপট বিজয়ী জনৈক শচিপতি মল্লিক (৪৯) সন্ধের ট্রেনে ফেরার সময় আকস্মিকভাবে হার্টফেল করে মারা যান। মৃত্যুকালে তার কাছে প্রায় চোদ্দো হাজার টাকা...'

আর পড়তে পারল না শচিপতি। তার শ্লথ হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ল। অন্ধকারে ছুটে চলা ট্রেনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার হৃৎস্পন্দন যেন ছুটে চলেছে। কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে। বিস্ফারিত চোখে তাকাল চেনটার দিকে। তার হাতের পাঁচ আঙুল চেন টানার পিপাসায় বারবার হাওয়া আঁকড়ে ধরল। উন্মাদের মতো ভাঙা কর্কশ স্বরে সে চিৎকার করে উঠল, 'এক্ষুনি ট্রেন থামিয়ে দাও! স্টপ ইট আই সে।'

এবং পরমুহূর্তেই তার অতি-পরিশ্রমে-ক্লান্ত হৃৎপিণ্ড থামল! স্পন্দনহীন শচিপতি মল্লিক মেঝেতে গড়িয়ে পড়ার মুহূর্তে উচ্চারণ করার চেষ্টা করল, 'কালো কোট পরা লোকটা—' কিন্তু 'কালো কোট' ছাড়া বাকি শব্দগুলো তার ফুসফস ছেড়ে বেরোতে পারল না।

সশব্দে তার নিষ্প্রাণ দেহটা অসংখ্য হতভম্ব সাক্ষীর প্রত্যক্ষে ট্রেনের কামরায় আছড়ে পড়ল।

'হয়তো জ্যাকপট জেতার আনন্দেই বেচারা হার্টফেল করল।' সহানুভূতিপূর্ণ জনৈকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কিন্তু খবরের কাগজটার কথা বোধহয় কারও মনেও আসেনি।

শাতন

'সত্যি, আজ অসম্ভব গরম পড়েছে।' রিপোর্টার ভদ্রলোক পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন 'জানলাটা খুলে দিলে আপনার আপত্তি আছে?'

'বিন্দুমাত্রও না।' অনাদি শিকদার নির্বিকার মুখে জবাব দিলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে ধীরে, অত্যন্ত ধীরে, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন দেওয়াল সংলগ্ন পানীয় আধারের দিকে। কষ্টকৃত ভঙ্গিমায় গ্লাসে পানীয় ঢাললেন, ছোট্ট করে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন।

রিপোর্টারের মুখে অনুকম্পার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। কারণ, অনাদি শিকদারের আড়ষ্ট ভঙ্গিমার কারণ সে জানে।

তার মুখের ভাব লক্ষ করে অনাদি শিকদার হাসলেন 'উঁহু, আপনার বিব্রত হওয়ার কোনও কারণ নেই।' আর-একটা গ্লাস অতিথির জন্যে পানীয় নিলেন তিনি। শ্লথভাবে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন, 'খুব একটা অসুবিধে যে হয়, তা নয়। এই অবস্থাটাকে আমি একরকম মেনেই নিয়েছি বলতে পারেন।'

চেয়ারে এসে বসলেন অনাদি শিকদার। অতিথির হাতে গ্লাস তুলে দিলেন।

'এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। শুধু-শুধু আপনি কষ্ট করতে গেলেন।'

'ইটস নাথিং।' অনাদি শিকদারের শীর্ণ মুখে হাসির রেখা দু-ঠোঁটেই সীমাবদ্ধ রইল। তাঁর বয়েস চল্লিশের কাছাকাছিই হবে। মুখে একমাত্র অবিরত যন্ত্রণাভোগের অভিব্যক্তিটুকু ছাড়া আর কোনও গরমিল চোখে পড়ে না। চেহারা দেখে বয়েস আরও কম বলেই মনে হয়।

'এই একই গল্প আপনাকে হয়তো বহুজনের কাছে বহুবার বলতে হয়েছে, তাই না?' রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' ঘাড় হেলালেন অনাদি শিকদার।

'জানি, ব্যাপারটা একঘেয়ে, বিরক্তিকর—কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ। আপনার গল্পটা আমি একবার শুনতে চাই।'

'তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। তবে ঘটনার আঁচ ঠান্ডা হয়ে থিতিয়ে আসায় ইদানীং একটু নিশ্চিন্তেই আছি। প্রথমে যখন ডাকাতিটা হল, তারপর বিচার চলার সময়, প্রচুর কাগজওলা আমার সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয়েছিল। তারপর বিচারে যখন অধীপের শাস্তি হল, ওকে জেলে পাঠানো হল, তখন সবাই ব্যাপারটা একরকম ভুলেই গেল। এটাকে আপনি রবিবারের গল্প-প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপবেন, তাই তো বলছিলেন?'

'সেই রকমই ইচ্ছে আছে। তারপর মালিকের মরজি। আমি আপনার মুখ থেকে ওই দুর্ঘটনার মানবিক দিকটা জানতে চাই। মানে, ঠিক গতানুগতিক গল্প নয়, যেমন অন্য সব কাগজে ছেপেছে। আশা করি আপনি আমার আইডিয়াটা বুঝতে পারছেন?'

'হুঁ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অনাদি শিকদার।

'যতীশ খান্নার জুয়েলারি দোকানে আমি যখন চাকরি নিই, তখন ভাবিনি যে, কোনওদিন আমার এই হাল হবে।' অনাদি শিকদার বলতে শুরু করলেন, 'যতীশ খান্না ছোটখাটো, বৃদ্ধ লোক—নির্বিরোধী, শান্ত স্বভাবের। তাঁর ব্যাবসা যে খুব বিরাট তা আমি বলব না। বরং আশপাশের প্রতিবেশী দোকানদারদের চেয়ে তাঁর ক্যাপিটাল অনেক কমই ছিল। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই সিকিওরিটির ব্যবস্থাও অন্যান্য বড় দোকানের মতো অত জোরদার ছিল না। হয়তো সেই কারণেই অধীপ সান্যাল আমাদের দোকানটাই বেছে নিয়েছিল—ভেবেছিল, ওই দোকান থেকে হীরে-জহরত লুঠ করে সটকে পড়াটা তার পক্ষে অনেক সহজ হবে।

'মাসখানেক যতীশ খান্নার দোকানে চাকরি করার পর ব্যাবসার মেইন বেচাকেনার দিকটা তিনি আমার ওপরেই ছেড়ে দিলেন। যদিও স্পেশাল টাইপের পাথরের দাম ঠিক করার কাজটা তিনি নিজেই করতেন। বুঝতেই পারছেন, বয়েস তাঁর প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, তাই পরিশ্রমের কাজগুলো তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সপ্তাহে মাত্র দু-দিন কি তিন দিন দোকানে আসতেন। অর্থাৎ, দোকানের পুরো দায়িত্ব থাকত আমারই ওপর। অধীপ সান্যাল যেদিন আমাদের দোকান লুঠ করার মতলব করেছিল, সেদিন মিস্টার খান্না দোকানে ছিলেন না।

'দিনটা ছিল মঙ্গলবার। সময়, দশটার কিছু বেশি। সবেমাত্র আমি দোকান খুলেছি। দারোয়ান বাহাদুরকে সামনের একটা দোকানে পাঠিয়েছি চায়ের জন্যে। অর্থাৎ, গোটা দোকানটায় আমি একা। হঠাৎ দেখলাম, একজন বছর-পঁচিশ-ছাব্বিশের ছোকরা চকরা-বকরা চোখ-টাটানো জামা গায়ে দোকানে এসে ঢুকল। আমি ছেলেটাকে এতটুকুও সন্দেহ করিনি। কারণ, এমন অনেক লোকও আমাদের দোকানে আসে, যাদের পোশাক দেখলে রামধনুও লজ্জা পাবে। অথচ তাদের পকেটে থাকে হাজার-হাজার টাকার শৌখিন মণি-মুক্তো। মিস্টার খান্না বেশিরভাগ সময়েই তাদের কাছ থেকে পাথর-টাথর কিনতেন। সুতরাং, এই ছেলেটিকে দেখে আমিও কোনও হীরের ব্যাবসাদারই ভেবেছিলাম। কিন্তু যখনই ও আমার কাছে এসে হীরে-জহরত কিনবে বলে আমতা-আমতা করতে শুরু করল, তখনই আমি ছেলেটাকে সন্দেহ করলাম। অনেক আবোল-তাবোল বকবকানির পর ও বলল যে, ও একটা বড়-সড় হীরে কিনতে চায়। সেটা দিয়ে আংটি করিয়ে ও ওর লাভারকে প্রেজেন্ট করবে। আমি একটা ট্রে ড্রয়ার থেকে বের করে এনে কাউন্টারের ওপরে রাখলাম। ট্রে-তে অসংখ্য ছোট-ছোট পাথর তুলোর ওপরে সাজানো

ছিল। কেন জানি না, একটা আতঙ্ক আমার মনে উঁকি দিল। তাই ট্রে-টা আমি রাখলাম বিপদ-ঘন্টির বোতামের কাছাকাছি। বোতামটা মেঝেতে ঠিক আমার পায়ের নাগালের মধ্যে রইল। ছেলেটা বোধহয় টের পেল আমার মতলব। কারণ, সামনের আয়নায় চোখ পড়তেই দেখলাম ও পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করছে। পরমুহূর্তেই ও রিভলভারটা সোজা আমার বুক লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরল।

'সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল। শত চেষ্টাতেও মুখ দিয়ে কোনওরকম শব্দ করতে পারলাম না। অবশ্য তার দরকারও ছিল না। কারণ, আমি জানি, মিস্টার খান্নার সমস্ত সম্পত্তিই ইনশিয়োর করা। তাহলে শুধু-শুধু নিজের বিপদ ডেকে এনে লাভ কী? আমার চোখের সামনেই ট্রে-র সমস্ত পাথর ছেলেটা মুঠো করে পকেটে ভরে ফেলল। তারপর রিভলভার নাচিয়ে আর-একটা ট্রে বের করার জন্যে আমাকে হুকুম দিল। ও বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছিল। উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায়, অথবা ভয়ে, তা বলতে পারি না। তবে আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলাম ভয়েই। আর সেইজন্যেই দ্বিতীয় ট্রে-টা আমার কাঁপা আঙুলের বাঁধন ফসকে ঠিকরে পড়ল মেঝেতে, পায়ের কাছে। ছেলেটার নির্দেশেই আমি নিচু হয়ে ছিটকে পড়া পাথরগুলো তুলতে লাগলাম। আমার হাত তখন বিপদ-ঘন্টির বোতামের খুব কাছাকাছি। ঠিক বলতে পারি না, তবে অধীপ হয়তো ভেবেছিল আমি ওকে ফাঁকি দিয়ে বোতামটা টিপতে যাচ্ছি, কারণ, সেই মুহূর্তেই ও আমাকে গুলি করল।

'তার পরের ঘটনা আমার খুব স্পষ্ট মনে নেই। শুধু মনে আছে, অধীপ দৌড়ে পালানোর সময় দোকানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এরপর সেন্স ফিরে পাই অ্যাম্বুলেন্সে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। ঝাপসাভাবে মনে পড়ছে হাসপাতালের টানা বারান্দা। মাথার ওপরে চলন্ত আলোগুলো ক্রমশ পেছিয়ে যাচ্ছে। আমি স্ট্রেচারে অসহায়ভাবে শুয়ে আছি। আমাকে অপারেশান থিয়েটারে ঢোকানোর পর আর কিছুই মনে নেই। প্রায় ঘণ্টাতিনেক পর ঘুমের ওষুধের ঘোর কেটে গিয়ে আমার জ্ঞান ফিরল। দেখি পুলিশ অফিসাররা আমার স্টেটমেন্ট নেওয়ার জন্যে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের মুখেই শুনলাম, অধীপ সান্যাল পালাতে পারেনি। রিভলভারসুদ্ধ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু অধীপের গুলিটা যে আমার বুকেই রয়ে গেছে, সেটা আমি জানতে পারলাম পরের দিন। ডাক্তাররা অপারেশান করেও সেটা বের করতে পারেননি।

'এ পর্যন্ত সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এটাই—অন্তত আমার কাছে। গুলিটা লেগেছিল আমার বুকে, এবং অল্পের জন্যে হার্ট আর লাংসকে রেহাই দিয়ে পাঁজরের হাড়ে আটকে গেছে। কিন্তু এমন জায়গায় ওটা রয়েছে যে, ওটাকে বের করার কোনও উপায় আর নেই। কারণ, তাতে আমার হার্ট অথবা লাংসের ক্ষতি হতে পারে। ডাক্তাররা আমাকে

এক্স-রে ফটোগুলো দেখালেন। তারপর অ্যানাটমি নিয়ে বেশ লম্বা এক লেকচার দিলেন। তখনই আমি বুঝলাম, গুলিটা যে-কোনওদিন আমার বুকের পাঁজরের বাঁধন খুলে হৃৎপিণ্ড কিংবা ফুসফুসকে জখম করতে পারে—অর্থাৎ, আমাকে খুন করতে পারে।

'ডাকাতি এবং খুনের চেষ্টার চার্জে অধীপকে যখন অ্যারেস্ট করা হল তখনও আমি হাসপাতালে। তখন বহু লোকই আমার কাছে যাতায়াত করত। বিভিন্ন সার্জেনরা সময়ে-সময়ে এসে এক্স-রে সম্বন্ধে লেকচার দিতেন এবং ঘন-ঘন মাথা নাড়তেন। রিপোর্টাররা জানতে চাইল, একটা মৃত্যু পরোয়ানা বুকের মধ্যে নিয়ে চলে বেড়াতে আমার কীরকম লাগছে। তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজন তো যেতই। তারপর একদিন আইডেন্টিফিকেশানের জন্যে অধীপ সান্যালকে আনা হল আমার কাছে। আমি সরাসরি ওকে শনাক্ত করলাম।

'অধীপের বিচার যখন শুরু হল, তখন একটানা চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে হাসপাতালের ডাক্তাররা আমাকে মুক্তি দিলেন। আমাকে বলা হল, খুব সাবধানে চলাফেরা করতে, পরিশ্রমের সমস্ত রকম কাজ এড়িয়ে চলতে, আর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে। যত শান্তভাবে আমি দিন কাটাব, ততই আয়ু বাড়বে আমার, এ-কথাও তাঁরা জানাতে ভুললেন না। কিন্তু আমি জানতাম, ও সমস্তই ভুয়ো বুজরুকি, মিথ্যে সান্ত্বনা। ওই গুলিটা যে একদিন-না-একদিন আমাকে খুন করবে, সেটা বুঝতে আমার আর বাকি ছিল না। হয়তো এক সপ্তাহ, হয়তো এক মাস, বড়জোর এক বছর হয়তো গুলিটা আমাকে রেহাই দেবে—কিন্তু তারপর? সুতরাং, আমি নিজেকে তখন মৃত বলেই ধরে নিয়েছি।

'সরকারি উকিল জানতে চাইলেন, আমি অধীপের মামলায় সাক্ষ্য দেব কি না। আমি মৃদু হেসে সম্মতি জানিয়েছিলাম। কারণ, আমি মনে-প্রাণে চেয়েছি অধীপের শাস্তি হোক —এবং সেই শাস্তি যাতে লঘু না হয়, তার জন্যে আমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে। আমার সাক্ষ্যের পর অধীপ সান্যাল আর রেহাই পাবে না। সেদিনটা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। কোর্টের প্রায় অর্ধেক আসন জুড়ে অধীপের আত্মীয়-স্বজন হাজির, এবং তারা এমনভাবে কান্নাকাটি করছিল, যেন আদালতে অধীপের বিচার নয়, শ্মশানে তার শবদাহ দেখতে এসেছে। মনে হয়, খুব বড়-সড় জয়েন্ট ফ্যামিলির ছেলে ছিল অধীপ। তাদের কান্নাকাটিতে, গন্ডগোলে, বিরক্ত হয়ে জজসাহেব তাদের কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অর্ডার পর্যন্ত দিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষের, অর্থাৎ আসামি পক্ষের, উকিল অধীপের অল্প বয়েস এবং প্রথম অপরাধের ওপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সে বৃথাই। আমি কাঠগড়ায় ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই অধীপের নিয়তি অন্ধকার ভবিষ্যতে ওকে ঠেলে দিল।

'আদালতের রায় তো আপনি জানেন! অধীপকে বিশ বছরের জেল দেওয়া হয়। আসলে ও একজন খুনি, ওর ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আইনের মারপ্যাঁচে পড়ে এবং এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিচারক তাকে চরম শাস্তি দিতে পারেননি। কারণ, আমি

এখনও নিজের পায়েই চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি, দিব্বি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, বুকে গুলিটা থাকা সত্ত্বেও।

'কিন্তু অধীপের ওই শাস্তিকে আপনি মোটামুটিভাবে টেম্পোরারি বলতে পারেন। কারণ, এত সহজে ও ছাড়া পাবে না। যদি আমার বুকের বিশেষ জায়গায় ওই গুলিটা আটকে না থাকত, তাহলে হয়তো বিশ বছর কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে অধীপ সান্যাল জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। নতুন করে জীবন শুরু করতে পারত। কিন্তু যত গোলমাল বাধালো এই গুলিটা। একদিন-না-একদিন ওটা আমাকে খতম করবেই। আর যখন করবে, তখনই অধীপ সান্যাল হয়ে যাবে একজন নৃশংস খুনি। আবার নতুন করে ওর বিচার শুরু হবে। হয়তো তাতে চরম দণ্ডই ওর কপালে জুটবে।

'কী বিচিত্র ব্যাপার, তাই না? আলিপুর জেলে বসে ওকে নিশিদিন আমার আয়ু কামনা করতে হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তারদের বক্তব্য অনুযায়ী শুধু অধীপ কেন, শত-সহস্র লোকের প্রার্থনাতেও আমার কিছু হওয়ার নয়। গুলিটা তার কাজ করবেই। আর— একবার যদি আমি মারা যাই, তাহলে আবার শুরু হবে কোর্ট-কাছারি। সম্পূর্ণ নতুন অপরাধে অধীপের আবার বিচার হবে। সরকারি উকিল আমাকে বলেছিলেন, এ-বিচার একই অপরাধে দ্বিতীয়বার বিচার নয়, ফার্স্ট ডিগ্রি খুনের দায়ে সম্পূর্ণ নতুন চার্জে বিচার হবে। মনে হয় না, তখন অধীপ ফাঁসির দড়িকে খুব সহজে ফাঁকি দিতে পারবে।

অনাদি শিকদার কথা বলছিলেন, একইসঙ্গে সাবধানী পা ফেলে ধীরে-ধীরে পায়চারি করছিলেন। কথা শেষ করে তিনি খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের পরিবেশে চোখ রাখলেন। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। গোলাপি আকাশের গায়ে দু-একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ইশারা। উড়ন্ত পাখির শিল্যুট তাঁর চোখে ছায়া ফেলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অনাদি শিকদার।

'আপনার পক্ষে সত্যিই এ এক প্যাথেটিক সিচুয়েশান।' গাঢ় স্বরে বললেন রিপোর্টার, 'আমি সত্যিই দুঃখিত, মিস্টার শিকদার। কিন্তু আপনি অধীপ সান্যালের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো! আমার তো মনে হয়, আপনার চেয়ে ওর অবস্থা আরও শোচনীয়, আরও করুণ।'

'তাতে আমার বয়েই গেল।' ঘৃণায়, ব্যঙ্গে, বিকৃত হল অনাদি শিকদারের শীর্ণ মুখ 'অধীপের পরিণতির জন্যে অধীপ নিজেই দায়ী।'

'একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে আপনার কথাই ঠিক।' রিপোর্টার কপট সমর্থনে বলে উঠলেন, 'সত্যিই তো, অধীপের জন্যে আপনি ভাববেন কেন!'

রিপোর্টার ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন অনাদি শিকদারের ঠিক পিছনে। তাঁর কনুইয়ে হাত রেখে বললেন, 'আমি সত্যিই দুঃখিত।' তারপর এক ধাক্কায় অনাদি শিকদারকে

জানলার চৌকাঠের ওপারে ঠেলে দিলেন তিনি।

ভারসাম্য হারিয়ে অনাদি শিকদার চৌকাঠ ধরে অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগলেন। তিনি অবাক হয়ে তাকালেন রিপোর্টারের মুখের দিকে। জানলার নীচেই চোখে পড়ছে কার্নিশটা। তার বহু নীচে ছোট-ছোট আলোর বিন্দু, চলমান পথিক, গাড়ি-ঘোড়ার কলগুঞ্জন।

অনাদি শিকদার পা ছুড়তে গিয়ে টের পেলেন, তিনি এখন শূন্যে—চৌকাঠ কখন যেন হাত থেকে পিছলে গেছে।

কার্নিশে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়বার মুহূর্তে তাঁর মুখ আতঙ্কে বিস্ফারিত হল। দু-চোখে বিস্ময় নিয়ে তিনি রিপোর্টারের তরুণ মুখের দিকে তাকালেন। সে কি প্রাণের আশায়, নাকি কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার আশায়?

'আমি রিপোর্টার নই।' ভদ্রলোক ঠান্ডা গলায় বললেন, 'অধীপ সান্যাল আমার ভাই।'

কিন্তু শেষ কথাগুলো শোনার জন্য অনাদি শিকদার তখন আর অপেক্ষা করে নেই। তীরবেগে তিনি নীচের পাথর বসানো ফুটপাথ লক্ষ্য করে ছুটে চলেছেন।

মাটি স্পর্শ করার মুহূর্তে তাঁর হঠাৎই মনে হল, বুকের গুলিটা যেন বাঁধন মুক্ত হয়ে তার হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করেছে। সেটা রিপোর্টারের আচমকা ধাক্কা দেওয়ার জন্য, না তার সবেগ পতনের জন্য সেটা তিনি ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। তার আগেই ফুটপাথ স্পর্শ করলেন।

(খুনি) তুমি রবে নীরবে

নীতু মেহতা

নীতু মেহতার মৃতদেহটা যখন রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয় তখন সুদেশ সেখানে ছিল না। কিন্তু রতনলাল ছিল। সে-কথা ওদের বলতে গিয়ে ঝিকিয়ে উঠেছিল রতনলালের কালো চোখ, ঝলসে উঠছিল হিংস্র দাঁতের সারি। রাহুল দস্তিদার চাপা স্বরে শাসিয়ে উঠল, রতন, রতন, আস্তে! লোকে শুনতে পাবে।

রাহুল দস্তিদার—রাহুলদা—ওদের নেতা। সবাই ওর কথা শোনে। রতনলালও শুনল।

ওরা বসেছিল একটা রেস্তরাঁয়। ওরা যখন আলোচনার জন্য জমায়েত হয়, তখন লোকজনের ভিড়ের মাঝেই আশ্রয় খুঁজে নেয়। লুকিয়ে কোনও গোপন জায়গায় সাক্ষাৎকারের চেয়ে চোখের সামনে থাকাটাই ভালো। তাতে গোয়েন্দা-পুলিশের নেকনজরটা কম পড়ে। কিন্তু সময়ে-সময়ে যে পোড়ো আস্তানায় দেখা করতে হয় না তা নয়।

রতনলালের স্বর আলতো হল। হল আরও হিংস্র। ও বলল, নীতুর কোনও আঙুলে নখ ছিল না। আঙুলগুলো ভেঙেচুরে চৌচির। আর—আর মাথায় একটা মস্ত গজাল ফুঁড়ে ছিল।

সুদেশ হুদা কেঁপে উঠল। এ সবই ওরা জানে, আগেই কানে এসেছে। কিন্তু তবুও ওদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে ত্রাসের উলঙ্গ ছায়া। নীতু মেহতা ওদেরই একজন ছিল। ওকে মেরে ফেলা হয়েছে, এবং একইসঙ্গে সেই বীভৎস মৃতদেহ রাস্তায় ছুড়ে ফেলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে দলের বাকি সবাইকে।

সামনে পড়ে আছে চায়ের কাপ, ওমলেট। খাওয়ার ইচ্ছে মিলিয়ে গিয়ে গা গুলিয়ে উঠছে। চারপাশের গুঞ্জন ওদের কানে আসে না। ওরা শুধু শুনতে পায় নিজেদের হৃৎপিণ্ডের শব্দ—টিক-টিক-টিক। জীবনের ঘড়ি চলছে। এখনও।

সুদেশ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আড়চোখে তাকায় কাছে-বসা পুতুল বক্সীর দিকে। ওর মুখের রং মিলিয়ে গেছে। সুদেশ অবাক হয়। মেয়েটা কেন তাদের দলে এল? আরও অবাক হয় এই ভেবে, রাহুল দস্তিদারের দলে এসে কীভাবে ও পুতুলের প্রেমে পড়ল!

রাহুল তখন নীচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। অর্থাৎ, ও এখন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। স্টিল ফ্রেমের চশমার আড়ালে ওর চোখে এক কুৎসিত দ্যুতি।

রাহুলের চেহারা রোগার দিকে। শরীরে এমন কিছু শক্তিও নেই। কিন্তু সে য়ুনিভার্সিটির এক তুখোড় ছাত্র এবং সুদেশের ধারণা, যে-গঠনমূলক বিপ্লব বিস্ফোরণের পথে এগিয়ে চলেছে, তার পিছনে অনেকটাই কাজ করেছে রাহুল দস্তিদারের মাথা।

এ ভালো কথা নয়,—বিড়বিড় করে বলল রাহুল, এ মোটেই ভালো কথা নয়। নীতু...।

মানে নীতু ওদের কাছে গান গেয়েছে?—প্রশ্ন করল ফিদা জয়শওয়াল, পুলিশ তাহলে আমাদের খবর জানতে পেরে গেছে?

নীতু গান গাইবার ছেলে নয়,—কঠিন স্বরে ফিদার সন্দেহের উত্তর দিল রতনলাল, ওদের হাজার টরচারেও ও মুখ খুলবে না—আমি জানি।

মানুষের সইবার একটা লিমিট আছে।—ফিদা মন্তব্য করল।

না, নীতু কথা কইবার ছেলে নয়।—রতনলাল আবার বলল, এ আমি জান বাজি রেখে বলতে পারি।

শুকনো স্বরে মুখ খুলল রাহুল দস্তিদার, সে-বাজি শুরু হয়ে গেছে, রতন। নীতু গেছে। এবার আমাদের পালা। বাজিতে তোমার জিত হোক তা-ই সবাই চায়।

ফিদা জয়শওয়ালের চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। যেন গোয়েন্দা-পুলিশ এখনই ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে।

কী করে জানব নীতু সবাইকে ফাঁসায়নি?—ফিদার কণ্ঠস্বর উষ্ণ, আমাদের এখন লুকিয়ে থাকাটাই ঠিক হবে।

তার মানে, নীতুর সঙ্গে যে আমাদের কানেকশান ছিল সেটা গোয়েন্দা-পুলিশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।—চাপা অথচ শান্ত গলায় এ-মন্তব্য পুতুল বক্সীর। ওর মুখের রং ফিরে এসেছে। সুদেশ সেটা লক্ষ করল। তেজি জেনানা! ওর সহ্য শক্তি সম্পর্কে সুদেশের অনুমানে তাহলে ভুল হয়েছিল!

রাহুল প্রশংসার চোখে পুতুলের দিকে তাকাল।

পুতুল ঠিক বলেছে, ফিদা। আমাদের এখন ভয় পেলে চলবে না। এখন মাথা ঠিক রাখতে হবে।—সে তাকাল সুদেশ হুদার দিকে। পুরু লেন্সের পিছনে রাহুল দস্তিদারের চোখ জ্বলছে: তুমি কী বলো, সুদেশ? একেবারে চুপচাপ যে?

সুদেশ কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, পুলিশকে এখনই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

ফিদা জয়শওয়াল তীব্র ব্যঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, নীতু যেমন ভেবেছিল!

সাপের চোখে ফিদার দিকে তাকাল সুদেশ। ওরা পরস্পরকে মোটেই পছন্দ করে না।

সুদেশ বলল, নীতু এখন সব আলোচনার বাইরে। সব সাহায্যের বাইরে। তবে আমার ধারণা, নীতু আমাদের কথা পুলিশকে বলেনি।

রাহুল তীক্ষ্ণ কৌতূহলে সুদেশকে খুঁটিয়ে দেখছিল—নীচের ঠোঁটে দাঁতের কামড়। তারপর বলল, তোমার এ ধারণার কারণ, সুদেশ?

এ তো অত্যন্ত স্পষ্ট। নীতু যদি সব ফাঁস করে দিত, তাহলে ওর ডেডবডি রাস্তায় ছুড়ে ফেলে পুলিশ আমাদের অ্যালার্ট করে দিত না। ওরা প্রথমে আমাদের অ্যারেস্ট করত।

রাহুল দস্তিদার আঙুলে টুসকির শব্দ করল সারা সন্ধের এই একটা দামি কথা। নীতু আমাদের নাম বলেছে কি বলেনি তার উত্তর হল, আমরা এখনও জেলের বাইরে। নীতু আমাদের নাম বলে থাকলে এতক্ষণে নীতু মেহ্‌তার দাওয়াই আমাদের ওপর চালু হয়ে যেত। নীতুকে যে অমানুষিক অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে, সেটা আমাদের জানিয়ে পুলিশ বোকামি করত না—। রাহুলের চোখ পিছলে গেল কাছাকাছি বসা এক যুবকের ওপর। সে খেতে-খেতে হঠাৎই চোখ তুলে তাকিয়েছিল ওদের দিকে।—ঢের হয়েছে। এবার উঠে পড়া যাক। নইলে সবাই আমাদের নজর করতে শুরু করবে। আবার আমাদের দেখা হবে। তবে, কোথায়, কখন, পরে জানিয়ে দেওয়া হবে...।

সুদেশ হুদা

রাহুল আর সুদেশ পুতুলকে বাসে তুলে দিল। ফিদা আর রতনলাল নিজের-নিজের ডেরায় চলে গেছে। পুতুলের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল সুদেশের। কিন্তু নীতুর ভয়াবহ পরিণতি যেন ওদের মাঝে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শুধু নীরবে হাতে চাপ দিয়ে পুতুলকে বিদায় দিয়েছে সুদেশ।

বাস ছেড়ে দেওয়ার পর নিজেকে ভীষণ একা মনে হল সুদেশের। মন হয়ে উঠল বিষণ্ণ। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর মনে পড়ল, দলের কথা, বর্তমান পরিস্থিতির কথা, নিজেদের লক্ষ্যের কথা।

রাহুল দস্তিদার সুদেশের কাঁধে হাত রাখল : চলো, সুদেশ। চায়ে একটু গলা ভেজানো যাক। কথা আছে।

সামান্য হাঁটা-পথ পেরিয়ে একটা নির্জন চায়ের দোকান ওদের চোখে পড়ল। ভেতরে ঢুকে দু-কাপ চা নিয়ে বসল দুজনে। রাহুল চায়ের কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। চায়ে চুমুক দিয়ে বেশি গরম বলে মনে হল সুদেশের। অথচ গরম চা ওর প্রিয়। তবে আজ কেন...।

রাহুল সুদেশের দিকে তাকিয়ে। চশমার পিছনে ওর চোখ অগ্নিময়।—সুদেশ, আমাদের ভেতর একজন ইনফরমার আছে।

সরাসরি এই মন্তব্যে সুদেশ প্রচণ্ড চমকে উঠল, কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। রাহুলের সেটা নজরে পড়ল। সে হাসল হালকাভাবে।

তুমিও যে এ-কথা ভাবোনি, সে-কথা আমাকে বোলো না, সুদেশ। এ ছাড়া নীতুর অ্যারেস্ট হওয়া বা মৃত্যুর কোনও সঠিক ব্যাখ্যা নেই—থাকতে পারে না।

কিন্তু—কিন্তু, এ যে অসম্ভব!

উজ্জ্বল ময়াল-চোখ সামান্য তীক্ষ্ণ হল চশমার আড়ালে।—কেন? অসম্ভব কেন? যদি ইনফরমার কেউ থেকেই থাকে, তাহলে সে শুধু নীতুর খবরই পুলিশকে জানাল

কেন? সবাইকে কেন ধরিয়ে দিল না?

মাথা নাড়ল রাহুল, ঠোঁটের ওপর তীব্র হল ওর দাঁতের কামড়।—ঠিকই বলেছ, সুদেশ। হয়তো সে নীতুর খবর পুলিশকে জানাতে বাধ্য হয়েছিল। হয়তো নীতু সেই ইনফরমারকে চিনে ফেলেছিল, তাই সে নিজেকে বাঁচাতে নীতুকে ধরিয়ে দেয়।

তাহলে নীতুকে ওরকম বীভৎসভাবে টরচার করা হল কেন?

রাহুল কাঁধ ঝাঁকাল, ওর ঠোঁট শক্ত হল।—এদেশের পুলিশরা স্যাডিস্ট। একটা কসাইয়ের কর্মচারীরা এর চেয়ে বেশি কী হবে?

রাহুল দেশনেতাকে কখনও নাম ধরে সম্বোধন করে না। বলে কসাই, অথবা বিশ্বাসঘাতক। দেশের রক্তচোষা।

সেই ইনফরমার আমাদের সম্পর্কে আর নতুন কী জানতে চায়?—সুদেশ প্রশ্ন করল।—আমরা কী, কে, তা তো সে ভালোভাবেই জানে।

সে জানতে চায় আমাদের বিস্ফোরণের দিনটা—কোন দিন আমরা আক্রমণ করব এই দুর্নীতিভরা শাসন ব্যবস্থাকে। এ ছাড়া রয়েছে আমাদের আসল নেতাদের নাম-ঠিকানা। তাঁদের পরিচয় আমিও ঠিকঠাক জানি না। তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ একজন মিড্‌লম্যানের মাধ্যমে।

সুদেশ সতর্কভাবে লক্ষ করছে রাহুল দস্তিদারকে।

আর কাউকে তোমার এ-সন্দেহের কথা বলেছ? বলেছ ইনফরমারের কথা?

ক্ষুরধার হাসি ফুটে উঠল রাহুলের ঠোঁটে, এবং মিলিয়েও গেল।

তোমাকেই প্রথম বললাম, সুদেশ।

কেন? আমাকে কেন?

আবার সেই হাসি : দলের মধ্যে তুমি একটু অন্যরকম, সুদেশ। তুমি আমাদের দেশের লোক নও। এখানে পড়তে এসেছো সুদূর মিড্‌ল ইস্ট থেকে। আমাদের দলে তোমার যোগ দেওয়ার কারণ স্পষ্ট এবং তীব্র। আমাদের বিরুদ্ধে ইনফরমারগিরির জন্যে তুমি এত কষ্ট করে আমাদের দলে আসবে এ সম্ভাবনা কম। তোমার প্রাণ দেশপ্রেমীর প্রাণ।

ধন্যবাদ রাহুলদা।—সুদেশ হাসল।—আমি তাহলে সন্দেহের বাইরে আছি?

আমরা কেউই সন্দেহের বাইরে নই, সুদেশ।

বিশেষ কাউকে তোমার সন্দেহ হয়?

তোমার হয়?

সুদেশ চোখ ছোট করে রাহুলের দিকে তাকাল আমাকে দিয়ে কী বলাতে চাও, রাহুলদা?

আবার হাসি।—যে-কোনও একজনের নাম করো। মনে রাখবে, আমরা কেউই সন্দেহের বাইরে নই। সুতরাং, একজনের নাম করো। যে-কোনও একজনের।

এর কোনও মানে হয়?—সুদেশ রুঢ়া বলল, তুমি তো জানো, ফিদাকে আমি পছন্দ

করি না। ওর নাম বললাম, কারণ, ওকে আমার ভালো লাগে না। ও ইনফরমার কিনা জানি না—তবে হতেও পারে।

ফিদা।—আস্তে-আস্তে উচ্চারণ করল রাহুল দস্তিদার। ঠোঁট কামড়ে ধরল দাঁতে।—হতে পারে। ইনফরমার আছে কি না-আছে জানার আগে থেকেই ফিদাকে আমার সন্দেহ হত। বড় বেশি নার্ভাস—ওকে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। দেখেছ, নীতুর খবর শুনে কীরকম লুকিয়ে পড়ার কথা বলছিল? অন্য কারও নাম বলো।

সুদেশ ইতস্তত করতে লাগল।—রতনলাল? আমার মনে হয় ইনফরমারগিরির বুদ্ধি ওর নেই।

হয়তো সেটা ওর অভিনয় হতে পারে! কারণ, কখনও-কখনও ওকে বেশ বুদ্ধি খেলাতে দেখেছি। চালাকিটা চমৎকার। ওপর-ওপর এক বোকা-সোকা গোবেচারা ছাত্র। নেহাতই আমার শেখানোর ঠেলায় আর পরীক্ষার হলে টোকাটুকির জোরে পাশ করে। কেই-বা ওকে সন্দেহ করবে? অন্য কারও নাম করো, সুদেশ।

আর কে আছে?

হালকা হাসির লক্ষ্য এবার সুদেশ।—সবে তো শুরু করেছ, সুদেশ।

আমি...আমি।—বলল সুদেশ, কিন্তু তুমিই তো বলেছ, আমি সন্দেহের বাইরে।

ভুল করছ, সুদেশ। আমি বলেছি, আমরা কেউই সন্দেহের বাইরে নই।

সুদেশ রাহুল দস্তিদারের দিকে তাকিয়ে হাসল রাহুলদা, আমি কি নিজের সাফাই নিজেই গাইব? তিন মাস আগে আমি মিড্‌ল ইস্ট থেকে এসেছি। আমার পাসপোর্ট, কাগজপত্র, সব হোস্টেলের ঘরে আছে। পুলিশ কি আমার মতো একজন বিদেশিকে তোমাদের দলে ইনফরমার হিসেবে ঢোকানোর ঝুঁকি নেবে?

তাই বুঝি?—চশমার কাচের আড়ালে রাহুল দস্তিদারের চোখজোড়া ঝিকিয়ে উঠল। সুদেশ শুদার সেটা নজর এড়াল না।—সুদেশ, তুমি আইন-পালানো দাগি হতে পারো। এখানকার গোয়েন্দা-পুলিশ এইরকম দাগিদেরই ইনফরমার হিসেবে পছন্দ করে।

আমি? দাগি?—সুদেশের বিস্ময়ে ওরা দুজনেই হেসে উঠল।

রাহুল হাত বাড়িয়ে মৃদু চাপড় মারল সুদেশের হাতে।

আমার কথাগুলো মনে রেখো, সুদেশ। আমরা কেউই সন্দেহের বাইরে নই। এমনকী আমিও।

চেয়ারে হেলান দিয়ে রাহুলের চোখে চোখ রাখল সুদেশ।

তুমি?

মাথা নাড়ল রাহুল।—কেন নয়? সেটাই তো হবে সত্যিকারের চালাকি। যে-লোকটা সব সন্দেহের বাইরে—আমি—সেই হল গিয়ে আসল লোক। আক্রমণের দিনটার কথা আমিই প্রথম জানব। আমাদের দলের উঁচুতলার নেতাদের আমিই খানিকটা হয়তো চিনি।

রাহুলদা।—সুদেশ বলল।—এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না। আমি জানি,

এই বিপ্লবের জন্যে তোমার দরদ কতখানি। তুমি কখনও বিট্রে করতে পারবে না। যদি আমাদের মধ্যে ইনফরমার কেউ থেকেই থাকে, তবে সে হয় রতনলাল, নয় ফিদা।

আমার কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, সুদেশ। আমি বলেছি, আমাদের কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। এখনও একজন বাকি আছে যার নাম আমরা এখনও তুলিনি।

সুদেশ হুদার দু-চোখে তীব্র আতঙ্ক।

অসম্ভব, রাহুলদা! পুতুল হতে পারে না।

সেও তো আমাদেরই একজন।—মাথা নেড়ে বলল রাহুল।

তুমি ঠাট্টা করছ।

রাহুল দস্তিদারের ঠোঁটের রেখা হিংস্র হল। বলল, নীতু মেহতার সঙ্গে কেউ ঠাট্টা করেনি।

সুদেশ হিংস্র স্বরে জবাব দিল, পুতুলকে নিয়েও ঠাট্টা চলে না।

তুমি ওকে ভালোবাসো, তাই না, সুদেশ?—শান্ত গলায় বলল রাহুল, বড়ই দুঃখের কথা যে, ভালোবাসা অন্ধ হয়।

সুদেশ চোখ নামিয়ে তাকাল চায়ের কাপের দিকে। চা এখন ঠান্ডা। সুতরাং, সুদেশের জিভে বিস্বাদ ঠেকবে। ওর চোখের সামনে পুতুলের মুখ। মনে-মনে ওর ঠোঁটের স্পর্শ, শরীরের উষ্ণতা, আর একইসঙ্গে ওকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছে...সব মিলিয়ে এক বিষণ্ণতা ঘিরে ফ্যালে সুদেশ হুদাকে। এই রাজনীতির মধ্যে পুতুলের আসার কী দরকারটা ছিল?

সুদেশের রাগ হল। হিংসা, প্রতিহিংসা, রাজনীতি, বিপ্লব—এসব পুরুষদের কাজ। পুতুল তো ওর পড়াশোনা নিয়ে থাকতে পারত, পারত না?

হঠাৎই সুদেশের মনে পড়ল, পুতুল যদি রাহুলদার দলে না থাকত তাহলে সুদেশ এসে কোনওদিনই ওর দেখা পেত না। গড়ে উঠত না ওদের এই অদ্ভুত ভালোবাসা।

হ্যাঁ, ভালোবাসি।—রাহুলের দিকে চোখে রেখে সুদেশ বলল, ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, রাহুলদা। সেইজন্যেই বলছি, ওকে সন্দেহ কোরো না। অন্য কাউকে সন্দেহ করো, আমাকে করো, কিন্তু ওকে না। আমাদের বন্ধুত্বকে বন্ধুত্বের মধ্যেই ধরে রাখো, রাহুলদা।

রাহুল দস্তিদারের চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি।

তোমার জন্যে দুঃখ হয়, সুদেশ। তোমরা ইরানিরা বড় অদ্ভুত। আমরা অন্যরকম—অন্তত আমি। কোনও মেয়ে আমার নজর কাড়ে না। এই বিপ্লবই আমার মা, বোন, বউ—সব। বলতে পারো এই বিপ্লবের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছে। সেই কারণেই পুতুল বক্সীকেও আমি সন্দেহের চোখে দেখি। সে পুরুষ কি মেয়ে তা দেখি না। আমি দেখি, সে আমাদেরই একজন, অতএব সন্দেহের বাইরে নয়।

আর কোনও কথা আমি শুনতে চাই না।—উঠে দাঁড়াল সুদেশ।

রাহুল দস্তিদার চারপাশে তাকাল। দোকানে ইতিমধ্যেই আরও কয়েকজন খদ্দের ঢুকেছে।

হ্যাঁ, সেই ভালো। আমদের কথাবার্তা ক্রমশ উঁচু পরদায় উঠছে।

চশমার কাচ ভেদ করে সুদেশের দিকে তাকাল সে।—**আবার আমাদের দেখা হবে...** শিগগিরই...দলের আস্তানায়।

কোনও কথা না বলে নিষ্ক্রান্ত হল সুদেশ হুদা।

সুদেশ হুদা বাড়ি ফিরতেই খবর পেল, একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা ইরানের লোক।

আপনার দেশ থেকে এসেছেন।—প্রতিবেশী মহিলা বললেন সুদেশকে। তাঁর চোখে-মুখে কৌতূহলের ছাপ।—যাতে ভুলে না যাই সেজন্যে তাঁদের নাম-ধাম লিখে রেখেছি—এই যে।

এক টুকরো কাগজ সুদেশের হাতে তুলে দিলেন তিনি। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গার্জি। কসমোপলিটান হোটেল। রুম নাম্বার চারশো পাঁচ।

কাগজটা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে ফেলল সুদেশ।

কী হল, ঠিকানাটা আপনার লাগবে না?—মহিলাটি প্রশ্ন করলেন।

না। মনে থাকবে।

ওঁদের তাহলে আপনার ভালোমতো মনে আছে? ওঁরা বলছিলেন, আপনাদের ফ্যামিলির সঙ্গে নাকি ওঁদের জানাশোনা আছে। এদেশে বেড়াতে এসে তাই ভাবছিলেন আপনার সঙ্গে একটু দেখা করে যাবেন। সত্যি, দূর-দেশে চেনা লোক পাওয়া মানে...।

হাতে স্বর্গ পাওয়া।—সুদেশের গলায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর।

আপনি ঠিক দেখা করবেন কিন্তু। ওঁরা অনেক করে বলে গেছেন।

কাল দেখা করব। এখন পড়াশোনা আছে। খবরটা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।

আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল সুদেশ হুদা

ফিদা জয়শওয়াল

সেই রাত্রেই ফিদাকে অনুসরণ করল সুদেশ।

ফিদা ওকে দেখতে পায়নি। রাস্তায় অনেক লোকের ভিড়। সুতরাং, নিজেকে গোপন রেখে অনুসরণে কোনও অসুবিধেই হয়নি।

ফিদার চালচলন এখন খেয়ালি, উদ্দেশ্যহীন। একটা দোকান থেকে একটা কোকাকোলা কিনে গলায় ঢালতে শুরু করল সে। তারপর একটা ম্যাগাজিন-স্টলে দাঁড়িয়ে দু-একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে দেখল। একটা সিনেমা হলের সামনে কিছুটা সময় কাটিয়ে একটা ছোট রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়ল ফিদা।

ফিদার সামনে চায়ের কাপ। চোখ চায়ের কাপে। মন অন্য কোথাও। ওর কপালে গভীর চিন্তার রেখা। সে-চিন্তায় কি নীতু মেহতা আর নাম-না-জানা ইনফরমার জায়গা

করে নিয়েছে? ভাবল সুদেশ। একটা থামের আড়ালে একটা টেবিলে বসেছে সুদেশ। গোপনে লক্ষ রাখছে ফিদা জয়শওয়ালের ওপর।

চায়ের কাপে টোকা মারছিল সুদেশ হুদা। তখনই সে দেখতে পেল জগদীশ আম্বাস্তাকে।

নেশা করা চোখ নিয়ে কালো জলহস্তিমার্কা জগদীশ আম্বাস্তা রেস্তরাঁয় ঢুকেছেন। তাঁর বেজির মতো চঞ্চল চোখ পিছলে যাচ্ছে প্রতিটি লোকের মুখে। পুলিশ বিভাগের চরম কুখ্যাত অফিসার জগদীশ আম্বাস্তা। রাহুল দস্তিদারের দলে ঢোকার কয়েকদিন পরেই জগদীশকে চিনিয়ে দিয়েছিল রাহুলদা। গোয়েন্দা-পুলিশের দলে সবচেয়ে নৃশংস স্যাডিস্ট এই জগদীশ। বিপ্লব সফল হলে এঁর জন্য বিশেষ 'পুরস্কার' তাকে তুলে রেখেছে রাহুলদা। নীতু মেহতার করুণ ধ্বংসের মূলে জগদীশ আছেন বলেই সকলের ধারণা।

জগদীশ সাদা পোশাকে আছেন। গিয়ে বসলেন ফিদার মুখোমুখি। ফিদার শরীর হাই ভোল্টেজ শকে শিউরে উঠল—সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য। কিন্তু সুদেশের সেটা নজর এড়াল না।

ফিদা চিনতে পেরেছে জগদীশকে।

জগদীশ পকেট থেকে একটা ছোট বোতল বের করলেন। সকলের চোখের সামনেই ভেতরের তরলটুকু গলায় ঢাললেন। জগদীশকে সকলেই চেনে। কয়েক জোড়া ভয়ার্ত চোখ ছিটকে এল কুচকুচে কালো লোকটার দিকে। ফিদা চটপট ওর চা শেষ করল। তখনই জগদীশ কী যেন বললেন ওকে। তারপর বোতলটা পকেটে রেখে একটা চুরুট বের করলেন। ফিদা একটা দেশলাই এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। গোটাকয়েক কাঠি নষ্ট করে চুরুট ধরালেন জগদীশ। তিনি ফিদাকে আরও কী যেন বললেন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিদা তাকাল দরজার দিকে। জানোয়ারের মতো হাসলেন জগদীশ, খামচে ধরলেন ফিদার কাঁধ। ফিদা কাষ্ঠ হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল। হেসে কী যেন বললেন জগদীশ। ফিদা বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

সুদেশও উঠে দাঁড়িয়ে অনুসরণ করল ফিদাকে।

ফিদা চটপট পা চালাল রাতের পথ ধরে।

নিজের আস্তানার কাছে পৌঁছে ওর চলার শব্দ আয়েসি হল। বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল ফিদা। সুদেশ অপেক্ষা করতে লাগল রাস্তায়। রাস্তার অল্প আলোয় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সুদেশের তেমন কষ্ট হল না। তারপর আলো জ্বলে উঠল ফিদার ঘরে।

তোমার নজরদারির প্রশংসা করতে হয়, সুদেশ।

বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো ঘুরে দাঁড়াল সুদেশ। ওর গলা চিরে বেরিয়ে এল এক চাপা চিৎকার—ওর অনিচ্ছাসত্ত্বেও। নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ানো আগন্তুকের ওপর যখন চিতাসুলভ ক্ষিপ্রতায় ও ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখনই ও চিনতে পারল মানুষটাকে।

রাহুল দস্তিদার।

অল্প আলোয় ওর চশমার কাচ চকচক করছে।

রাহুলদা! তুমি এখানে কী করছ?—ফিসফিস করে বলল সুদেশ।

তোমাকেও তো একই প্রশ্ন করতে পারি।

আমি ফিদাকে ফলো করছিলাম।

আর আমি তোমাকে।

বিস্ময়-দৃষ্টিতে রাহুল দস্তিদারের দিকে চেয়ে রইল সুদেশ। রাহুল নিঃশব্দে হাসল।

সন্ধেবেলা তোমাকে ডাকতে গিয়েছিলাম,—রাহুল বলল, কিন্তু তুমি বাড়িতে ছিলে না। পাশের ঘরের এক ভদ্রমহিলা বললেন, তুমি বোধহয় কসমোপলিটান হোটেলে গেছ তোমার দেশের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর পথে তোমার দেখা পেয়ে ফলো করতে শুরু করলাম। পরে বুঝলাম, তুমি ফিদাকে ফলো করছ। সুতরাং, কোনও জানান না দিয়ে দেখতে লাগলাম কী হয়।

তুমি সবই দেখেছ তাহলে?—সুদেশ জানতে চাইল, ফিদা আর জগদীশকে দেখেছ?

হ্যাঁ, দেখেছি।

তাহলে তো সবই বুঝতে পারছ।

কী বুঝতে পেরেছি?

যে ফিদাই সেই ইনফরমার!

ফিদার ঘরের জানলার আলোর দিকে রাহুল দস্তিদারের চোখ স্থির। ঠোঁটের ওপর দাঁতের সেই পুরোনো খেলা।

আজ রাতে যা দেখেছ তার জোরেই বলছ যে, ফিদা ইনফরমার?

জগদীশ আম্বাস্তা ওর সঙ্গে কথা বলেছে। সে ফিদাকে চেনে, কিন্তু ওকে অ্যারেস্ট করছে না। কেন?

আমার তো মনে হয়েছে, জগদীশ আম্বাস্তা ফিদার কাছে দেশলাই চাইছিল।

সেই দেশলাইর সঙ্গে কি কোনও সাংকেতিক খবর হাতবদল হতে পারে না? চুরুট ধরাতে জগদীশের অনেক বেশি সময় লেগেছে। কোনও খবর হাতবদল করতে তার বেশি সময় লাগে না।

ফিদার ঘরের আলো নিভে গেল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল রাহুল দস্তিদার।

তোমার কয়েকটা কথা ভাববার মতো সুদেশ। কিন্তু তা বলে ফিদা যে নির্দোষও হতে পারে সে-কথা ভুলে যেয়ো না। সেই ইনফরমার অন্য কেউও হতে পারে।

রতনলাল?—অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল সুদেশ। তারপর আরও অস্পষ্ট স্বরে যোগ করল, পুতুল?

রাহুল পকেট থেকে হাত বের করে হাওয়ায় দোলাল।

সেইজন্যেই আজ তোমার কাছে গিয়েছিলাম। ক্ষমা চাইতে। এই নয় যে, পুতুলকে আমি সন্দেহ থেকে পুরোপুরি বাদ দিয়েছি। সেটা সম্ভব নয়। কারণ, অনেকগুলো লাইফের ব্যাপার। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব রাখতে চাই, সুদেশ। আজ সন্ধেয় তুমি রাগ

করে চলে গিয়েছিলে। এখন ঝগড়া করার সময় নয়। আমাদের এখন একজোট হয়ে থাকতে হবে। জগদীশ আম্বাস্তা আর গোয়েন্দা-পুলিশকে দূরে রাখতে গেলে এটাই একমাত্র পথ। শুনেছি, জগদীশ টরচার করতে এক্সপার্ট। আমি চাই না, সে তার টরচারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের ওপর চালাক।

চারপাশে তাকাল রাহুল। অন্ধকার নির্জন রাস্তা। ঘুমিয়ে পড়া বাড়ি-ঘর। ফিদার অন্ধকার জানলা।

রাত হয়েছে। আজ কারফিউ হতে পারে বলে শুনেছি। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশের হাতে ধরা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। চললাম, সুদেশ। মনে রাগ রেখো না।

না। রাখব না।

সুদেশের দৃষ্টির সামনে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হল রাহুল দস্তিদার। ফিদার জানলার দিকে আর-একবার তাকিয়ে রওনা হল সুদেশ। আজকের পরিশ্রমের ফল কী হবে সে জানে না।

তোমার জন্যে, পুতুল।—আপনমনে ভাবল সুদেশ।—যা করছি সব তোমার জন্যে। তোমাকে বাঁচানোর জন্যে।

জগদীশ আম্বাস্তা

পরের দিনটা সুদেশের পড়াশোনা, লাইব্রেরি নিয়েই কেটে গেল। বাড়ি ফিরতে সিঁড়িতেই দেখা হল প্রতিবেশী সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তাঁর চোখে-মুখে একটা বিব্রত ছাপ।

মিস্টার হুদা!—তাঁর গলার স্বরে 'ছেলে'কে তিরস্কারের ইঙ্গিত।—ওঁরা আবার এসেছিলেন—মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গাজি। আপনি কাল তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি বলে খুব দুঃখ করছিলেন।

সময় পাইনি।—বলল সুদেশ, দেখা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পড়াশোনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, যেতেই পারিনি।

ওঁরা কালকের প্লেনে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। কী লজ্জার কথা বলুন তো! একবার দেখা করতে পারলেন না? ওঁরা এত আশা করে এসেছেন—

আজ রাতে দেখা করব। কোনও ভুল হবে না। আচ্ছা—ধন্যবাদ।

তাঁকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সুদেশ।

ঘরে ঢুকে বইপত্র নিয়ে আবার সে পড়াশোনায় বসল। কিন্তু মনে চিন্তার ঘূর্ণিঝড়, কালো ঘূর্ণিঝড়।

অন্ধকার ঘন হতেই পড়োশোনায় মনোযোগ ফিকে হয়ে এল সুদেশের।

ফিদা। ফিদা জয়শওয়াল।

সুতরাং, সংবিৎ যখন ফিরল, তখন গতকালের মতোই ফিদাকে অনুসরণ করে চলেছে সুদেশ।

একই রাস্তা ধরে পথ চলার অভ্যেস ফিদার। ওকে খুঁজে নিতে বেশি অসুবিধে হয়নি সুদেশের। এবং আজকের অনুসরণ গত সন্ধের অ্যাকশান রিপ্লে বলা যায়। অবশেষে সেই একই রেস্তরাঁয় গিয়ে ঢুকল ফিদা। সুদেশও ঢুকল।

জগদীশ আম্বাস্তা রেস্তরাঁয় আগে থেকেই বসেছিলেন। ফিদাকে দেখে তাঁর বেজি-চোখ ঝিকিয়ে উঠল। ফিদাও তাঁকে দেখে অস্বস্তিতে পড়ল। কোণের দিকে একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসল।

জগদীশ আম্বাস্তা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টলোমলো পায়ে এগিয়ে গেলেন ফিদার কাছে। একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। ফিদা এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছিল—সেটা এসে পৌঁছলে জগদীশ ওকে কী যেন বললেন। সুদেশ শত চেষ্টা করেও কথাগুলো শুনতে পেল না।

হঠাৎই এক হিংস্র গর্জন করে লাফিয়ে উঠলেন জগদীশ। বাঁ হাতের মুঠোয় খামচে ধরলেন ফিদার চুল। পিছন দিকে লাথি মেরে ফেলে দিলেন নিজের চেয়ার। এবং ডান হাতে গরম চায়ের কাপ তুলে নিয়ে ছুড়ে দিলেন ফিদার মুখে।

একটা জান্তব চিৎকার বেরিয়ে এল ফিদার গলা চিরে। রেস্তরাঁর সব লোক ত্রাসে বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকিয়ে। জগদীশের লাথি-ঘুসি এখন অবাধে ছিটকে পড়ছে ফিদার শরীরে।

শালা, বিপ্লব।—গর্জে উঠলেন জগদীশ আম্বাস্তা।—নীতুকে দেখে শিক্ষা হয়নি? চলো, তোমাকে বিপ্লব দেখাচ্ছি।

তারপরেই শুরু হল জগদীশের অশ্রাব্য খিস্তি।

অন্যান্য খদ্দেরের মতো সুদেশও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর হাত চলে গেছে **পকেটে।** রিভলভারের খোঁজে। পিছন থেকে কে যেন ওর হাত চেপে ধরল।

এক ঝটকায় ফিরে তাকাল সুদেশ।

রাহুলদা। রাহুল দস্তিদার।

কেটে পড়ো এখান থেকে।—চাপা গলায় বলল রাহুল। তারপর কোলাহল ও ভিড়ের মাঝে মিলিয়ে গেল।

সুদেশ বেরিয়ে এল রেস্তরাঁ থেকে। এখনও শোনা যাচ্ছে গর্জন এবং ফিদার করুণ আর্ত চিৎকার।

সুদেশ জানে, আগামীকালই হয়তো বড় রাস্তায় পড়ে থাকবে ফিদা জয়শওয়ালের বডি।

প্রথম নীতু মেহতা। দ্বিতীয় ফিদা। তিন নম্বর কে?

আশপাশে তাকিয়ে রাহুলকে একবার খুঁজল সুদেশ। পেল না।

পুতুল এখন কোথায়? ভাবতে-ভাবতে বাড়ির দিকে পা চালাল সে।

মাথা নিচু করে গভীর চিন্তা নিয়ে ধীর পায়ে হেটে চলেছিল সুদেশ, হঠাৎই আলোর ঝলক চোখে পড়তেই মুখ তুলল। একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে ওর মুখোমুখি। তীব্র হেডলাইটের আলো ঝাপটা মারছে সুদেশের চোখ-মুখে। কুঁকড়ে গেল সে। তৈরি হল বিদ্যুৎবেগে দৌড়নোর জন্যে। তখনই ভেসে এল পুতুলের মিষ্টি গলা।

সুদেশদা—।

গাড়িটা দেখে সুদেশ অবাক হল। ও দেখল, ভেতরে ড্রাইভার ছাড়া পুতুল একা।

গাড়িটা পেলে কোত্থেকে?

সে জেনে কী হবে? সময়ে-সময়ে দরকার হলে পাওয়া যায়। রাহুলদাই জোগাড় করে দিয়েছে। এখন এসো।

পিছনের সিটে পুতুলের পাশে গিয়ে বসল সুদেশ। চোখের ইশারায় প্রশ্ন করল ড্রাইভার যুবকটিকে দেখিয়ে।

দলের ছেলে।—ওর কানের কাছে মুখ এনে বলল পুতুল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। জনবহুল চঞ্চল এলাকা এড়িয়ে শান্ত নির্জন পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। সুদেশের মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা। কিন্তু কোথায় শুরু করবে ও বুঝতে পারছে না। অবশেষে ফিদার কথাই ও বলল।

পুতুল, ফিদা ধরা পড়েছে।

জানি। জগদীশ আস্থানা ধরেছে।—পুতুল বক্সীর চোখ সামনের অন্ধকার পথে স্থির।

কে বলল? রাহুলদা?

হ্যাঁ। আমাদের খতমের লিস্টে এর পরের নাম জগদীশ আস্থানার।—শান্ত স্বরে পুতুল বলল, রাহুলদা তোমাকে সকালে খুব খুঁজেছে, সুদেশদা।

আমি লাইব্রেরিতে ছিলাম।

আমরাও তাই ভেবেছি—যখন অন্য কোথাও তোমাকে পাইনি। বাড়িতে তো একটা খবর রেখে যেতে পারো!

কী করে জানব রাহুলদা ডাকবে—। আমাকে বলেছিল, এখন কয়েকদিন আমরা একজোট হব না।

তোমার পাশের ঘরের এক ভদ্রমহিলা রাহুলদাকে বলেছে তুমি নাকি আজকাল বাড়িতে প্রায় থাকোই না। শুধু স্নান করতে আর খেতে যাও।

এ ক'টা দিন খুব পড়াশোনার চাপ যাচ্ছে। আমাদের মিটিং-এর জন্যে পড়াশোনায় খুব পিছিয়ে পড়েছি। পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে আমার স্কলারশিপ নষ্ট হয়ে যাবে।—চোখ ফিরিয়ে পাশে বসা পুতুলের দিকে তাকাল সুদেশ।—ভয় নেই, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না।

অল্প হাসল পুতুল।—জানি। তা ছাড়া পালিয়ে যাবেই বা কোথায়। আমাদের

যতজনকে তুমি চেনো, তার চেয়েও অনেক বেশি লোক এ-শহরে ছড়িয়ে আছে, সুদেশদা।

রাহুলদা কি পুতুলকে ইনফরমারের কথা বলেছে? ভাবল সুদেশ। সে সন্দেহ করেছিল ফিদাকে। ফিদা জয়শওয়ালকে। কিন্তু তার পরিণতি কী অদ্ভুত! জগদীশের নৃশংস হাতে ধরা পড়ল ফিদা।

ফিদাকে যখন ধরা হয়, তখন আমি জগদীশকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম।— আনমনাভাবে বলল সুদেশ, রাহুলদা বারণ করল। জানো, পুতুল, আমি ফিদাকে পছন্দ করতাম না।

পছন্দ-অপছন্দ যার-যার নিজের কাছে। ফিদার কপাল খারাপ ছিল। তুমি কিছু একটা করতে গেলে উপকারের বদলে অপকারই হত।

পুতুল কি জানে, রাহুলদা পুতুলকে সন্দেহ করতে চেয়েছিল? সুদেশ পুতুলের পক্ষ নিয়ে বাধা দিয়েছে? হয়তো বলেনি। বললে পুতুল এত শান্ত, নিশ্চিন্ত, থাকতে পারত না। এই অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে এক নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা ঘিরে ফেলল সুদেশকে।

সে বাইরে তাকাল। শহর ছেড়ে ওদের গাড়ি শহরতলির খোলা পথ ধরেছে। দু-পাশে অন্ধকার প্রান্তর। আলো নজরে পড়ে না।—শুধু নিজেদের গাড়ির হেডলাইট ছাড়া।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?—সুদেশ জানতে চাইল।

বেশি দূরে নয়।

ঠিক কতটা দূরে?—সুদেশের স্বরে কিছুটা বিস্ময় ও অসহিষ্ণু সুর।

পৌঁছলেই জানতে পারবে।

মিটিং আছে?

হ্যাঁ।

আগে কখনও শহরের বাইরে আমাদের মিটিং হয়নি।

মিটিংয়ের জায়গা তো আমি পছন্দ করি না, সুদেশদা। রাহুলদা করে।—মুখ ফিরিয়ে সুদেশের দিকে তাকিয়ে হাসল পুতুল। সে-হাসিতে কিছুটা বিষণ্ণতা খুঁজে পেল সুদেশ।— আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না?

করি, পুতুল।—সুদেশ হৃদার কণ্ঠস্বর একাগ্র, একান্ত।

এই তো, এসে গেছি।—বলার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির গতি কমে এল।

রাস্তা নির্জন—নির্জনতর। অন্ধকার। শুধু ওপরের আকাশে দিশেহারা নক্ষত্ররা চোখ পিটপিট করছে। এখানে, এই অদ্ভুত জায়গায়, থামছে কেন গাড়ি? কই, অন্য কাউকে, রাহুলদাকে, তো চোখে পড়ছে না? সুদেশ অবাক হতে-না-হতেই গাড়ি একেবারে থেমে গেল।

এবার আমি চলে যাব।—বলল পুতুল।

চলে যাবে?—সুদেশের স্বর বিপন্ন।

হ্যাঁ, রাহুলদার তা-ই নির্দেশ।

আকাশের ছেঁড়া মেঘের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে সুদেশ। অদ্ভুত নৈঃশব্দে

গাড়ির ইঞ্জিনের চাপা গর্জন এক বিদ্রোহ।

কী ব্যাপার বলো তো, পুতুল?

জানি না।—ওর গলায় অস্বস্তির সুর।—রাহুলদা আমাকে সব খুলে বলেনি। শুধু বলেছে আমি যেন এখানে না থাকি, আবার শহরেও ফিরে না যাই। গাড়ি নিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে অন্য একটা জায়গায়। সে-জায়গার নাম আমি আর রাহুলদা ছাড়া কেউ জানে না, জানবে না। তোমাকে জানানো ঠিক নয়, তবুও বলছি...অ্যাকশন সম্ভবত আজ রাতেই শুরু হবে। ফিদা ধরা পড়ার পর রাহুলদা আর দেরি করতে চাইছে না।

আজ রাতে?—সুদেশের স্বর যেন পাহাড়ি প্রতিধ্বনি।—তাহলে আমাকে এখানে আনা হয়েছে কী করতে?

অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার জন্যে। আক্রমণের সময় তোমাকে একটা গ্রুপ লিড করতে হবে। তোমার সঙ্গে রিভলভার আছে তো?

আছে।

ভালো। ওরা যখন আসবে, তোমাকে সিগনাল দেবে—আলো জ্বালিয়ে-নিভিয়ে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই দু-হাতে সুদেশকে জড়িয়ে ধরল পুতুল। ওর ঠোঁট স্থির হল সুদেশের ঠোঁটে। উষ্ণতা। আচ্ছন্নতা। অবাধ্য হৃৎপিণ্ডের শব্দ। সুদেশের ঘ্রাণে ফোটা পদ্মের গন্ধ। এই মুহূর্ত চিরন্তন হয়ে থাক।—ও ভাবল।

তোমার গায়ে আঁচ লাগতে দেব না,—পুতুল বক্সীর নরম শরীরে সুদেশের কথা জড়িয়ে যায়।—ভয় কোরো না। তোমার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না। বিশ্বাস করো।

পুতুল ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ও ফিসফিস করে বলল, যাও—বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো। ওরা এখুনি এসে পড়বে। আমি চললাম। গুড বাই, সুদেশ।

সুদেশ হুদা যেন কাঠের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে গাড়ির অপস্রিয়মান লাল আলোর দিকে। দূরে, অন্ধকারে, কোথাও প্যাঁচা ডেকে ওঠে কর্কশ স্বরে। শরীরে শিহরন জাগে সুদেশের। এই মুহূর্তে পুতুল ওর সর্বাঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু ও একা। সঙ্গী শুধু নৈঃশব্দ, আকাশের নক্ষত্র, আর অন্ধকারের নির্জন প্রান্তর।

ইনফরমার

সত্যিকারের সময়ের অঙ্কে খুব বেশিক্ষণ সে অপেক্ষা করেনি, কিন্তু সুদেশের মনে হল এক শতাব্দী পার হয়ে গেছে। খোলা রাস্তায় সে পায়চারি করতে লাগল। কখনও রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল ঘাসে ছাওয়া অন্ধকার প্রান্তর, কখনও দেখল রাতের আকাশ। ওর মনে লক্ষ কথার ভিড়, লক্ষ ঘটনার ইঙ্গিত। পরিস্থিতি ওর বিচার-বুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছে কেন?

প্রথমটা মনে হয়েছিল জোনাকির ছলনা। তারপর বোঝা গেল দূরাগত কোনও আলো—চিতাবাঘের চোখ—দপদপ করে জ্বলছে-নিভছে। এগিয়ে আসছে সুদেশ হুদার দিকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করে যায়। অবশেষে আলোর উচ্ছ্বাসী ঢেউ ছন্নছাড়াভাবে স্নান করিয়ে দেয় তাকে।

যাক, তুমি তাহলে সময় মতোই এসেছ, সুদেশ।

কণ্ঠস্বর আলোর দিক থেকে আসেনি। এসেছে তার অনেকটা বাঁ পাশ থেকে। তাই চমকে ঘুরে দাঁড়াল সুদেশ।

রাহুলদা!—সুদেশ চিৎকার করে ওঠে, তুমি?

আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, সুদেশ। এ-জায়গাটা তোমার মনে নেই? মনে থাকা উচিত। শত হোক, এখানেই তো তোমাকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

অনুমানে কণ্ঠস্বরের দিকে এগিয়ে যায় সুদেশ হুদা। কিন্তু আলোর বন্যা তার শরীরে অঙ্গাঙ্গী। পিছন থেকে কার গলা শোনা যায়,—আর এক পাও এগোবে না। আমার হাতে পিস্তল আছে।

রতনলালের গলা সন্দেহ নেই।

ত্রাসে বরফ সুদেশ।

এ সব কী, রাহুলদা?—সে চিৎকার করে ওঠে, এ কী ধরনের ইয়ার্কি?

ইয়ার্কি নয়। ঠাট্টাও নয়, সুদেশ,—রাহুল দস্তিদারের কণ্ঠে হিংসা, উলঙ্গ হিংসা।—মনে পড়ে? তিন মাস আগে এয়ারপোর্ট থেকে একজন ছাত্র ট্যাক্সি করে শহরে যাচ্ছিল। নাম তার সুদেশ হুদা। সুদূর ইরান থেকে এ-দেশে সে পড়াশোনা করতে এসেছিল। পথে জগদীশ আম্বাস্তার সিক্রেট-পুলিশ তাকে আটকায়। গাড়ি থেকে নামিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়। তারপর তারা সুদেশ হুদাকে খুন করে। পুঁতে ফ্যালে এই ঘাসজমিতে। কিন্তু অন্য এক সুদেশ হুদা ঠিকই শহরে এসে পৌঁছয়। য়ুনিভার্সিটিতে ভরতিও হয়। যদিও সে তুমি—নকল সুদেশ। জগদীশ আম্বাস্তার ডিপার্টমেন্টের লোক, গোয়েন্দা-পুলিশের লোক। বুদ্ধির তোমার তুলনা নেই, সুদেশ। ওরা তোমাকে ভালোই ট্রেনিং দিয়েছিল...তারপর পাঠিয়েছিল আমার দলে। আমার কথা বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো?

সুদেশের হৃৎপিণ্ড বুকের ভেতর দামামা। মস্তিষ্ক তীব্র চিৎকারে উন্মত্ত—পালাও, পালাও। কিন্তু সুদেশের পা অনড়, নিশ্চল। শ্যামাপোকার মতো আলোর বৃত্ত ওকে সম্মোহিত করে রাখে।

তুমি প্রতিবাদ করবে না? সাফাইও গাইবে না?—রাহুলদার গলায় ঠাট্টার সুর,—সবাইকে ঠকালেও আমি ঠকিনি, সুদেশ। বিপ্লব আমার মা, বোন, বউ—আমার রক্তে শুধু বিপ্লব আছে—আর কিছু নেই। ছাত্র সুদেশ হুদার মারা যাওয়ার খবরটা খবরের কাগজে বেরোয়নি—বের করা হয়নি। সুতরাং, তোমার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা

নয়। প্রথমটা হয়ওনি। নীতু মেহতা গেল। আমাকে ঠকানোর জন্যে তোমার পরিকল্পনায় সাহায্য করল জগদীশ আম্বাস্তা। ফিদার সঙ্গে মাখো-মাখো ভাব 'দেখাল। তুমি আমাকে বোঝাবে, ফিদাই ইনফরমার। তোমার নির্দেশে ফিদা ধরা পড়ল। ছাড়াও পাবে। তখন তুমি আমাকে বোঝাবে, ফিদা জগদীশের লোক। তাই সে ফিদাকে ধরেও ছেড়ে দিয়েছে। কই, নীতুকে তো দেয়নি! আমিও তাই বুঝতাম। কিন্তু তোমার সর্বনাশ ডেকে আনল মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গাজি।

এখন সুদেশ বুঝতে পারল অসহায়তা কাকে বলে। এই হতাশ অনুভূতিহীন মুহূর্তে বুঝতে পারল নীতুর অন্তিম অবস্থার কথা, জগদীশের হাতে ফিদার করুণ অবস্থার কথাও।

প্রথমে বুঝিনি তুমি তাদের এড়িয়ে চলছ কেন। নিজের দেশের লোক, প্রতিবেশী, পরিবারের বন্ধু—অথচ তাদের সঙ্গে দেখা করার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে তোমার নেই? এ তো ভালো কথা নয়! সুতরাং হোটেল কসমোপলিটান-এ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গাজীর সঙ্গে আমি দেখা করলাম। ওদের ঠিকানা তোমার প্রতিবেশী মহিলাই দিয়েছিলেন। যে-সুদেশ হুদাকে তাঁরা চিনতেন, সে বেঁটে এবং মোটা ছিল। তার গায়ের রংও পরিষ্কার। তুমি কে, সুদেশবাবু? নিজের লোকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো নোংরা মানসিকতা তোমার মনে কীভাবে জন্ম নিল? টাকার লোভে? পেটের দায়ে? তাহলে দ্যাখো, বড়লোক হয়ে ভরতি পেটে মরতে কেমন লাগে। রতনলাল!

আলো নিভে যায় মুহূর্তে। নিভেই থাকে। সময় দোদুল শূন্য। ক্রমশ গাঢ় হয় নৈঃশব্দের পরদা। সুদেশ জানে, সামনে-পিছনে রাস্তা বন্ধ। এবং অন্ধকারে ওরা এগিয়ে আসছে, ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে তাকে শাস্তি দিতে। তার শরীরে আলোড়ন তুলতে।

তার সঙ্গে রিভলভার নেই। সুতরাং ওরা নির্ভয়ে আসতে পারবে। তার রিভলভার সরিয়ে নেওয়ার জন্যেই পুতুল ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। তখনই তুলে নিয়েছে সুদেশের আগ্নেয়াস্ত্র। এখন মনে পড়ছে, ওকে ছেড়ে দিয়ে পুতুলের কী কান্না! পুতুলের বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণার চেয়ে কী আর বেশি যন্ত্রণা ওরা দেবে? সুদেশ কাঁদবে না, ওর চোখে জল নেই। চোখের জল ফেলার অধিকার ওর নেই। কারণ, সেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নীতুর সঙ্গে, ফিদার সঙ্গে—নীতুর আগে আরও অনেকের সঙ্গে, দেশের অন্যান্য জায়গায়। সুতরাং, চোখের জল ফেলার কোনও কারণ নেই। বরং কারণ আছে নীরব থাকার এবং প্রতীক্ষার। সে অপেক্ষা করছে—করবে।

হে ভগবান!—নিঃশব্দ চিৎকারে ভাবল সুদেশ, ওরা এত দেরি করছে কেন...?

পায়ের শব্দ নেই

বিদিশা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো নিজের সাজগোজ দেখে নিচ্ছিল। আয়না মিথ্যে কথা বলে না। তাই সামনের মেয়েটাকে রীতিমতো সুন্দরী বলে মনে হচ্ছিল বিদিশার। বিধাতাপুরুষ যখন রোজকার দমবন্ধ করা কাজের রুটিন থেকে ছুটি নিয়ে স্বর্গীয় কোনও জায়গায় আলস্যে অবসর যাপন করছিলেন, তখন বেশ ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে বিদিশাকে তৈরি করেছেন তিনি।

নিটোল ফরসা মুখ, স্পষ্ট ভুরু, মায়াজড়ানো টানা-টানা চোখ, গোলাপি ঠোঁট, হাসলে এক গালে টোল পড়ে। ওর মুখের দিকে একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। কত পুরুষ যে ওর সঙ্গে নানান ছলছুতোয় আলাপ জমাতে চায়!

বিদিশার গাঢ় নীল শাড়িতে সূক্ষ্ম জরির কাজ। গত বছর পুজোর সময় মা কিনে দিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রিটের ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস থেকে। বিদিশাও সঙ্গে গিয়েছিল। এত দামি শাড়ি কিনতে ওর মন চায়নি। কিন্তু মা জোর করে কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোর সাজগোজের সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি—।'

ছাব্বিশ বছর বয়েসে কি কারও সাজগোজের বয়েস ফুরিয়ে যায়? কিন্তু বিদিশার ভেতরে সবসময়েই একটা অস্থির ঝড় মাথা খুঁড়ে মরতে থাকে।

মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে তেরছা চোখে আয়নার দিকে তাকাল বিদিশা। কোঁকড়া কালো চুলের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে চাইছে পিঠে। চুলের গোড়ায় সাদা সিল্কের সৌন্দর্য-বন্ধনী। চুলের ঢং বিদিশার পছন্দ হল। আর ঠিক তখনই ওর চোখ গেল বাঁ গালে কানের কাছাকাছি জায়গায়। ইঞ্চিদুয়েক লম্বা একটা কাটা দাগ। রণজয়ের ভালোবাসার চিহ্ন। সেই রাতটার কথা বিদিশা এখনও ভুলতে পারেনি। যেমন ভুলতে পারেনি আরও অনেক দিন-রাতের কথা।

সাজগোজ পরখের পালা শেষ করে বিদিশা কবজি উলটে ঘড়ি দেখল : সওয়া ন'টা। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে না বেরোতে পারলে অফিসে দেরি হয়ে যাবে। সল্ট লেকের সি. এ. পি. ক্যাম্প থেকে পার্ক স্ট্রিট—সব মিলিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো লাগবেই!

আয়নার পাশে দাঁড় করানো একটা সোফায় বিদিশার লম্বা স্ট্র্যাপ দেওয়া হাতব্যাগটা পড়ে ছিল। তার পাশেই বাপ্পার স্কুলের পোশাক। বাপ্পা এখন স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছে। ও দশটায় স্কুলে বেরোয়।

বিদিশা ব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরোতে যাবে, মা বসবার ঘরের দরজা থেকে ডাকলেন, 'মানু, তোর ফোন—।'

বিদিশা ভুরু কুঁচকে ডাইনিং হলের দিকে এগোল। কে ফোন করল এই অসময়ে?

সবুজ রঙের রিসিভার টেবিলে কাত করে নামানো। সেটা তুলে নিয়ে বিদিশা ছোট্ট করে বলল, 'হ্যালো—।'

'মানু, কেমন আছ?'

ও-প্রান্তের গলা শোনামাত্রই বিদিশার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। রণজয়!

'কেমন আছ, মানু?' রণজয় আবার জিগ্যেস করল।

গলা শুকিয়ে কাঠ। অতি কষ্টে জিভে সাড় এনে বিদিশা বলল, 'ভালো—।'

বিদিশা রণজয়কে ছেড়ে চলে এসেছে প্রায় ন'মাস। প্রথম ছ'মাস রণজয় ওর সঙ্গে যোগাযোগের কোনও চেষ্টা করেনি। তারপর একদিন ফোন করে বাপির সঙ্গে কথা বলে, মায়ের সঙ্গে কথা বলে। তবে সেসব কথাবার্তা ছিল লিগাল সেপারেশানের ব্যাপার নিয়ে।

'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, মানু।' রণজয় বলল।

দম বন্ধ করে বিদিশা জিগ্যেস করল, 'কী কথা?'

'আমি একেবারে বদলে গেছি। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি না। রাতগুলো আমাকে হাঁ করে গিলতে আসে।' শেষ দিকে রণজয়ের গলা ধরে এল।

বিদিশার ভেতরে একটা কষ্ট সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। ও চোয়াল শক্ত করে সেটাকে চেপে সাধারণ গলায় বলল, 'আমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি পরে ফোন কোরো—।'

'বিদিশা, প্লিজ। আমার কথাটা শোনো একবার—।'

'সরি, রণজয়। সত্যি ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল বিদিশা।

মা তখনও বসবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। বিদিশা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মা পিছন থেকে জিগ্যেস করলেন, 'রণজয় কী বলল?'

বিদিশা দায়সারাভাবে জবাব দিল, 'তেমন কিছু না—।'

'তুই একটু ভেবে দ্যাখ না, যদি—।'

বিদিশা ঘুরে তাকাল মায়ের দিকে। মায়ের দু-চোখে অনুনয়, প্রত্যাশা। মা এখনও ভাবে, রণজয়ের সঙ্গে ওর বিয়েটা জোড়া দেওয়া সম্ভব। দু-বছরে ওদের সম্পর্কে এমন কোনও ফাটল ধরতে পারে না, যা সারিয়ে নেওয়া যায় না।

কিন্তু বিদিশা কেমন করে মাকে বলবে, মা, ওই লোকটার সঙ্গে দুটো বছর আমি ঘর করেছি, তুমি করোনি। ওর ভেতরে এমন কতকগুলো গোলমাল আছে যা কখনও শোধরাবে না। তুমি কি আমার বাঁ গালের কাটা দাগটার কথা ভুলে গেলে!

বিদিশা ছোট্ট করে বলল, 'আমি বেরোচ্ছি। ফিরতে একটু দেরি হলে চিন্তা কোরো না। দুপুরে খাওয়ার আগে বাবাকে মনে করে ডাইজিনটা এক দু-চামচ খাইয়ে দিয়ো।'

ও যখন দরজা খুলে বেরোচ্ছে তখন পিছন থেকে শোনা গেল বাপ্পার চিৎকার, 'দিদি, আমার জন্যে আজ একটা ক্যাডবেরি নিয়ে আসবি—।'

'আচ্ছা, নিয়ে আসব।'

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে সদর দরজা টেনে দিল বিদিশা। পালিশ করা ভারি কাঠের

দরজা 'ক্লিক' শব্দ করে অটোমেটিক লক হয়ে গেল।

ছোট্ট মোজেইক করা বারান্দার শেষে দু-ধাপ সিঁড়ি। তারপর খানিকটা জায়গা জুড়ে শান বাঁধানো চাতাল। তার প্রান্তে, পাঁচিলের কিনারা ঘেঁষে, লম্বা মাটির ফালিতে সবুজের বাগান। রিটায়ার করার পর বাবাকে এই নেশায় পেয়েছে। সবসময় এই বাগান নিয়ে পড়ে আছেন। একা-একা কথা বলেন গাছের সঙ্গে। আপনমনে মাথা নাড়েন, বিড়বিড় করেন।

বাবা সারাটা জীবন কলকাতা করপোরেশনে ঘুষ না নিয়ে চাকরি করেছেন। ওদের নিয়ে পাইকপাড়া অঞ্চলে কী কষ্ট করেই না থাকতেন! বিদিশা শুনেছে, বিয়ের আগে মা রমলা গালর্স হাই স্কুলে অঙ্ক আর বিজ্ঞান নিয়ে পড়াতেন। বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দেন বাবার কথায়। কিন্তু পড়ানোর অভ্যেস ছাড়তে বাবা মানা করেননি। তাই বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পড়াতেন মা।

সল্ট লেকের জমি লটারি হওয়ার সময় সেই কোন যুগে বাবা একটুকরো জমি পেয়েছিলেন। তারপর, প্রায় পঁচিশ বছর পর, সেখানে এই ছোট্ট একতলা বাড়ি তৈরি করেছেন। বাবা-মায়ের তিলতিল কষ্ট দিয়ে গড়ে তোলা এই বাড়ি।

তাই বিদিশার আবদার ছিল, বাবা-মায়ের নামেই হোক বাড়ির নাম। অনেক লড়াইয়ের পর জিতেছিল ও।

সদরের গ্রিলের দরজার দিকে এগোতে-এগোতে বিদিশা দেখতে পেল, শোওয়ার ঘরের লাগোয়া গ্রিল-ঘেরা বারান্দায় বসে বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। লম্বা তামাটে কাঠামো। মুখে বয়েসের ভাঁজ। চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় মানুষটা ঘুম থেকে ওঠে, আর রাতে শুয়ে পড়ে ন'টার মধ্যে। আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ।

বিদিশা ডেকে বলল, 'বাবা, আমি বেরোচ্ছি।'

মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজের আড়াল সরিয়ে তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন। সে-হাসির অর্থ বোধহয়, আমার জোয়াল টানার পালা শেষ, এবার তোর পালা।

লোহার গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল বিদিশা। একবার পিছন ফিরে দেখল। সদর দরজার একপাশে পাথরের ফলকে লেখা বাড়ির নাম : অরুণা-সুধাময়। ছোট্ট সাদা বাড়িটা যেন বাড়ির মানুষগুলোর মতোই সাদাসিধে। এরকম সাদাসিধে জীবনই চেয়েছিল বিদিশা। কিন্তু ওর বিয়েটা গোলমাল হয়ে গিয়ে সবকিছুই কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

অথচ বিয়ের আগে ও পাঁচ বছর চুটিয়ে প্রেম করেছিল রণজয়ের সঙ্গে।

ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার এক বিয়েবাড়িতে। আঠেরো বছর বয়েসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল কল্পিতা—বিদিশার স্কুলের বন্ধু। বরযাত্রীরা এসেছিল দুর্গাপুর থেকে। সবাই মিলে বেশ হইহুল্লোড় করছিল। তারই মধ্যে রণজয়কে লক্ষ করেছিল বিদিশা। ফরসা রোগা চেহারা। মুখে কেমন যেন মেয়েলি ভাব। চোখে

চশমা। চোখ দুটো বেশ গভীর আর মিষ্টি।

হাতে একটা ক্যামেরা নিয়ে চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল রণজয়। মাঝে-মাঝে নতুন বউকে তাক করে শাটার টিপছিল।

বরযাত্রী দু-চারজন যুবক বিদিশার সঙ্গে গল্প জুড়েছিল। দুর্গাপুর যে কত ভালো জায়গা সে-কথা সবিস্তারে বলছিল। বিদিশা সেই বয়েসেই বেশ বুঝে গিয়েছিল ওকে ঘিরে পুরুষদের কিছু সমস্যা হয়। তাই সতর্কভাবে সৌজন্য বজায় রেখে টুকটাক কথা বলছিল।

হঠাৎই তাদের একজন বিদিশাকে বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের সঙ্গে একটা ছবি তুলুন।'

সঙ্গে-সঙ্গে আর-একজন 'এই রনো, আমাদের দিকে তাক করে ক'টা ফিলিম খরচ করো, বস্।'

রণজয় ইতস্তত করে জবাব দিয়েছিল, 'উনি এখনও ফটো তোলার পারমিশান দেননি—।'

তখন কে একজন বলে উঠল, 'রনোটা বড্ড বেরসিক। সবসময় নীতিশিক্ষা ফলায়।'

'আগের জন্মে ও ব্যাটা পাদরি ছিল।'

'উহুঁ, বেচারা নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করে।'

বিদিশা অস্বস্তি পাচ্ছিল। অথচ রণজয় বেশ স্মার্টভাবে ওর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আজেবাজে কথায় কান দেবেন না। শুধু বলুন, ফটো তুলতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

বিদিশা বলেছিল, 'তুলুন—।'

রণজয় নরম গলায় আলতো করে বলল, 'একটা সবার সঙ্গে...আর-একটা একা...।'

ফটো তোলার পর রণজয় বিদিশার ঠিকানা চেয়েছিল। বলেছিল, ফটোর প্রিন্ট ডাকে পাঠিয়ে দেবে। কয়েক সেকেন্ড দোটানার পর ঠিকানা দিয়েছিল বিদিশা।

এমন সময় কনেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল ছাদনাতলায়। রণজয় ফটো তোলা নিয়ে বিদিশাকে গুনগুন করে কীসব কথা বলছিল। আবার মাঝে-মাঝে হঠাৎই চুপ করে যাচ্ছিল। ওকে দেখে কেমন যেন অসহায় বলে মনে হচ্ছিল।

একটু পরেই ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল রণজয়।

দিন-পনেরো পর বিদিশার নামে একটা খাম এসেছিল পাইকপাড়ার বাড়িতে। দুটো ফটোর দু-কপি করে পোস্টকার্ড মাপের প্রিন্ট। সঙ্গে একটা ছোট্ট চিরকুট। তাতে লেখা

> *খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের জন্যে কোনও প্রিন্ট রাখিনি। বিশ্বাস করুন। ফটো কেমন লাগল এক লাইন লিখে জানাবেন?*

সামান্য নির্দোষ চিঠি। কিন্তু তারই মধ্যে আঠেরো বছরের বিদিশা কী যেন খুঁজে পেয়েছিল। এ যেন এক আঁজলা জলে ডুবে মরার গভীরতা।

এক লাইন নয়, বিদিশা এক পৃষ্ঠা লিখে জানিয়েছিল, ফটো কেমন লেগেছে।

নিতান্ত নির্দোষ চিঠি। কিন্তু তারপর থেকে একইরকম নির্দোষ চিঠি আসতে লাগল, যেতে লাগল।

দিন-মাস কাটতে লাগল। আর, অত্যন্ত ধীরে নির্দোষ চিঠিগুলোতে ভালোবাসার 'দোষ' ঢুকতে লাগল।

রণজয় সি. এন. জ্যাকসন কোম্পানির সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। বি.ই. কলেজ থেকে ইলেকট্রনিক্সে ডিগ্রি নিয়ে বছর আড়াই হল চাকরিতে ঢুকেছে। কোম্পানির হেড অফিস কলকাতায়, কিন্তু ফ্যাক্টরি দুর্গাপুরে। মাসের মধ্যে অন্তত দুবার কলকাতায় আসে রণজয়। তখন বিদিশার সঙ্গে দেখা করতে ওর অসুবিধে নেই।

বিদিশা ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বেথুন কলেজে ভরতি হয়েছিল।

রণজয় ওর সঙ্গে কলেজে এসে দেখা করতে লাগল। একবার দেখা হওয়ার পর চোদ্দো দিন ধরে অপেক্ষা করত বিদিশা। তখন ওর মনে হত, হেদুয়া পার্কের গাছের পাতাগুলো কী সাঙ্ঘাতিক সবুজ, ওপরের আকাশটা কী বিপজ্জনক নীল, আর হেদুয়ার জল কী ভীষণ স্বচ্ছ!

জীবনকে আগে কখনও এত রূপসী মনে হয়নি বিদিশার। একটা রোগা ফরসা মুখচোরা চশমা পরা মিষ্টি ছেলে ওর জীবনটাকে যেন পালটে দিল।

এখন পিছন ফিরে তাকালে বিদিশার মনে হয়, রণজয়ের মধ্যে ছোটখাটো কয়েকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার তখন থেকেই দেখা গিয়েছিল। আজ যত স্পষ্টভাবে তার অর্থ বোঝা যায় তখন তা বোঝা যায়নি।

পার্ক স্ট্রিটের বাস স্টপে নেমে ডানদিকের ফুটপাথ ধরে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটছিল বিদিশা। অফিসে দেরি হয়ে যাবে এই ভয়ে বারদুয়েক হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎই পিছন থেকে, ঠিক ঘাড়ের কাছে, কে যেন বলে উঠল, 'আগে গেলে বাঘে খায়—।'

চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল বিদিশা। ওরই অফিসের সহকর্মী বোসদা—সুধীর বোস। অভিজ্ঞ ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান। মাথায় টাক—শুধু কানের কাছটায় খানিকটা করে চুল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পানের রসে ঠোঁট লাল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষকে আপন করে নিতে পারেন।

বিদিশা অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'দেরি হয়ে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি হাঁটছি।'

সুধীর বোস পান চিবোতে-চিবোতে জড়ানো গলায় বললেন, 'আমার কথাটার ইনার মিনিং আছে, মা জননী।'

বিদিশা অপ্রতিভ হয়ে আশেপাশে তাকাল। কেউ শুনতে পায়নি তো! বোসদার কথাবার্তাই এইরকম। বিদিশা জানে, এখানে 'বাঘ' বলতে ওদের সেকশানের ম্যানেজার প্রশান্তলাল চক্রবর্তী। ভদ্রলোক কানে কম শোনেন, আর সেইজন্যই বোধহয় মহিলা-আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। কারণ, লোকে বলে, একটা ইন্দ্রিয় কমজোরি হলে অন্য কোনও

ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে লোকসান পুষিয়ে দেয়।

বিদিশা স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করে। প্রশান্ত চক্রবর্তী নানা ছুতোয় ওকে ডেকে ডিকটেশান দেন। সারাদিনই নির্লজ্জ চোখে ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। প্রথম-প্রথম বিদিশার খুব খারাপ লাগত, কিন্তু ধীরে-ধীরে ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। ও বুঝতে পেরেছে, মেয়েদের চাকরির ক্ষেত্রে এ-অসুবিধেটা থাকবেই। ছ'মাসের চাকরি বিদিশাকে ছ'বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে দিয়েছে। যেমন রণজয়ের সঙ্গে দু-বছরের সংসারটাকে ওর সবসময় দুশো বছর মনে হয়।

সকালে এই সময়টা পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে অসংখ্য অফিসযাত্রী দ্রুত পায়ে হেঁটে যায়। আর রাস্তা দিয়ে ছুটে যায় একের পর এক গাড়ি। এই অঞ্চলটার আপাদমস্তক এখন গতি। মাথার ওপরে শ্রাবণের মেঘলা আকাশ যেন অলস ঘুম-চোখে এই গতি দেখছে।

বোসদা বিদিশার পাশাপাশি পা ফেলতে-ফেলতে বললেন, 'ফাঁকা অফিসে আগে-আগে যেয়ো না। প্রশান্ত চক্রবর্তী ওত পেতে বসে আছে।'

বিদিশা হেসে বলল, 'যাঃ, কী যে বলেন! আমাদের চক্রবর্তীসাহেব অতটা ডেঞ্জারাস নন। ষাট পেরোনো রোগা-ভোগা মানুষ, দাঁত-টাত নেই, কামড়াবে কেমন করে!'

'মাড়ি তো আছে! সুযোগ পেলে ওই মাড়ি দিয়েই কিড়মিড় করবে।'

বোসদার কথায় বিদিশা জোরে হেসে ফেলল।

প্রথম-প্রথম এসব পুরুষালি রসিকতায় অস্বস্তি পেত বিদিশা। কিন্তু পরে এই ব্যাপারটাকে ও মানিয়ে নিতে পেরেছে। তা ছাড়া ওর অফিস-কোলিগরা বেশিরভাগই ভীষণ ভালো। একে অপরের সুখে-দুঃখে অংশ নেয়। কারও সম্পর্কে অহেতুক কোনও কৌতূহল নেই।

বিদিশা যখন অফিস বিল্ডিং-এ ঢুকল তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ও আর বোসদা গ্রাউন্ড ফ্লোরের লিফটের কাছে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। দু-চারটে চেনামুখের সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছিল বিদিশার। ও সৌজন্যের হাসি হাসল।

আশেপাশের নানান কথাবার্তা কানে আসছিল। কেউ অফিসের সমস্যার কথা বলছে, কেউ বলছে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার সমস্যার কথা, কেউ বা পরিবারের সঙ্গে কথা কাটাকাটির কারণ বিশ্লেষণ করছে।

বিদিশার মাথায় রণজয়ের ভাবনাটা আবার ফিরে এল।

আজ মঙ্গলবার। রণজয় বিদিশাকে বাড়িতে ফোন করতে শুরু করেছে রবিবার থেকে। এ পর্যন্ত মোট চারবার ফোন করেছে ও। আর চারবারই একইরকম কথাবার্তা বলেছে। 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে', 'তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না', ইত্যাদি।

কথাগুলো শুনে বিদিশার কষ্ট হয়। প্রথম পরিচয়ের দিনটা মনে পড়ে, মনে পড়ে ফটো তোলার কথা। আবার অন্য অনেক ঘটনাও মনে পড়ে। দুঃস্বপ্নের স্মৃতির ভারে স্বপ্নের স্মৃতি চাপা পড়ে যায়।

বিদিশার মন বলছে, আজ রাতে ও আবার ফোন করবে। আবার একই কথা বলবে।

ছ'তলায় অফিসের ফ্লোরে পৌঁছে যেন অন্য জগতে ঢুকে পড়ল বিদিশা। নিজের চেয়ার-টেবিলে গুছিয়ে বসল। পেডাস্টাল ফ্যানটা চালিয়ে দিল ফুল স্পিডে। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে নিল। হালকা পারফিউমের গন্ধ টের পেল। আর তখনই দেখল শেখর সেন ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

শেখর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ। লম্বা শক্তিশালী কাঠামো। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। চোখে চশমা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা।

একসময় ট্র্যাকে দৌড়নোই ছিল শেখরের ধ্যানজ্ঞান। একশো মিটারে ইন্টার কলেজ চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল। এখন রোজ ভোরবেলা দেশবন্ধু পার্কে দৌড়য়।

'ম্যাডাম, নিন, এই বইটা পড়ে দেখুন—' একটা ইংরেজি পেপারব্যাক বিদিশার দিকে এগিয়ে দিল শেখর 'এই বইটা বিদেশে প্রচুর বিক্রি হয়েছে।'

বিদিশা বইটা হাতে নিয়ে দেখল। স্টিভ সোয়ানসন নামে একজন সিরিয়াল কিলারের আত্মজীবনী। নাম   মাই লাইফ উইথ নাইফ।

শেখর বইয়ের পোকা। অফিসে কোনও-না-কোনও বই ওর সঙ্গে থাকবেই। আজ এটা নিয়ে এসেছে। হয়তো আজই বাসে বইটা পড়ে শেষ করেছে। তাই বিদিশাকে পড়তে দিচ্ছে।

শেখর প্রায়ই বই পড়তে দেয় বিদিশাকে। ইংরেজি গল্প-উপন্যাস নিয়ে ফাঁক পেলেই আলোচনা-তর্ক জুড়ে দেয়। আর নিজের দৌড়নোর দিনগুলোর গল্প করে।

বিদিশা ঠোঁট কুঁচকে বলল, 'না, না, এসব খুন-জখমের বই আমার ভালো লাগে না।'

শেখর বলল, 'এই সোয়ানসন লোকটা স্যাডিস্ট—সাইকোপ্যাথও বলা যায়। মহিলাদের খুন করেই ও আনন্দ পেত। ওর মাথার গন্ডগোল আছে বলেই ইলেকট্রিক চেয়ার হয়নি। আমেরিকায় যাবজ্জীবন জেল খাটছে।'

'ওরে বাবা—' আঁতকে উঠল বিদিশা 'এসব বই কেন পড়েন আপনি?'

বিদিশার টেবিলে হাতের ভর রেখে ঝুঁকে পড়ল শেখর। বলল, 'আপনাকে সত্যি কথাটাই বলি। রোমাঞ্চকর থ্রিলিং ব্যাপার আমার খুব ভালো লাগে। যখন ট্র্যাকে দৌড়তাম তখন খুব থ্রিলিং লাগত। এখন তো জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গেছে—।'

শেষদিকে ও মুখটা এমন ব্যাজার করল যে, বিদিশা হেসে ফেলল।

হঠাৎই কোথা থেকে ম্যানেজার পি. এল. চক্রবর্তী এসে শেখরের পাশ দিয়ে উঁকি মারল 'বিদিশা, জলদি এসো। অনেকগুলো ইমপরট্যান্ট চিঠি ডিক্টেট করার আছে।'

বিদিশা চক্রবর্তীসাহেবের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'এখুনি যাচ্ছি।'

শেখর হেসে বলল, 'আপনিও একটা এরকম বই লিখে ফেলুন, ম্যাডাম। বইটার নাম দেবেন "মাই লাইফ উইথ পি. এল. চক্রবর্তী"।'

বিদিশা শর্টহ্যান্ড খাতা আর পেনসিল বের করে নিল ড্রয়ার থেকে। চেয়ার ঠেলে

উঠে দাঁড়াল।

শেখর বলল, 'লাঞ্চের সময় দেখা হচ্ছে—।'

বিদিশা ঘাড় নেড়ে মোজেইক করা মেঝেতে পা ফেলে এগিয়ে চলল প্রশান্ত চক্রবর্তীর টেবিলের দিকে।

এর মধ্যেই যে যার কাজে মন দিয়েছে। চায়ের গাড়ি ঢুকে পড়েছে ফ্লোরে। টেবিলে-টেবিলে চা পৌঁছে দিচ্ছে টি-বয়। ছেলেটা বিদিশাকে জিগ্যেস করল, 'ম্যাডাম, আপনার চা কোথায় দেব?'

বিদিশা ইশারায় ম্যানেজারের এক্সিকিউটিভ টেবিল দেখিয়ে দিল।

ঠিক তখনই ওদের বেয়ারা বনজারা এসে দাঁড়াল ওর কাছে। বলল, 'ম্যাডাম, আপনার ফোন।' আঙুল তুলে এক্সটেনশান লাইন দেখাল বনজারা।

বিদিশা এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল।

'হ্যালো—।'

'মানু, কেমন আছ?'

বিদিশার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসতে চাইল। ওর অফিসের ফোন নম্বর কী করে পেল রণজয়!

'মানু, কথা বলছ না কেন?' আকুল গলায় জানতে চাইল রণজয়, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিদিশা...মানু...প্লিজ, একবার আমাকে কথা বলার চান্স দাও—।'

'এটা অফিস। এখানে এভাবে ফোন করাটা ভালো দেখায় না—' ঠান্ডা গলায় বলল বিদিশা।

'কী বলছ, মানু! আমি তোমাকে ফোন করলে কে কী মনে করবে! আফটার অল আমি তোমার স্বামী।'

বিদিশা একটা ধাক্কা খেল। রণজয় ওর 'প্রাক্তন' স্বামী নয়—আইনের হিসেব অনুযায়ী 'বর্তমান' স্বামী। ওর মাথার ভেতরটা কেমন যেন করছিল। কী বলবে এখন রণজয়কে?

'অফিসের ফোন নাম্বার তুমি কোথায় পেলে?' বরফের গলায় জানতে চাইল বিদিশা।

ও-প্রান্তে পাগলের মতো হেসে উঠল বিদিশার স্বামী। হাসতেই লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর সহজ গলায় জবাব দিল, 'তোমাকে আমি প্রায়ই ফলো করি, তুমি টের পাও না। অফিসের আর-পাঁচটা লোকের সঙ্গে হইহুল্লোড় ফুর্তি করতে-করতে আমার কথা তুমি একেবারে ভুলেই গেছ। তোমাকে আমি দূর থেকে রোজ দেখি আর নতুন করে ভালোবাসায় পাগল হয়ে যাই—।'

অফিসের অপারেটর লাইন ট্যাপ করে যান্ত্রিকভাবে মন্তব্য করল, 'প্লিজ মেক ইট কুইক, ম্যাম। সো মেনি ইনকামিং কল্‌স আর ওয়েটিং।'

বিদিশার ভয় করছিল। যে-দুঃস্বপ্নটা মুছে গেছে বলে মাসতিনেক ধরে ও নিশ্চিন্ত ছিল। সেই দুঃস্বপ্নটা আবার কুৎসিতভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে।

ও ছোট্ট মেয়ের মতো জেদি গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। প্লিজ, গেট লস্ট ফ্রম মাই লাইফ।' কথার শেষে কেঁদে ফেলল বিদিশা।

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রণজয় 'ছিঃ, মানু, শুধু-শুধু কাঁদতে নেই। আজ সন্ধেবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলব। তখন বুঝবে, একা-একা আমি কী কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। এখন রেখে দিই? টা-টা। আই লাভ য়ু, লাভ।'

লাইন কেটে গেল।

অসাড় হাতে রিসিভার নামিয়ে রেখে কোমর থেকে রঙিন রুমাল বের করল বিদিশা। প্রাণপণে কান্না চেপে চোখ মুছল।

ইন্টারকম টেলিফোনটা আবার বাজতে শুরু করেছে। বিদিশার বুকের ভেতরেও পাগলাঘণ্টি বাজছে। সত্যিই কি আজ সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে দেখা করবে রণজয়? কোথায় দেখা করবে?

যেন অন্য কারও পায়ে ভর দিয়ে চক্রবর্তীসাহেবের টেবিলের দিকে এগোল বিদিশা। লক্ষ করল, নিজের সিট থেকে শেখর উদ্বিগ্ন চোখে ওকে দেখছে। আরও দু-একজন কোলিগের চোখে কৌতূহল। এখন কী করবে ও?

'কী ব্যাপার, বিদিশা, তোমাকে এত আপসেট দেখাচ্ছে কেন?' প্রশান্তলাল চক্রবর্তীর গলায় দরদ উথলে উঠছে 'আবার চা দিতে বলি? তোমার চা এতক্ষণে ঠান্ডা জল হয়ে গেছে।'

বিদিশা কোনওরকমে বলল, 'না, চা খাব না।' তারপর শর্টহ্যান্ড খাতা আর পেনসিল নিয়ে ডিকটেশান নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসল।

অফিসের দেওয়ালে বড়-বড় কাচের জানলা। জানলার বাইরের ভিজে মেঘলা আকাশ মন খারাপ করে দিচ্ছে। হঠাৎই একটা বিদ্যুৎ-রেখা চোখে পড়ল বিদিশার। বিদ্যুতের ঝিলিক দেখলেই ওর সেই ভয়ঙ্কর রাতটার কথা মনে পড়ে যায়। চেনা রণজয়ের ভেতর থেকে একটা অচেনা রণজয় হঠাৎই উঁকি মেরেছিল সেই রাতে।

সেদিনটাও ছিল আজকের মতোই মেঘলা। ঘন-ঘন বৃষ্টি পড়ছিল আকাশ ভেঙে। আর সেইসঙ্গে বিদ্যুতের আলপনা।

রণজয় বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে বাড়ি ফিরল। তখন রাত কত হবে? বড় জোর ন'টা। সকালে বেরোনোর সময় ও বলেই গিয়েছিল ফিরতে একটু দেরি হবে। তবে দেরি বলতে বিদিশা ভেবেছিল সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে। কারণ রোজ ও ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফেরে।

ওর হেড অফিস বালিগঞ্জে। বছরদুয়েক হল রণজয় হেড অফিসেই আছে। এখানে নতুন একটা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট উইং খোলা হয়েছে—ও-ই সেটার গ্রুপলিডার। কোনও-কোনও দিন অফিসের কাজে আটকে গেলে ও ফোন করে দেয় বাড়িতে।

বাড়িতে শুধু বিদিশা আর রণজয়ের মা। ছোট দোতলা বাড়ির একতলায় মা থাকেন,

দোতলায় রণজয়-বিদিশা। ঠিকে কাজের বউ দু-বেলা কাজ করে যায়।

কলিংবেলের ঘণ্টা শুনে বিদিশাই খুলে দিয়েছিল সদর দরজা।

ভিজে সপসপে রণজয় দরজায় দাঁড়িয়ে। রাস্তার মলিন আলো তেরছাভাবে এসে পড়েছে ওর ভিজে পোশাকে।

'আজ ছাতা না নিয়ে ভীষণ ভুল করেছি।' রণজয় হেসে বলল।

সদর দরজা বন্ধ করে ওর পিছন-পিছন শোওয়ার ঘরে এসেছিল বিদিশা। রণজয় অফিস থেকে অন্তত একটা ফোন করতে পারত বিদিশাকে! সারাটা সন্ধে ঘরে বন্দি হয়ে কারই-বা টিভি দেখতে ভালো লাগে!

'ফিরতে এত দেরি হল?'

বিদিশা প্রশ্নটা নির্দোষভাবেই করেছিল, কৈফিয়ত চাওয়ার জন্যে নয়।

রণজয় ওর দিকে পিছন ফিরে ভিজে জামা ছাড়ছিল গা থেকে। পলকে ঘুরে সপাটে এক চড় বসিয়ে বিদিশার গালে। বিদিশা ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে।

'কৈফিয়ত দেওয়া আমি পছন্দ করি না।' কঠিন গলায় মন্তব্য করেছিল রণজয়।

বিদিশা হঠাৎই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। গালে হয়তো ব্যথা পেয়ে থাকবে, কিন্তু সেই ব্যথাটা ও টের পাচ্ছিল না। কারণ, ভালোবাসার পুরুষ রণজয়ের আচরণ ওকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

বাইরে মেঘ ডাকছিল। কিন্তু বিদিশার মনে হচ্ছিল মেঘ ডাকছে ওর বুকের ভেতরে। মেঝেতে আধশোয়া অবস্থায় ওর শরীর কাঁপছিল থরথর করে।

ভিজে জামাটা মেঝেতে একপাশে ফেলে দিয়ে রণজয় এগিয়ে এল বিদিশার কাছে।

বিদিশা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। ওর ঠোঁটের কোণ জ্বালা করছিল। বোধহয় কেটে গেছে।

রণজয় ওকে সাবধানে তুলে বসাল বিছানায়। বিদিশা তখন মাথা নিচু করে কাঁদছে। ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে।

'কেঁদো না, মানু, কেঁদো না—' ওকে আদর করে বোঝাতে চাইছিল রণজয় 'অন্যায় করেছ, তার শাস্তি পেয়েছ—ব্যস, মিটে গেছে।'

মিটে গেছে! চোখ মুছে অচেনা রণজয়কে দেখতে চাইল বিদিশা। কিন্তু ততক্ষণে চেনা রণজয় আবার ফিরে এসেছে। দু-চোখে ভালোবাসা। আর দু-হাতে আদর করছে বিদিশাকে। বিদিশা কাঠ হয়ে বসেছিল।

কিন্তু রণজয়ের আদর বাড়তেই লাগল।

ওর ভিজে প্যান্ট থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল মেঝেতে। গায়ের ভিজে গেঞ্জিটা একটানে খুলে ফেলল রণজয়। পরক্ষণে প্যান্ট ইত্যাদিও।

বিদিশা প্রথম ধাক্কাটা তখনও সামলে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় ধাক্কাটাও পারল না।

রণজয় খ্যাপা ষাঁড়ের মতো হিংস্রভাবে আদর করতে লাগল ওকে। জামাকাপড় লন্ডভন্ড হয়ে গেল। সেই সঙ্গে বিছানাও।

ঘরের টিউব লাইট নির্লজ্জভাবে জ্বলছে। জ্বলছে বিদিশার শরীরটাও। বাইরে মেঘের

ডাক যেন রণজয়ের গর্জন। তীব্র এক জ্বালায় ওর শরীরটা বিদিশাকে আঁকড়ে মরিয়া হয়ে ছটফট করছে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বিদিশার ভেতরেও।

একসময় মেঘের গর্জন, বৃষ্টি—দুই-ই কমে এল। অসাড় মন নিয়ে বিদিশা এলোমেলোভাবে পড়ে রইল বিছানায়। শুধু ওর ক্লান্ত দুটো চোখ রণজয়কে দেখতে লাগল। এই মানুষটাকে ও ভালোবেসে সাতমাস আগে বিয়ে করেছিল!

রণজয় একটা পাজামা আর গেঞ্জি পরে নিয়ে পাখার বাতাসে চুল শুকোচ্ছিল। মাথার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে ও নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'খেতে দাও। খিদে পেয়েছে।'

বিদিশা সেই রাতেই মনে-মনে টের পেয়েছিল ওর বিয়েটা মরে গেছে।

কিন্তু তার পরেও সতেরোটা মাস ওকে সেই লাশটাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। অবশ্য তারপর আর পারেনি।

'থ্যাংক য়ু, বিদিশা। তুমি টেবিলে গিয়ে রেস্ট নাও। এই চিঠিগুলো সেকেন্ড হাফে টাইপ করে দিলেও চলবে।'

বিদিশা চমকে উঠে খেয়াল করল প্রশান্ত চক্রবর্তী ওর সঙ্গে কথা বলছেন। বিদিশা ওর হাতের শর্টহ্যান্ড খাতার দিকে দেখল। দেখে অবাক হয়ে গেল। পুরোনো কথা ভাবতে-ভাবতেও কী করে যেন যান্ত্রিকভাবে ও ডিকটেশান নিয়ে ফেলেছে।

'স্যার, আমি ভাবছি—' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিদিশা।

প্রশান্ত চক্রবর্তী কথাটা বোধহয় শুনতে পাননি। কারণ, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন ওর দিকে। কানে খাটো বলে সবসময় ওঁর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। এখন বিদিশার চেঁচাতে ভালো লাগছিল না।

'যদি দরকার হয় বোলো—ছুটির পর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। তোমাকে ভীষণ আপসেট দেখাচ্ছে।'

বিদিশা কোনও জবাব না দিয়ে ফিরে গেল নিজের সিটে।

ওদের সেকশানে তিনটে এক্সটেনশান লাইন আছে। তিনটে টেলিফোনের দিকেই ভয়ে-ভয়ে দেখছিল বিদিশা। এই বুঝি একটা ফোন বেজে উঠল, আর কেউ ফিসফিসে গলায় বলে উঠল, 'মানু, কেমন আছ?'

টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল বিদিশা। শরীরটা কেমন লাগছে। সেইসঙ্গে ঝিমুনি ভাব। রণজয় বলেছে, আজ সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলবে। কখন দেখা করবে? দেখা করে কী বলবে?

অফিস ছুটির সময় যতই কাছে এগিয়ে আসছিল, বিদিশার ভয় ততই বাড়ছিল। রণজয়ের কথা কাকে বলবে ও? শেখরকে? বোসদাকে? নাকি চক্রবর্তীসাহেবকে?

অফিসে কেউ জানে না বিদিশার বিয়ে হয়েছে। কপালে বা সিঁথিতে কোনওরকম সিঁদুরের ছোঁয়া নেই। নামও বিদিশা রায়—সুধাময় রায় ও অরুণা রায়ের মেয়ে। এখন

যদি ও হঠাৎ করে কাউকে বলে ওর একটা স্বামী আছে, তাহলে কেমন শোনাবে ব্যাপারটা?

সারাটা দিন এরকম তোলপাড় মন দিয়ে কেটে গেল বিদিশার। বিকেলে হঠাৎই একসময় ওর খেয়াল হল অফিস ছুটি হয়ে গেছে।

ছুটির পর ওরা বেশ কয়েকজন দল বেঁধে পার্ক স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত যায়। তারপর কেউ পাতাল রেল, কেউ বাস কিংবা মিনিবাস, আর কেউ-বা চার্টার্ড বাসের যাত্রী হয়ে যে-যার দিকে চলে যায়।

বিদিশার সঙ্গে শেখর আর বোসদা প্রায় রোজই বেরোন। আজ ওঁরা দুজন ছাড়াও রয়েছে জুনিয়ার ড্রাফট্‌স্‌ম্যান অশোক চন্দ্র, রিসেপশনিস্ট দেবলীনা পাল, টাইপিস্ট অতনু সরখেল আর অ্যাকাউন্ট্‌স-এর সুতপা দাস।

সুতপাদি আর দেবলীনা ক্যামাক স্ট্রিটে কীসব কেনকাটা করবে বলে চলে গেল।

অতনু সরখেল রোজই ধর্মতলা পর্যন্ত হেঁটে যায়, তারপর সেখান থেকে হাওড়ার বাস ধরে। তাই ও রাস্তা পার হয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে চলে গেল।

শেখর থাকে টালিগঞ্জে। পাতাল রেলে যাতায়াত করে। বোসদা থাকেন শোভাবাজারে। তিনিও পাতালযাত্রী। অশোক চন্দ্রর বাড়ি রাজাবাজারের কাছে। ও পার্ক স্ট্রিটের মোড় থেকে বাস ধরে।

বিদিশা ভাবছিল, কার সঙ্গে বেশিক্ষণ ও থাকতে পারে। রণজয় ওকে প্রায়ই ফলো করে, বিদিশা টের পায় না। এখনও কি ফলো করছে না কি? ঘাড় ঘুরিয়ে বেশ কয়েকবার পিছনে তাকাল বিদিশা। কিন্তু অফিস ছুটির ভিড় আর গাড়ির ব্যস্ততার মধ্যে ফরসা রোগা চেহারার কোনও মানুষকে খুঁজে পেল না।

শেখর বলল, 'কী ব্যাপার, ম্যাডামকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে—।'

বিদিশা ইতস্তত করে বলল, 'হ্যাঁ, একটু ঝামেলা হয়েছে। পরে বলব।'

বোসদা পান চিবোতে-চিবোতে বললেন, 'এ কী ধরনের পারশিয়ালটি, মা জননী? সেনসাহেবকে বলবেন, আর আমি বাদ! আমি কি বুড়ো বলে এজ বারে আটকে গেলাম?'

ওরা তিনজনই হেসে উঠল।

তখন অশোক বলল, 'ঠিক বলেছেন, বোসদা, আপনি বুড়ো বলে, আর আমি ছোট বলে এজ বারে আটকে গেছি।'

এইরকম হাসি-ঠাট্টা করতে-করতে ওরা পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে গেল।

বিদিশা পাগলের মতো ভাবছিল, কী করবে।

অশোক চন্দ্র রাস্তা পার হয়ে বাস স্টপের দিকে চলে গেল।

তখন বিদিশা আচমকা বলে উঠল, 'বোসদা, আমি আপনার সঙ্গে মেট্রোতে যাব। শোভাবাজারে নেমে অটো ধরব।'

শেখর একটু অবাক হয়ে গেল। কারণ, বিদিশা সাধারণত বাসে যায়। কিন্তু কিছু

বলল না।

বোসদা শেখরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বললেন, 'সেন মহাশয়, আমাকে তুমি যতটা বুড়ো ভাবো ঠিক ততটা বুড়ো আমি নই।'

উত্তরে শেখর হাসল।

ওরা তিনজনে কথা বলতে-বলতে মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। তখনও বিদিশা পিছন ফিরে শেষবারের মতো রণজয়কে খুঁজল।

সল্ট লেকের সি. এ. পি. ক্যাম্প বাস স্টপে যখন নামল, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ব্যাগ থেকে ছাতা বের করে মাথায় দিল বিদিশা।

চৌরাস্তার আইল্যান্ডটা জালের বিশাল ঘেরাটোপে ঢাকা। একসময়ে এটা পাখির খাঁচা ছিল। এখন পাখি নেই—শুধু শূন্য খাঁচা পড়ে আছে।

খাঁচাটাকে বাঁ দিকে রেখে রাস্তা পার হল বিদিশা। বাস স্টপে মাত্র তিন-চারজন মানুষ। প্রত্যেকেরই মাথায় ছাতা। রাস্তার আলোয় ছাতার ভিজে কাপড় চিকচিক করছে।

বিদিশা ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। অফিস ছ'টায় ছুটি হলেও দু-একদিন এমনই দেরি হয়ে যায়। উলটোডাঙার রেল ব্রিজের নীচটায় জ্যাম থাকে। আজও তাই।

সি. এ. পি. ক্যাম্প স্টপেজে বিদিশা একাই নেমেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা নিরাকার আতঙ্ক বাসা বেঁধে রয়েছে ওর মনে। তাই ভিজে রাস্তায় চটপট পা ফেলে ও হাঁটা দিল।

ওর বাড়ি সি. ই. ব্লকে। সুইমিং পুলের মোড় ছাড়িয়ে প্রায় আর-এক চৌরাস্তার মোড়ের কাছাকাছি। সেখানেও একটা পাখির খাঁচা আছে।

আজ সারাটাদিন মেঘলা আর বৃষ্টি। তাই রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। কখনও-কখনও একটা-দুটো বাস ছুটে যাচ্ছে। সেই শব্দ মিলিয়ে গেলেই এলাকাটা একেবারে চুপচাপ।

রাস্তায় কয়েকটা নেড়ি কুকুর বৃষ্টির মধ্যেই ঝগড়া করছে। পরদা ঢাকা একটা সাইকেল রিক্সা সুইমিং পুলের দিকে চলে গেল। সামনে যতদূর নজর চলে, কোনও মানুষজন নেই। এমনকি সাইকেল রিক্সা স্ট্যান্ডেও কোনও রিক্সা দাঁড়িয়ে নেই।

বিদিশা পিছন ফিরে একবার দেখল। না, সন্দেহজনক কাউকে নজরে পড়ছে না। রণজয় কি তাহলে মিথ্যে ভয় দেখাল! কিন্তু ভয় দেখানোর প্রশ্ন উঠছে কেন? একজন স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চায়। এর মধ্যে ভয়ের কী আছে! ভয়ের কিছু থাকত না, যদি-না বিদিশা রণজয় সম্পর্কে কিছু কথা জেনে ফেলত। যে-রাতে ও কথাগুলো জানতে পেরেছিল সেই রাতেই রণজয় ওর বাঁ গালে ভালোবাসার স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল।

সুইমিং পুলের মোড়টা ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগোতেই বিদিশার নিজেকে আরও একা মনে হল। রাস্তার কোনও আলো জ্বলছে না। তবুও সামনের আইল্যান্ডের প্রকাণ্ড খাঁচাটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। আর-একটু এগোলেই ডান দিকের সরু গলিটা পেয়ে যাবে বিদিশা। তারপর এক মিনিটেই পৌঁছে যাবে বাড়ির দরজায়।

উলটোদিকের রাস্তায় সি. এফ. ব্লকের বাড়িগুলোর ধার ঘেঁষে একটা মারুতি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির ছাদে আলো পড়ে বৃষ্টির জল চিকচিক করছে। কিন্তু গাড়ির রং ঠিকমতো ঠাহর করা যাচ্ছে না।

রণজয়ের গাড়ি নেই। অন্তত বিদিশা যখন ওকে ছেড়ে চলে আসে, তখন ছিল না। বিদিশার বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। ওই তো, কাঠগোলাপ গাছটা এসে গেছে! তার পাশ দিয়েই সরু গলিটা চলে গেছে। গলির শেষে পিচের রাস্তা। রাস্তার শেষে বিদিশার বাড়ি।

আজকের দিনটা কোনওরকমে তাহলে কাটল। ভাবল বিদিশা।

আর ঠিক তখনই মারুতি গাড়িটার তীব্র হ্যালোজেন হেডলাইট জ্বলে উঠল। বিকট গর্জন করে পাগলের মতো বাঁক নিয়ে গাড়িটা ছুটে এল বিদিশার দিকে।

আপ আর ডাউন লেন—দু-রাস্তার মাঝে সরু একফালি ঘাসে ঢাকা জমি। জমিটা রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। আড়াআড়ি আসতে গিয়ে দ্রুতগতির গাড়িটা উঁচু জমিতে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপরই বিশ্রী গর্জন করে ঠিকরে এল বিদিশাকে লক্ষ করে।

বিদিশা চিৎকার করতে গিয়ে টের পেল ওর গলা দিয়ে কোনওরকম আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলো ওকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। হ্যালোজেন বাতির আলোয় বৃষ্টির ঝিরঝিরে ফোঁটাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ও একপাশে সরে যেতে গিয়ে হোঁচট খেল। টাল খেয়ে নিজেকে সামলে নিতে পারলেও ছাতাটা পড়ে গেল হাত থেকে।

গাড়িটা ওর ঠিক পাশ দিয়ে খ্যাপা জন্তুর মতো ছুটে গেল। তারপর বিশ্রী শব্দ তুলে ব্রেক কষে একটা ঝটকা দিয়ে থামল।

পরক্ষণেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে 'ইউ' টার্ন নিল গাড়িটা। বিদিশা তখন বৃষ্টি-ভেজা পিচের রাস্তা ধরে পাগলের মতো ছুটছে।

গাড়িটা এবারে ধেয়ে এল আরও জোরে। বিদিশার গায়ে মরণের বাতাস ছুঁইয়ে ওর ঠিক গা ঘেঁষে ঠিকরে গেল সামনে। কিছুটা গিয়ে আচমকা ব্রেক কষল। তারপর গর্জন তুলে বাঁক নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিদিশার মুখোমুখি। আবার পাগল-করা গতিতে ছুটে এল ওর দিকে।

বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, বৃষ্টি-ভেজা কালো রাতে গাড়িটা বিদিশাকে নিয়ে ঠিক সেরকম খেলতে লাগল। ইঞ্জিনের গর্জন, হেডলাইটের তীব্র আলো, চাকার শব্দ মেয়েটাকে একেবারে দিশেহারা করে দিচ্ছিল। এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করতে-

করতে ও ধাক্কা খেল কাঠগোলাপ গাছটার গুঁড়িতে। পলকের জন্য শরীরটা একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি খেল। তারপরই ও পড়ে গেল মাটিতে।

গাড়িটা ওকে লক্ষ করে ছুটে আসছিল। ওকে পড়ে যেতে দেখেই গাড়িটা থামল। হেডলাইটের উজ্জ্বল চোখ বিদিশার দিকে স্থির।

বিদিশা কেমন অসাড় হয়ে গেলেও চেতনা হারায়নি। ও তাকিয়ে ছিল মারুতি গাড়িটার দিকে। কিন্তু চোখ-ধাঁধানো আলোয় স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু বৃষ্টির ফোঁটা ঝিরঝির করে পড়ছে।

গাড়ি থেকে কেউ নামল। কারণ, দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ হল। তারপর হেডলাইটকে আড়াল করে একটা রোগা শরীর অলস পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল বিদিশার দিকে।

বিদিশা চিৎকার করতে চাইছিল, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোচ্ছিল না। ওর চোখ সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল এগিয়ে আসা কালো ছায়াটার দিকে।

একসময় মানুষটার তীব্র ছায়া এসে পড়ল বিদিশার গায়ে। আর তখনই আলতো গলায় সে বলে উঠল, 'মানু, কেমন আছ?'

বিদিশার শীত-শীত করে উঠল। ওর শাড়ি বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে। কাঁধের ব্যাগ কোথায় ছিটকে পড়েছে। গলার কাছে একটা পাথরের বল আটকে রয়েছে—কিছুতেই ওকে চিৎকার করতে দিচ্ছে না। শুধু চাপা 'আঁক-আঁক' শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। ওর চেতনার জগৎ ঘিরে রয়েছে চোখ-ধাঁধানো হেডলাইটের আলো, একটা লিকলিকে কালো ছায়া, আর শ্বাস রোধ করা এক আতঙ্ক।

ওর ফরসা মুখের সৌন্দর্য কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। আতঙ্কে কুঁকড়ে যাওয়া মুখ দেখে ওকে মোটেই চেনা যাচ্ছিল না। জল-কাদা মাখা ওর অসহায় শরীরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। বিদিশার সেদিকে কোনও খেয়াল নেই।

অশরীরী ছায়াটা চেনা গলায় আবার কথা বলল, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে মানু। তোমাকে ছেড়ে আমি ভীষণ কষ্টে আছি। এতদিন এ-কষ্ট টের পাইনি, কিন্তু এখন টের পাচ্ছি। তুমি আমার কাছে ফিরে এসো। আমার ফাঁকা জায়গাটা ভরে দাও। নইলে আমি মরে যাব...বিশ্বাস করো। তুমি আমার বাড়িতে—উঁহু, "আমার" বাড়িতে নয়, "তোমার" বাড়িতে ফিরে এসো, তোমাকে অনেক কথা বলব। আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারো না, মানু? মানুষের কি ভুল হয় না! অনুতাপে-অনুতাপে আমি জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো—।'

লোকটা শেষ দিকে কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে-কাঁদতে বিদিশার আরও কাছে এগিয়ে এল। যখনই সে বিদিশার ওপরে ঝুঁকে পড়তে গেল, তখনই যেন গলার স্বর খুঁজে পেল ও।

কান-ফাটানো এক মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল বিদিশা। হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া কোণঠাসা পশু যেভাবে চিৎকার করে, অনেকটা সেইরকম। বৃষ্টি-ভেজা রাতে সে-

চিৎকারের প্রতিধ্বনিও যেন শুনতে পেল ও। আর একইসঙ্গে শুনতে পেল ছুটে-আসা কয়েকটা পায়ের শব্দ।

রাস্তার ধারের কয়েকটা বাড়ির দরজা-জানলা খুলতে শুরু করেছে। হেডলাইটের আলো পেরিয়ে চৌকো আলোর খোপগুলো আবছাভাবে দেখতে পেল বিদিশা। ওর গলার ভেতরটা জ্বালা করছিল। সেই অবস্থাতেও ও আরও দুবার চিৎকার করে উঠল।

বিদিশা দেখতে পেল, ছায়ামূর্তিটা কয়েক মুহূর্ত দোনামনা করে এদিক-ওদিক পা বাড়াল। তারপর এক ছুটে গাড়িতে গিয়ে উঠল। জোরালো শব্দে বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির দরজা। তারপর তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো বেপরোয়া বাঁক নিয়ে গাড়িটা ছিটকে চলে গেল দূরে। যাওয়ার সময় রাস্তার কাছ ঘেঁষে রাখা একটা ইটের পাঁজায় গাড়ির বাঁ দিকের হেডলাইটা ধাক্কা খেল। ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙল, আলো নিভে গেল। চাকায় বিশ্রী ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে আঁকাবাঁকা পথে ছুট লাগাল গাড়িটা। মিশে গেল রাতের আঁধারে।

বিদিশা বোধহয় কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কারণ, হঠাৎই ও দেখতে পেল, ও দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দু-পাশ থেকে ধরে রয়েছে দুজন পথচারী। একজন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে ওর ছাতা আর ব্যাগ। আর-একজন ওকে জিগ্যেস করছে, 'কী হয়েছে, দিদি?'

লোকগুলোকে একপলক দেখল বিদিশা। দুজনকে দেখে রাজমিস্ত্রি বা রিকশাওয়ালা বলে মনে হয়। তারাই আজ বিদিশাকে বাঁচিয়েছে।

বিদিশা থরথর করে কাঁপছিল। কোনওরকমে ও বলল, 'আমি বাড়ি যাব।'

'কোথায় বাড়ি বলুন, আমরা এগিয়ে দিয়ে আসছি—' একজন বলল।

বিদিশা মাথা নেড়ে জানাল, না। তারপর ধীরে-ধীরে পা ফেলে বাড়ির দিকে এগোল। দুজন ওর পাশে-পাশে পা ফেলে এগিয়ে দিয়ে গেল 'অরুণা-সুধাময়' পর্যন্ত।

কলিংবেলের শব্দে দরজা খুললেন অরুণা। বিদিশার মুখ-চোখ-পোশাক দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে রে?'

বিদিশা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে-করতে বলল, 'আগে এক গ্লাস জল দাও।'

অরুণা আর কোনও কথা না বলে ব্যস্ত পায়ে জল আনতে চলে গেলেন।

বিদিশা ক্লান্ত পা ফেলে ওর ঘরে এল। হাতব্যাগ আলনায় ঝুলিয়ে ছাতাটা খুলে মেলে দিল পাখার হাওয়ায়। ভিজে কাপড়ে একটু-একটু শীত করছিল। আর একইসঙ্গে বিদিশা বুঝতে পারছিল, ওকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা রণজয়ের মাথায় যখন একবার ঢুকেছে, তখন সহজে ও ছাড়বে না। রণজয়কে বিদিশা যেভাবে চেনে, আর কেউ সেভাবে চেনে না। ওর অনেক ব্যাপার কাউকে খুলে বলেনি বিদিশা—বলতে পারেনি।

মা জল নিয়ে এলেন।

এক ঢোকে গ্লাসটা খালি করে দিল ও। তারপর একটা বড় শ্বাস ছাড়ল।

অরুণা আবার জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে বললি না তো!'

'রণজয়ের ব্যাপার। ও আবার আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছে।'

অরুণার ভুরু কুঁচকে গেল। কিন্তু বিদিশা আর কোনও কথা না বলে শুকনো জামাকাপড় নিয়ে চলে গেল বাথরুমের দিকে। অরুণা জানেন, নিজে থেকে না বললে কোনও কথা বের করা যাবে না এই মেয়ের মুখ থেকে।

বারান্দার লাগোয়া ঘরে টিভি চলছে। বাবা টিভি দেখছেন। গাছপালা, টিভি আর খবরের কাগজ—এই নিয়ে বেশ আছেন। তবে ছোটবেলা থেকেই বিদিশা আর বাপ্পাকে শিখিয়েছেন যদি বাঁচতেই হয়, মাথা উঁচু করে বাঁচবে।

বাথরুমে ঢোকার সময় বিদিশা বাপ্পার গলা শুনতে পেল। ওর ছোট্ট ঘরে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছে। পড়া শেষ করেই ও ছুটে আসবে বিদিশার কাছে। ক্যাডবেরির খোঁজ করবে। আজ নানান দুশ্চিন্তায় ওর ক্যাডবেরির ব্যাপারটা ভুলেই গেছে বিদিশা।

মা-বাবা আর ছোট ভাইকে নিয়ে কী সুন্দরভাবেই না জীবন কাটাচ্ছিল বিদিশা! কোথা থেকে এক দুঃস্বপ্নের মতো এসে হাজির হল রণজয়। মাস-তিনেক আগেও লিগাল সেপারেশান আর ডিভোর্সের ব্যাপারে দিব্যি রাজি ছিল। এখন হঠাৎ মাথা বিগড়ে গেছে।

আর কেউ না জানুক, অন্তত বিদিশা তো জানে, হঠাৎ-হঠাৎ মাথা বিগড়ে যাওয়াটা রণজয়ের অসুখ। তার ওপরে রয়েছে ওর অস্বাভাবিক বড় মাপের অ্যাসিমেট্রিক স্কালের ব্যাপারটা। ওর মাথার খুলিকে নাক বরাবর লম্বালম্বি ভাগ করলে দুটো ভাগ মোটেই সমান পাওয়া যায় না। বাঁ দিকের ভাগটা ডান দিকের তুলনায় অনেক বড়। ডাক্তারি মতে এরকম অপ্রতিসম করোটি খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

বাথরুমে গা ধুয়ে কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে রণজয়ের কথা ভাবছিল বিদিশা। ও মিথ্যে বলেনি। ও নিয়মিত অনুসরণ করছে বিদিশাকে—সে অফিস-পাড়াতেই হোক বা সল্ট লেকেই হোক। ফোন করে আর ফলো করে রণজয় তো ওকে পাগল করে দেবে!

আচ্ছা, শেখরকে একটা ফোন করলে কেমন হয়?

প্রশ্নটা নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করল বিদিশা। তারপর ঠিক করল, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শেখরকে ফোন করবে। রাতে ও পাড়ার ক্লাবে আড্ডা মারতে বেরোয়, শেখরই বলেছে। বাড়ি ফেরে সাড়ে দশটা নাগাদ। তারপর নতুন কোনও পেপারব্যাক নিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। অবশেষে বই পড়তে-পড়তে ঘুম।

বেশ আছে মানুষটা! ওকে হিংসে করতে ইচ্ছে হল বিদিশার। কী চমৎকার দুশ্চিন্তাহীন সুখী জীবন! রণজয়কে নিয়ে এইরকমই একটা জীবন চেয়েছিল বিদিশা। অথচ সব কীরকম গোলমাল হয়ে গেল।

সেই ভয়ঙ্কর রাতের পর থেকে রণজয়ের অস্বাভাবিক এলোমেলো আচরণ আরও বেশি করে নজরে পড়েছিল বিদিশার। ও খুব সাবধানে কথা বলত রণজয়ের সঙ্গে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও রেহাই পায়নি। রণজয়ের মা ওকে রেহাই পেতে দেননি।

বিয়ের পর সেই মেঘ-বৃষ্টির রাতে প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল বিদিশা। সারাটা রাত

ও ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কিন্তু নিজের অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে ও দায়ী করবে? ও-ই তো ভালোবেসে বিয়ে করেছিল রণজয়কে!

পরদিন রণজয় অফিসে বেরিয়ে গেলে ও দুপুরের দিকে মাকে ফোন করেছিল।

'মা, মানু বলছি—।'

'হ্যাঁ, বল, কী খবর?' অরুণা সহজ গলায় কথা বলেছেন।

'আমি খুব....খুব....ঝামেলায়....' চোখে জল এসে গেছে বিদিশার। গলা ধরে গিয়ে কথা আটকে গেছে মাঝপথে।

'কী হয়েছে, মানু?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন অরুণা 'কাঁদছিস কেন? রণজয় কিছু বলেছে?'

'ন্-না।' একটু চুপ করে থেকে বিদিশা বলেছে, 'আমি তোমাদের কাছে গিয়ে ক'দিন থাকব, মা—।'

'মন খারাপ লাগলে তুই আজই চলে আয়। তুই এলে বাপ্পাও খুশি হবে, আমাদেরও ভালো লাগবে।'

বিদিশা ফোন ছেড়ে দিয়ে মনে-মনে ঠিক করেছিল সেদিনই চলে যাবে সল্ট লেকের বাড়িতে।

রণজয় অফিস থেকে সাড়ে ছ'টা নাগাদ ফিরে এল। হাত-মুখ ধুয়ে ওর কাছে এসে দু-গাল চেপে ধরল দু-হাতে। কয়েকটা আদরের চুমু খেয়ে বলল, 'চলো, তোমাকে সল্ট লেকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তবে চারদিনের বেশি থেকো না। আমি এখানে বোর হয়ে যাব।'

বিদিশা হতবাক হয়ে গেল। রণজয় কি মন পড়ে নিতে জানে? ও কী করে জানল যে, বিদিশা সল্ট লেকে যাবে বলে মন ঠিক করেছে! কিন্তু গতকাল রাতের কথা ভেবে কোনও প্রশ্ন করল না বিদিশা। কিন্তু মনের ভেতরে একটা কাঁটা খচখচ করতেই লাগল।

বেশ মনে পড়ে, ওকে ভালোবেসে অত্যন্ত যত্ন করে সল্ট লেকে পৌঁছে দিয়েছিল রণজয়।

বাপ্পার জন্য ও একটা বড় ক্যাডবেরি চকোলেট কিনে নিয়ে গিয়েছিল। হেসে-হেসে কথা বলেছিল মা-বাবার সঙ্গে।

বিদিশা অবাক হয়ে দেখেছিল চেনা রণজয়কে। তাই শেষ পর্যন্ত মাকে কোনও কথা বলতে পারেনি ও। ভেবেছে, গতকাল রাতের ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা।

সল্ট লেকে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে রণজয় ফিরে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে।

তারপর বেশ কয়েকটা দিন স্বাভাবিকভাবে কেটে গেছে। অচেনা মানুষটা মাথা চাড়া দেয়নি চেনা রণজয়ের ভেতর থেকে। কিন্তু একটা ব্যাপার অবাক হয়ে লক্ষ করত বিদিশা। সারাদিন অফিসে কাটালেও রণজয় ওর অনেক কথা টের পেয়ে যেত।

অনেকদিন ধরেই একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধছিল বিদিশার মনে। সন্দেহটা ঠিক কিনা সেটা যাচাই করতে একদিন ও মাকে ফোন করল। তারপর কথায়-কথায় বাপ্পার লেখা-

পড়ার কথা জিগ্যেস করল। বিদিশা জানে বাপ্পার পড়াশোনার কথা জিগ্যেস করলে মা সাতকাহন জবাব দেয়। তাই মাকে প্রশ্ন করেই ও রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছে টেবিলে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে-টিপে নেমে এসেছে একতলায়।

রণজয়ের মায়ের ঘরে সন্তর্পণে উঁকি মেরে বিদিশা দেখল, ও যা ভেবেছে তাই। এ-বাড়িতে টেলিফোনের প্যারালাল লাইন আছে। একটা দোতলায় বিদিশাদের শোওয়ার ঘরে, আর-একটা রণজয়ের মা তরুবালার ঘরে।

সেই বিধবা ভদ্রমহিলা এখন টেলিফোনের রিসিভার কানে চেপে ধরে একমনে আড়ি পেতেছেন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি পরে ফোন করবেন ছেলের অফিসে, গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো ঢেলে দেবেন ওর কানে।

প্যারালাল লাইনে খুব সহজেই আড়ি পাতা যায়। একটা টেলিফোনে কেউ ফোন করলে অন্য টেলিফোনটায় টিক-টিক শব্দ হয়।

বিদিশার সামান্য নড়াচাড়া তরুবালা বোধহয় টের পেয়েছিলেন। কারণ, চকিতে চোখ ফেরালেন দরজার দিকে। রিসিভার তখনও কানে ধরা।

না, বিদিশাকে দেখে রণজয়ের মা বিশেষ বিচলিত হননি। সবসময় হুকুম করতে অভ্যস্ত এই মহিলা সহজে হার মানেন না। বিয়ের পরেও রণজয়কে বাচ্চা ছেলে মনে করে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বিদিশার সামনেও এই ধরনের হুকুম করতে তাঁর বাধে না।

রণজয় এমনিতে যতই দাপট দেখাক না কেন, মা তরুবালার কাছে সে বাধ্য শিশু। তরুবালার শরীরে শক্ত বাঁধুনি, মনেও তাই। চোখের দৃষ্টি তীব্র, যেন গভীরতা মাপার যন্ত্র। যেসব শাড়ি-জামাকাপড় পরেন তাতে সাদার ভাগ কম। তবে সিঁথি শূন্য।

'কিছু বলবে, বিদিশা?' অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় জিগ্যেস করলেন তরুবালা। প্যারালাল টেলিফোন লাইনে অকারণে রিসিভার কেন কানে চেপে ধরে আছেন তার কৈফিয়ত ছেলের বউকে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

বিদিশা হেরে গেল। কী বলবে ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত 'না, কিছু না—' বলে ফিরে এসেছিল দরজা থেকে। চলে আসার আগে তরুবালার কৌতুকের স্মিত হাসি নজরে পড়েছিল ওর।

দোতলায় এসে বিদিশা যখন আবার ফোনে কথা বলল তখন অরুণা মেয়েকে নানান প্রশ্ন আর বকাবকি শুরু করলেন। মেয়ে কোনও জবাব দিল না। ওর ক্রমশ নিজেকে বন্দি বলে মনে হচ্ছিল।

টেলিফোন রেখে দিয়ে বিছানায় খোলা জানলার কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছিল ও। তখন পাশের বাড়ির প্লাস্টার চটে যাওয়া ফাটল-ধরা দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা কচি অশ্বত্থ গাছ ওকে দেখছিল। দুপুরের নির্জন পরিবেশে ট্রামের চাকার ঘরঘর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল বিদিশা। লোহায়-লোহায় ঘর্ষণ। সেই আঘাতের যন্ত্রণা ও টের পাচ্ছিল। ট্রামটা যেন ওর বুকের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

বাথরুমের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল। বিদিশা চমকে উঠে প্রায় ভয়ের গলায় বলে

উঠল, 'কে?'

'তোর জন্যে চা করেছি—জুড়িয়ে যাচ্ছে।' মায়ের গলা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল বিদিশা। রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে চায়ের কাপ নিল। তারপর ডাইনিং হলের টেলিফোনটার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে শেখর সেনের নম্বর ডায়াল করল ও।

বিদিশাদের বাড়িতেও ফোনের প্যারালাল লাইন। একটা ডাইনিং হলে, আর একটা মা-বাবার শোওয়ার ঘরে। কিন্তু টেলিফোনে আড়ি পাতার অভ্যেস নিয়ে ওরা মানুষ হয়নি।

'হ্যালো, শেখর সেন আছেন?' ও-প্রান্তের মহিলা কণ্ঠের 'হ্যালো' শোনামাত্রই প্রশ্নটা করল বিদিশা। গলা শুনে ওর মনে হল বোধহয় শেখরের বউদি ফোন ধরেছেন।

'ধরুন। দিচ্ছি।'

একটু পরেই চেনা গলার 'হ্যালো' শুনতে পেল বিদিশা।

'আমি বিদিশা বলছি।'

'আরে, বলুন আপনার জন্যে কী শিভাল্‌রি দেখাতে পারি।' হাসিখুশি গলায় বলল শেখর।

'না, না, বড়সড় কোনও শিভাল্‌রি দেখাতে হবে না। শুধু কাল অফিসে আধঘণ্টা আগে আসতে হবে—পারবেন?'

'না পারার কী আছে! কিন্তু কেসটা কী বলুন তো, ম্যাডাম?'

'কাল বলব। মন-টন বেশ শক্ত করে আসবেন।' নিজের অজান্তেই হাসি-ঠাট্টার মেজাজটা ফিরে পাচ্ছিল বিদিশা। মারুতি গাড়ির ঘটনাটা যেন মুছে গেছে ওর মন থেকে।

'কেন, মন শক্ত করব কেন? আমার আপনার ক্লোজ ইয়ের মাঝখানে কোনও উটকো থার্ড পার্টি এসে গেছে নাকি?' হেসে জিগ্যেস করল শেখর।

বিদিশাও পালটা ঠাট্টা করে জবাব দিল, 'সে তো বরাবরই আছে। আমাদের বোসদা। তা ছাড়া ফোর্থ পার্টিকেও তো আপনি চেনেন—মহান মহামান্য প্রশান্তলাল চক্রবর্তী।'

ও-প্রান্তে জোর গলায় হেসে উঠল শেখর 'এতগুলো পার্টিকে আমি কেমন করে ঠেকাই বলুন তো, ম্যাডাম?'

'না, শেখর, সিরিয়াসলি বলছি। কাল আপনাকে অনেকগুলো জরুরি কথা বলব।' একটু ইতস্তত করে বিদিশা আরও বলল, 'কিন্তু ভয় হচ্ছে, আপনি আমার জন্যে না বিপদে জড়িয়ে পড়েন...।'

বিদিশার কথা শেষ হওয়ার আগেই কথা বলে উঠল শেখর, 'বিপদ! মানে থ্রিল? আপনি তো জানেন, থ্রিলিং ব্যাপার আমার দারুণ লাগে। ঠিক ট্র্যাকে দৌড়নোর মতো। কিন্তু এমনই কপাল, লাইফটা কেমন একঘেয়ে হয়ে গেছে। যাক, তবু আপনি একটু

থ্রিলের ব্যবস্থা করেছেন। আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক—।'

'কাল তাহলে আধঘন্টা আগে আসছেন তো?'

'অতি অবশ্যই—।'

টেলিফোন সেরে নিয়ে চা শেষ করল বিদিশা। তারপর ক্লান্তভাবে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। যদি ঘুম এসে যায় আসুক। মা ডেকে তুলে খাইয়ে দেবেন।

চোখে ঘুম নেমে আসার সময় বিদিশা রণজয়ের মারুতি গাড়িটা দেখতে পেল। তীব্র হ্যালোজেন হেডলাইট জ্বেলে খ্যাপা চিতাবাঘের মতো ভয়ঙ্কর গতিতে ওকে লক্ষ করে ছুটে আসছে।

মঙ্গলবার গভীর রাতের দিকে মেঘের ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিদিশার। তারপর আর ভালো করে ঘুম আসেনি। তখন থেকেই অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই বৃষ্টি থেমেছে ভোর ছ'টায়। শ্রাবণে-শ্রাবণে ভেজা ভিজে কাকের ডাকে বিদিশা বুঝতে পেরেছে গাঢ় মেঘের আড়ালে ভোর হয়েছে।

বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে অফিসে বেরোনোর আগে পর্যন্ত তটস্থ হয়ে থেকেছে বিদিশা। এই বুঝি টেলিফোনটা বেজে উঠল। কাল রাতের ভয়ানক পাগলটা এই বুঝি শুরু করল নতুন পাগলামি!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও ফোন আসেনি।

অফিসে যাওয়ার সময় দিব্যি সহজভাবে অকুস্থলটা পেরিয়ে গেল বিদিশা। গতকাল রাতের ঘটনাটা মনে হচ্ছিল যেন নিছকই কোনও স্বপ্ন। শুধু কাঠগোলাপ গাছটা থেকে খানিকটা দূরে ইটের পাঁজার সামনে ভাঙা কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে রয়েছে। সেই চকচকে কাচের টুকরোগুলো বিদিশার স্বপ্নকে সত্যি করে দিচ্ছিল।

ঠিক আটাশ মিনিট আগে অফিসে ঢুকল বিদিশা। দেখল, শেখর নিজের চেয়ার-টেবিলে হাজির।

ওকে দেখে হাসল শেখর। বিদিশাও হাসতে পারল। সত্যি, অফিসটা ওকে বাঁচিয়ে রাখার কোরামিন জোগায়।

বনজারা সাদা য়ুনিফর্ম পরে অফিস ফ্লোরে পায়চারি করছিল। বিদিশাকে দেখে 'সুপ্রভাত' জানাল। ওর ডিউটি অফিস-টাইমের একঘণ্টা আগে থেকে। ও অফিস ঝাড়পোঁছের তদারকি করে। দরজা-জানলা ঠিকঠাকমতো খুলে দেয়। ফাইলপত্র আলমারি থেকে বের করে টেবিলে-টেবিলে সাজিয়ে দেয়।

শেখরকে ডেকে নিয়ে নিজের সিটের কাছে চলে গেল বিদিশা। সেখানে গুছিয়ে বসল দুজনে। সামনের টেবিলে টাইপ মেশিন, পাশে শর্টহ্যান্ডের খাতা আর পেনসিল।

বড় কাচের জানলা দিয়ে মেঘলা আলো এসে পড়েছে বিদিশার মুখে। ওকে বড়

বিষণ্ণ অথচ সুন্দর লাগছিল।

'শেখর, আপনারা কেউই জানেন না...আমার বিয়ে হয়ে গেছে।' বিদিশা এমনভাবে কথাটা বলল, যেন খবরের কাগজের খবর পড়ে শোনাচ্ছে।

শেখর বিদিশার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর কথাটা শোনার পর খোলা জানলার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে মেঘলা আকাশ দেখল। তারপর মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে টেবিলের ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকের ডিজাইন দেখল কিছুক্ষণ। একসময় মুখ তুলে তাকাল বিদিশার দিকে 'তারপর? বলুন—আমি শুনছি।'

বিদিশা বলতে শুরু করল—সংক্ষেপে যেটুকু বলা যায় শেখরকে।

রণজয়কে ছেড়ে আসার পর তিনটে মাস এক অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছিল বিদিশার। ওর মনের ভেতরে চেনা আর অচেনা রণজয়কে নিয়ে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব চলছিল। হাজারবার জিগ্যেস করা সত্ত্বেও মাকে ও সব কথা খুলে বলতে পারেনি। শুধু বলেছিল, 'ওর সঙ্গে আর থাকা যায় না, মা, কিছুতেই থাকা যায় না।'

সেই ভয়ঙ্কর রাতটার কথা মাকে বলেনি বিদিশা। কিন্তু মা যখন গালের কাটা দাগটা দেখিয়ে গিগ্যেস করেছিল, 'এ কী! কী করে কাটল?'

বিদিশা কান্না চেপে বলেছিল, 'রণজয়...।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণা আর কোনও কথা জিগ্যেস করতে পারেননি।

ওর জীবনে চরম ঘটনাটা ঘটেছিল নভেম্বরের শেষ দিকে। শীত তখন চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে।

রণজয় ফোন করেছিল, ওর হেড অফিসে প্রোডাকশন মিটিং না কী যেন আছে—তাই ফিরতে রাত হবে। বিদিশা ছোট্ট করে 'হুঁ' বলেছিল।

তারপর যথারীতি সংসারের কাজ নিয়ে ডুবে গিয়েছিল। পরে সন্ধের মুখে একবার মাকে ফোন করেছিল। বুঝতে পেরেছিল, তরুবালা আড়ি পেতেছেন। তবুও সাধারণ কয়েকটা কথাবার্তা বলেছিল মায়ের সঙ্গে।

রান্নাবান্না ইত্যাদির কাজ সেরে টিভি দেখতে বসেছিল বিদিশা। শুনতে পাচ্ছিল, নীচে তরুবালা টেপ রেকর্ডারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট শুনছেন। রণজয়ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালোবাসে।

তরুবালা এমব্রয়ডারির কাজ খুব ভালো পারেন। তাঁর হাতের কয়েকটা কাজ বাঁধানো রয়েছে একতলা-দোতলার ঘরের দেওয়ালে। রণজয়ও অল্পস্বল্প এমব্রয়ডারির কাজ জানে। মায়ের হাতের কাজের প্রশংসায় ও সবসময় পঞ্চমুখ।

বিদিশা বুঝেছে, রণজয়ের ভেতরের অনেকটাই দখল করে রয়েছেন তরুবালা।

প্রথম-প্রথম বিদিশা নিজের মতামত স্পষ্ট করে জানাত। দরকার হলে তর্কও জুড়ে দিত স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু ওকে থাপ্পড় মারার সেই অস্বাভাবিক ঘটনার পর ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে একমত হওয়ার জন্য সবসময় প্রাণপণ চেষ্টা করত।

টিভি প্রোগ্রামটা ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল বিদিশার। তাই টিভি অফ করে ও চলে

এসেছিল দোতলার ছোট্ট ঝুলবারান্দায়। নীচের গলিতে সন্ধেবেলার ব্যস্ততা। গলির মোড়ে তেলেভাজার দোকানে ভিড়। বড় রাস্তা দিয়ে হুস-হুস করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে।

একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল বিদিশা। ও ঘরে ফিরে এল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎই সাজতে শুরু করল।

তখনই ও লক্ষ করল, ড্রেসিং টেবিলে ধুলোর আস্তরণ।

সাজগোজ সংক্ষেপ করে ড্রেসিং টেবিলের ধুলো ঝাড়তে লেগে গেল বিদিশা। তারপরই ঘরটার অগোছালো অবস্থা চোখে পড়ল ওর। কেণের টেবিলে কয়েকটা ম্যাগাজিন ছড়ানো। তার পাশে রণজয়ের এলোমেলো বইপত্র আর ফাইল। বিছানার চাদর অনেকদিন পালটানো হয়নি। পিলো কভারগুলোও বদলানো দরকার। আলনার জামাকাপড়গুলোও কীরকম বিচ্ছিরিভাবে অগোছালো হয়ে রয়েছে।

সুতরাং, বিদিশা কাজে নেমে পড়ল।

সব কাজ শেষ করে ও যখন রণজয়ের ফাইলপত্রগুলো সাজিয়ে নিয়ে দেওয়ালের তাকে রাখতে যাচ্ছে তখনই ছোট মাপের মেডিক্যাল ফাইলটা নজরে পড়ল ওর।

বিদিশা প্রথম ভেবেছিল, ওটা বোধহয় রণজয়ের বাবার মেডিক্যাল ফাইল। এ-ফাইল এখানে কেন? তিনি মারা গেছেন আজ প্রায় চার বছর। গ্যাসট্রিক, ডায়াবিটিস ইত্যাদি নানান রোগে ভুগতেন ভদ্রলোক। তরুবালার ঘরের দেওয়ালে তাঁর ফটো আছে। কিন্তু ফাইলের মলাট ওলটাতেই অবাক হয়ে গেল বিদিশা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই পাওয়া গেল রোগীর নাম রণজয় সরকার।

কী অসুখ হয়েছে রণজয়ের?

ফাইলটা নিয়ে বিছানায় বসে পড়ল বিদিশা। মেডিক্যাল রিপোর্ট আর প্রেসক্রিপশানের পাতা একের পর এক ওলটাতে লাগল। বেশিরভাগটাই বুঝতে পারল না। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার জেনে ওর বেশ খটকা লাগল।

রণজয়ের মাথার খুলি সুষম নয়। লম্বালম্বি দু-ভাগ করলে বাঁ দিকের অংশটা বেশ বড়। ওর মধ্যে আবেগের জটিলতা রয়েছে। ডাক্তারি ভাষায় লেখা যেসব টুকরো-টুকরো শব্দ বিদিশার নজর কাড়ল সেগুলো হল : মনস্ট্রাস প্যাথোলজিক্যাল ইনটেনসিফিকেশান অফ অ্যাবারেটেড সেনসুয়ালিটি', 'সাইকোপ্যাথিক স্টেট একসিস্ট্স', 'সাইকোনিউরোটিক টেন্ডেন্সিস', 'অ্যালার্মিং ডিজঅরডার ইন দ্য ফ্রন্ট্রাল লোব অফ দ্য ব্রেইন।'

এ কোন অসুখে ভুগছে রণজয়!

বিদিশা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। রণজয়ের মাথার ঠিক নেই, মনেরও ঠিক নেই!

এতদিন যেসব অদ্ভুত আচরণ বিদিশা লক্ষ করেছে, তার আসল কারণ তাহলে এই! এই কারণেই চেনা রণজয়ের ভেতর থেকে হঠাৎ-হঠাৎ অসুস্থ মনের অচেনা রণজয় বেরিয়ে আসে!

ভাবতে-ভাবতে সময় বয়ে যাচ্ছিল। কোনওদিকেই খেয়াল ছিল না বিদিশার। ও রণজয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন থেকে আজ পর্যন্ত সাতটা বছরের কথা ভাবছিল।

ওদের গল্পটা কীভাবে শুরু হয়েছিল, আর এখন কীরকম অস্বাভাবিক বাঁক নিয়ে জটিল পথে এগিয়ে চলেছে!

নীচের সদরে কলিংবেলের শব্দ নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে। কিন্তু বিদিশা সে-শব্দ শুনতে পায়নি। তবে তরুবালা নিশ্চয়ই দরজা খুলে দিয়েছেন। তাই চেনা পায়ের শব্দ উঠে এসেছে ওপরে। কিন্তু অন্যমনস্ক বিদিশা সেই শব্দটাও শুনতে পায়নি।

ব্যাপারটা ও টের পেল যখন রণজয় একেবারে ঘরে এসে ঢুকল।

'এ কী! আমার কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ কেন?' বিরক্ত রণজয়ের ভুরু কুঁচকে গেছে। বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে মুখে। টিউব লাইটের আলোয় মুখটা কেমন ফ্যাকাসে রক্তহীন দেখাচ্ছে।

হাতের ব্রিফকেস নামিয়ে রাখল মেঝেতে। দুটো লম্বা পা ফেলে চলে এল বিদিশার কাছে। বাঁ হাতে নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধরল ওর চুলের গোছা। এক হ্যাঁচকায় ওকে চিৎপাত করে দিল বিছানায়।

ততক্ষণে অচেনা রণজয় বেরিয়ে এসেছে চেনা রণজয়ের মুখোশের আড়াল থেকে। ওর দু-চোখ পাগলের চোখ হয়ে গেছে। সেই চোখ-জোড়া এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে মরিয়া হয়ে কী যেন খুঁজছে।

বিদিশার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে গোপন মেডিক্যাল ফাইল। একটা আধো-আধো চিৎকার বোধহয় বেরিয়ে এসে থাকবে ওর ঠোঁট চিরে। এখন ওর চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

রণজয় দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন মনে করেনি।

বিদিশার মাথা তখনও কাজ করছিল। ও বুঝল, তরুবালার কাছে অচেনা রণজয় অচেনা নয়।

'আমার ভুল হয়ে গেছে। আর কোনওদিনও তোমার...।'

ডান হাতের এক ঘুসি এসে পড়ল বিদিশার মুখের ওপরে।

ঠোঁট কেটে গিয়ে জিভে নোনতা স্বাদ পেল ও। রণজয়ের বাঁ হাত তখনও ওর চুলের মুঠি ধরে রেখেছে—আর অদ্ভুত এক জান্তব শক্তিতে বিদিশাকে কাবু করে রেখেছে।

রণজয়ের পাগল চোখ অবশেষে খুঁজে পেল দরকারি জিনিসটা। বিদিশা লক্ষ করল, রণজয় অবশেষে তাকিয়েছে রান্নাঘরের দরজার দিকে।

চোখের পলকে এক নৃশংস হ্যাঁচকা টানে বিদিশাকে মেঝেতে পেড়ে ফেলল রণজয়। তারপর পাগলের মতো ছুটে গেল রান্নাঘরে। দু-এক সেকেন্ড পরেই ও যখন ফিরে এল, তখন ওর হাতে ধরা রয়েছে দশ ইঞ্চি লম্বা ফলার একটা চকচকে কিচেন নাইফ। তার ধারালো দিকটা করাতের মতো দাঁত কাটা।

ঝুঁকে পড়ে আবার বিদিশার চুলের মুঠি চেপে ধরল রণজয়। এক হ্যাঁচকা টানে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে ছুরি চেপে ধরল ওর বাঁ গালে—কানের খুব কাছে।

'ফাকিং বিচ!' দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল বিদিশার উন্মাদ স্বামী। তারপরই **অশ্রাব্য** গালিগালাজ শুরু করে দিল।

ওই নোংরা কথাগুলো বলতে-বলতে ছুরিতে টান মারল ওর ডান হাত।

বিদিশা এবার চিৎকার করে উঠতে পারল।

চিৎকারটা যখন মাঝপথে তখনই ওর চুল ছেড়ে দিয়ে টুঁটি চেপে ধরল রণজয়ের জঙ্গি বাঁ হাত।

বিদিশার দম আটকে গেল। চোখ বড়-বড় করে ও নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রণজয়ের বিকৃত মুখের দিকে। ওর চোখে পড়ল করাতের দাঁতওয়ালা ছুরির ফলাটা। চকচকে ফলায় সামান্য রক্ত লেগে আছে।

বিদিশা এইবার ছটফট করতে শুরু করল। কে-ই বা সহজে মরতে চায়! রণজয়ের মুখ ওর মুখের ওপরে অনেকটা নেমে এসেছে। লম্বা-লম্বা চুল ঝরে পড়েছে রণজয়ের কপালে চোখে। ওর দাঁত বেরিয়ে আছে হিংস্রভাবে। ঠোঁটে লালা। চেনা রণজয়ের মুখোশটা একেবারে সরে গেছে। সাইকিয়াট্রিস্ট-এর মন্তব্য মনে পড়ল বিদিশার 'মনস্ট্রাস প্যাথোলজিক্যাল ইনটেন্সিফিকেশান অফ অ্যাবারেটেড সেনসুয়ালিটি।' এবং ওই মন্তব্যের অর্থ বোধহয় এই মুহূর্তে পুরোপুরি বুঝতে পারল ও।

আচমকা ওকে ছেড়ে দিল রণজয়। ছুরিটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। তারপর মেডিক্যাল ফাইলটা তুলে নিল বিছানার কাছ থেকে। ওটা নিজের ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে রেখে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ও। চোখ বুজে নিজের কপালে মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

বিদিশা কাশতে-কাশতে কোনওরকমে উঠে বসেছে বিছানায়। গলায় ভীষণ ব্যথা। বাঁ গালে অসম্ভব জ্বালা করছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গলায়, কাঁধে, বুকে। তীব্র কান্না উঠে আসতে চাইছিল গলা দিয়ে, কিন্তু বিদিশা কাঁদতে পারছিল না। ওর চোখের সামনে একটা অশরীরী ছায়া উল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য করছিল, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিল, ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল বারবার।

কিছুক্ষণ পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রণজয়। বিদিশার কাছে এসে পিঠে হাত রাখল। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'মানু, আমি এক্সট্রিমলি সরি। ব্যাপারটা ভুলে যাও—' একটু চুপ করে থেকে তারপর 'আমাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত করে খাওয়াও তো।'

বিদিশার অবাক হওয়ার ক্ষমতা বোধহয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই ও অবাক হল না। স্বামীর হুকুম তামিল করতে চলল। তারই ফাঁকে ও আঁচল চেপে ধরেছিল বাঁ গালে, কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। তখন রান্নাঘরে গিয়ে একমুঠো চিনি চেপে ধরেছে ক্ষতস্থানে। মাথা ঝিমঝিম করলেও বিদিশা কাঠের তাক ধরে নিজেকে সামলে রেখেছিল—টলে পড়ে যায়নি।

তারপর দুটো ঘণ্টা যে কী ভয়ঙ্কর জ্বালা-যন্ত্রণায় কেটেছে তা বিদিশা আজও ভুলতে পারেনি। বিছানায় শুয়ে রাতের আঁধারে ও ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তখনই কোনও

একটা দুর্বল মুহূর্তে ও ঠিক করেছিল, আর নয়। এই বন্দি জীবন আর নয়। সব জ্বালা-যন্ত্রণায় দাঁড়ি টানতে হবে।

অন্ধকারে বিছানা থেকে নেমে এসেছিল বিদিশা। আন্দাজে ভর করে টলতে-টলতে চলে গিয়েছিল ওষুধের তাকের কাছে। হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে পেয়েছিল নির্দিষ্ট ওষুধের পাতাগুলো। টেনটেক্স ফোর্ট। চ্যাপ্টা গোল রুপোলি রঙের ট্যাবলেট। রোজ রাতে রণজয় একটা করে এই ট্যাবলেট খায়। এই ট্যাবলেট খেলে যৌন উত্তেজনা বাড়ে। রণজয়ের এই ট্যাবলেট কেন দরকার হয় তা বিদিশা জানে না। কিন্তু বিয়ের পরে রণজয়ই ওকে খুলে বলেছিল এই রুপোলি ট্যাবলেটের রহস্য। দশটা ট্যাবলেটের একটা পাতার দাম তেরো টাকার মতো।

কিন্তু এই ট্যাবলেট অনেকগুলো একসঙ্গে খেলে মারাও যেতে পারে মানুষ—রণজয়ই একদিন বলেছে এ-কথা। তাই যে-ক'টা ট্যাবলেট পেল সবক'টা নিয়ে বাথরুমে চলে গেল বিদিশা। আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করে মুঠোয় ধরা ট্যাবলেটগুলো অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল ও। পাতা ছিঁড়ে ট্যাবলেটগুলো যখন ও হাতের চেটোয় ঢালল তখন মনে হচ্ছিল ও বিশ-পঁচিশটা ক্যাডবেরি জেম্‌স খাচ্ছে। শুধু এগুলোর রং লাল-নীল নয়, রুপোলি।

বাথরুমের আয়নার দিকে তাকিয়ে ভেউভেউ করে কেঁদেছিল বিদিশা। মা, বাবা, বাপ্পার কথা মনে পড়ছিল। ওদের আর দেখতে পাবে না বিদিশা। কিন্তু একটু পরেই যে ঘটনা ঘটতে চলেছে তার জন্য নিজেকে ছাড়া আর কাকে দায়ী করবে ও! রণজয়ের সঙ্গে এই জীবন ও নিজেই বেছে নিয়েছিল। আজ এই মৃত্যু ও নিজেই বেছে নিচ্ছে।

কল থেকে মগে করে জল নিয়ে মুখে ঢালল ও। তারপর একে-একে সবক'টা ট্যাবলেট ঢেলে দিল মুখে। বারবার জল খেল।

ট্যাবলেটগুলো খাওয়া শেষ করে বাথরুমের ভেজা মেঝেতে বসে পড়ল বিদিশা। পেটটা ভার লাগছে। গাল জ্বালা করছে। মাথা টং হয়ে আছে।

হঠাৎই বিদিশা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল বাচ্চা মেয়ের মতো। তারই মধ্যে ও টের পাচ্ছিল, বুকের ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে। আর মাথার ঝিমঝিম ভাবটা যেন বাড়ছে।

খুব আবছাভাবে বিদিশা টের পেয়েছিল বাথরুমের বন্ধ দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। সত্যি, না ওর মনের ভুল?

এরপর আর কিছুই ওর মনে নেই।

দেড় দিন পর বিদিশার জ্ঞান ফিরেছিল সুকিয়া স্ট্রিটের 'সিটি নার্সিং হোম'-এ। চোখ খুলতেই ও মা-বাবা আর রণজয়কে দেখতে পেয়েছিল। মুহূর্তে বিদিশার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অলক্ষ্মী অশরীরী ছায়াটা তার নাচ থামিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে।

নার্সিং হোমের চিকিৎসা আর যত্নে আটদিনেই সুস্থ হয়ে উঠেছিল বিদিশা। মা-বাবার সঙ্গে ও চলে এসেছিল সল্ট লেকে। অরুণা-সুধাময় তখনকার মতো রণজয়কে

বুঝিয়েছিলেন, মানসিক আঘাতটা সামলে উঠলেই ও মানিকতলায় চলে যাবে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা আর হয়নি। বিদিশা প্রচণ্ড একরোখা জেদ ধরেছিল, সল্ট লেক ছেড়ে ও কোথাও যাবে না। অরুণার সঙ্গে এ নিয়ে বেশ মন কষাকষি হয়েছিল। কিন্তু বিদিশা সরাসরি সুধাময়কে একদিন প্রশ্ন করেছিল, 'বাপি, তোমার হাতে বেড়ে ওঠা রক্তকরবী গাছটাকে কেউ যদি রোজ টেনে মুচড়ে ছিঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তুমি কী করবে?'

সুধাময় কেঁদে ফেলেছিলেন এ-কথায়। তাঁর লম্বা কাঠামো নুয়ে পড়েছিল। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'আমি সারাজীবন বহু কষ্ট করেছি, মানু। কখনও ঘুষ নিইনি, কখনও ঘুষ দিইনি। আর তোকে আমি বলব ঘুষ দিয়ে ভালোবাসা আদায় করতে! অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করা মানেই তো ঘুষ দেওয়া। তুই আমাদের চোখের সামনে থাকবি। এ-বাড়িতে তোর অধিকার কিছু কম নয়।'

বাবাকে টপ করে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল বিদিশার। কিন্তু কী করবে! এখন তো আর ও সেই ছোট্টটি নেই।

সেইদিন থেকে সল্ট লেকে অভয়ারণ্য খুঁজে পেয়েছিল বিদিশা।

বেশ মনে পড়ে, রণজয় দু-চারবার যাতায়াত করেছিল ওদের বাড়িতে। ওকে দেখতে এসেছিল। ওর সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেছিল। মানিকতলায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধও করেছিল।

কিন্তু বিদিশা টলে যায়নি। রণজয়ের সঙ্গে ওর ভালোবাসার স্মৃতিগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে চাপা দিয়েছিল বিপজ্জনক মারাত্মক সব স্মৃতি। করাতের দাঁতওয়ালা লম্বা ছুরিটা ও সবসময় চোখের সামনে দেখতে পেত।

এরপর রণজয় প্রায় মাস-ছয়েক চুপচাপ হয়ে যায়। কোনও যোগাযোগ করেনি, কোনও চিঠি দেয়নি, একটা টেলিফোনও করেনি।

তারপর হঠাৎই একদিন ও ফোন করেছে সুধাময়কে। ফোন করে লিগাল সেপারেশান চেয়েছে। একই ব্যাপারে অরুণাকেও ফোন করেছে রণজয়। সেসব কথাবার্তা ঢিমে তেতালায় হলেও এগিয়েছে। সেসব শুনে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে বিদিশা। আর অরুণা মাঝে-মধ্যেই জেদি মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন ধর্মের কথা।

বিদিশা ধর্মের কথা শোনেনি। শোনার মতো মনের অবস্থা ওর ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে ও সামলে নিতে পেরেছিল। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে শর্টহ্যান্ড আর টাইপ শিখতে শুরু করেছিল। কয়েক বছর আগে বিভিন্ন পরীক্ষার ফাঁকে-ফাঁকে শর্টহ্যান্ড-টাইপ নিয়ে ও বেশ কিছুটা এগিয়েছিল। এখন তীব্র প্রয়োজনে সেই পুরোনো চর্চাটাকে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরল।

সুধাময়ের যোগাযোগ আর চেষ্টায় 'ইন্‌কন' নামের এই ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি ফার্মে স্টেনোগ্রাফার-কাম-টাইপিস্টের চাকরি পেয়েছে বিদিশা। আর একইসঙ্গে ওর জীবনের ছবিটা একটু-একটু করে বদলে গেছে। মুখ ফিরিয়ে নেওয়া জীবন আবার স্মিত

হেসে তাকিয়েছে ওর দিকে।

এখন, ওর সেই নতুন বাঁচার জায়গায় বসে, শেখরকে নিজের কথা বলছিল বিদিশা।

রণজয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কের সব কথা অরুণা কিংবা সুধাময়কে খুলে বলেনি বিদিশা। তাই শেখরকেও বলল অনেক রেখে-ঢেকে। রণজয়ের অস্বাভাবিক মনের কথা বলল, বলল ওর বাঁ গালের কাটা দাগের ইতিহাস। আর আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টার কথা।

সব কথা বলতে-বলতে বিদিশার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেটা লক্ষ করে শেখর বলল, 'ম্যাডাম, এখন চোখের জল ফেলার সময় নয়, চোখের জল মুছে নেওয়ার সময়।'

বিদিশা চোখ মুছে নিল রুমালে। তারপর গতকাল রাতের ঘটনা বলল।

'রণজয় আমাকে ছাড়বে না, শেখর। যেভাবেই হোক, ওর মাথায় এখন ঢুকেছে আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা। ও যখন-তখন যা খুশি করে ফেলতে পারে।'

অফিসে লোকজন আসতে শুরু করেছে। ম্যানেজার পি. এল. চক্রবর্তী একবার এসে বিদিশাকে 'গুড মর্নিং' বলে গেছেন। চায়ের ট্রলি এসে গেছে ফ্লোরে।

দেবলীনা হঠাৎ এসে দাঁড়াল বিদিশার টেবিলের কাছে। বলল, 'কাল দারুণ দুটো চুড়িদার কিনেছি। ভীষণ ব্রাইট রঙ। লাঞ্চের সময় এসো, দেখাব।'

দেবলীনার ছিপছিপে ফরসা চেহারা। চোখে বড় ফ্রেমের চশমা। ছাই রঙের ওপরে সাদা-কালোয় কাজ করা একটা চুড়িদারে ওকে বেশ মানিয়েছে। বিদিশাকে ও প্রায়ই শাড়ি ছেড়ে চুড়িদার পরতে বলে। তাহলে নাকি বিদিশাকে আরও সুন্দর দেখাবে।

এই প্রস্তাবের কথা জানতে পেরে বোসদা পান চিবোতে-চিবোতে বলেছিলেন, 'না, মা জননী, তুমি চুড়িদার পোরো না। তাহলে আমার আর চরিত্র বলে কিছু থাকবে না। এমনিতেই শাড়ি পরে তোমাকে যা ফ্যান্টা লাগে! আমি তো সবাইকে স্পষ্ট করেই বলি আমি তোমাকে দেখতেই রোজ অফিসে আসি।' হাসলেন বোসদা 'তাহলেই বোঝো! এর ওপর তুমি যদি চুড়িদার ধরো তাহলে আমাদের মতো বুড়োগুলো কী ধরবে।'

'বোসদা, প্লিজ...' কপট অস্বস্তিতে বলে উঠেছে বিদিশা 'ঠোঁটে কুলুপ লাগান।'

ঠোঁট থেকে পানের রস মুছে নিয়ে সুধীর বোস মজা করে বলেছিলেন, 'আমার তো যত রস ঠোঁটেই, মা জননী। সেখানে কী করে গোদরেজের তালা লাগাই!'

দেবলীনা রিসেপশন কাউন্টারের দিকে চলে যেতে-না-যেতেই চায়ের কাপ হাতে বোসদা এসে হাজির। হাসি-হাসি মুখ। টাকে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। বোঝা যায়, এইমাত্র অফিসে ঢুকেছেন।

'আপনাদের কাছে এগোনো যাবে? নাকি কালকের মতো এজ বার আছে?'

'না, না। আসুন, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসুন—' হাসিমুখে বোসদাকে আমন্ত্রণ জানাল বিদিশা।

বোসদা চোখ সামান্য কুঁচকে বিদিশাকে লক্ষ করছিলেন। হঠাৎই সিরিয়াসভাবে মন্তব্য করলেন, 'মা জননী, তোমার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। সকাল-সকাল মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল—।'

এমন সময় সিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সৌমেন পাল বোসদাকে এসে ডাকলেন, 'মিস্টার বোস, একটু আসবেন? আজই একটা আরজেন্ট ড্রয়িং পাঠানোর আছে। আপনার সঙ্গে একটু ডিসকাস করতে হবে—।'

'পরে কথা বলব। ছোটভাই, তুমি দ্যাখো, ম্যাডামের প্রবলেম সল্‌ভ করতে পারো কি না—' বলে বোসদা চায়ের কাপ হাতেই চলে গেলেন।

শেখর বলল, 'বলুন, ম্যাডাম, আমার কাছ থেকে আপনি কী হেল্‌প চান?'

বিদিশা দিশেহারাভাবে বলল, 'সেটাই তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'থানায় ডায়েরি করতে চান?'

'না, না—' চকিতে মাথা নাড়ল বিদিশা 'ওতে অনেক জল ঘোলা হবে, স্ক্যান্ডাল হবে।'

'তা হলে আপনি কী করতে চান?'

বিদিশা চিন্তিত গলায় বলল, 'সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না। রণজয় সবসময় আমাকে ফলো করছে। সেটা শোনার পর থেকেই আমার ভয় করছে।'

এমন সময় বন্‌জারা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল বিদিশাকে। শেখর দেখল, সাধারণ একটা ইনল্যান্ড লেটার।

'এখন তাহলে যাই।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শেখর 'পরে এনিয়ে কথা বলব।'

বিদিশা ঘাড় নেড়ে চিঠিটা দেখতে শুরু করল। শেখর রওনা হল নিজের সিটের দিকে।

চিঠিটা কে পাঠিয়েছে তা ওপরে লেখা নেই। তবে হাতের লেখাটা বেশ চেনা।

ইনল্যান্ড লেটারটা খুলে ফেলল বিদিশা। তিন পৃষ্ঠা জোড়া বিশাল চিঠি। চিঠির শেষে রণজয়ের নাম লেখা রয়েছে।

বিদিশা ওর খুব-চেনা বাংলা হরফগুলোর ওপরে চোখ বোলাতে শুরু করল।

রণজয়ের লেখা প্রেমজর্জর চিঠি। অনেক ভালোবাসা, অনেক দুঃখ-কষ্টের কথা বলা আছে চিঠিতে। নির্লিপ্তভাবে চিঠিটা পড়ল বিদিশা। ওর রক্তে নতুন কোনও স্রোত তৈরি হল না।

চিঠির শেষ দিকে রণজয় লিখেছে

'...তোমার সন্তান এখনও আমাকে "বাবা" বলে ডাকতে চায়। আর আমি তোমাকে "বউ" বলে ডাকতে চাই, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে চাই। এখনও সময় আছে—ফিরে এসো। তা না হলে ফল খুব খারাপ হবে। "অ্যাকোয়া রিজিয়া"-র নাম শুনেছ? না, সুলতানা রিজিয়ার কোনও আত্মীয় নন ইনি। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরি এক মারাত্মক অ্যাসিড। সোনাও গলিয়ে দিতে পারে অতি সহজে। এই অ্যাসিড ভরা বাল্‌ব

তোমার মুখে ছুড়ে মারলে তোমার ওই সোনার মতো রঙের কী হাল হবে বুঝতে পারছ?

তাই তোমার পায়ে ধরে বলছি, মানু, ফিরে এসো। আমাকে খারাপ হয়ে যেতে দিয়ো না, লক্ষ্মীটি।'

বিদিশার চিঠি-ধরা হাত তিরতির করে কাঁপতে লাগল। চিঠিটা কোনওরকমে ড্রয়ারে রেখে দিয়ে ও টেবিলে মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। কী করবে এখন ও? কী করা যায়?

জটিল দুশ্চিন্তার মধ্যে অফিসের সময়টা ধীরে-ধীরে কাটতে লাগল। তারই মধ্যে শেখর অন্তত বারতিনেক বলেছে, 'ম্যাডাম, আমাকে কী করতে হবে বলবেন কিন্তু—।'

লাঞ্চের পর শেখরের সিটের কাছে বসে ওর সঙ্গে গল্প করছিল বিদিশা। কথা বলতে-বলতে ও ভাবছিল, শেখরকে ওর বিপজ্জনক জীবনের সঙ্গে জড়ানো ঠিক হবে কি না।

শেখর ওর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা বই বের করল। বিদিশার দিকে বইটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই বইটা পড়ে দেখুন। একটা সাইকোপ্যাথের কাণ্ডকারখানা। ভীষণ থ্রিলিং।'

বিদিশা পেপারব্যাকটা হাতে নিয়ে দেখল। বইটার নাম 'ইয়র্কশায়ার রিপার।' ব্যাক কভার পড়ে বুঝল, ছুরি দিয়ে একের পর এক মহিলা খুনের ঘটনা।

'আবার সিরিয়াল কিলার? আপনার কি টেস্ট বলে কিছু নেই!' বিদিশা বইটা ফিরিয়ে দিতে-দিতে বলল।

শেখর হেসে জবাব দিল, 'টিভিতে যেসব বাংলা সিরিয়াল হয় তার চেয়ে সিরিয়াল কিলার ফার বেটার। তা ছাড়া, রণজয়বাবুর কেসটাও বোধহয় অনেকটা এই টাইপের। সত্যি, আপনার লাইফটা কী থ্রিলিং!'

বিদিশা অবাক হয়ে শেখরকে দেখল 'আমি দিনরাত দুশ্চিন্তায় শেষ হয়ে গেলাম, আর আপনি বলছেন আমার লাইফটা কি থ্রিলিং! আপনি হেল্প করবেন বলছিলেন... আপনি পারবেন আমার এই থ্রিল ট্যাক্ল করতে? আমি থ্রিল চাই না—আমি শান্তিতে বাঁচতে চাই।'

শেখর বিদিশার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। বলল, 'আমি ট্যাক্ল করলে আপনার ওই মিস্টার হাজব্যান্ড হুউশ করে হাওয়া হয়ে যাবে। আমি ট্র্যাকে দৌড়নো স্পোর্টসম্যান। এটা অফিস তাই—না হলে আপনাকে এখনই বাইসেপ ট্রাইসেপ দেখিয়ে দিতাম।'

'আমি কিন্তু ইয়ারকি করছি না, সিরিয়াসলি বলছি।'

'আমিও সিরিয়াসলি বলছি। আজ আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

'সত্যি!' বিদিশা শেখরের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'সত্যি—!' আশ্বাসের হাসি হাসল শেখর। সত্যিকারের সহকর্মীর হাসি।

বিদিশাও হাসল—নির্ভর করতে পারার হাসি।

আর তখনই অত্যন্ত সিরিয়াস মুখে বোসদা এগিয়ে এলেন শেখরের টেবিলের কাছে। যথারীতি পানের রসে ঠোঁট লাল।

জড়ানো গলায় বোসদা বললেন, 'সেনভায়াকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?'

শেখর হেসে বলল, 'এত ফরমালিটির কী আছে? বলুন—!'

বোসদা সামান্য ঝুঁকে পড়লেন শেখরের মুখের কাছে 'বলতে পারো সেনভায়া, সেনসেক্স মানে কী?'

শেখর বোসদার অশ্লীল ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে বলল, 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ওটা সেনসিটিভ ইনডেক্স না কী যেন—ঠিক জানি না।'

'তাই বলো। সেনসেক্স ওয়ার্ডটা শুনে আমি ভাবতাম, শুধু বদ্যিদেরই বুঝি সেক্স আছে, আর কারও নেই...' চলে যাওয়ার আগে বোসদা বিদিশার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কিছু মনে করলে না তো, মা জননী। সেনভায়া বড় ভালো ছেলে....তবে মাঝে-মাঝে নুন দিয়ে লুচি খায়...।'

বোসদা চলে যেতে বিদিশা শেখরের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'নুন দিয়ে লুচি খাওয়ার মানে?'

'ও কিছু নয়, বোসদার বাজে ইয়ারকি। শুনুন, আমি তাহলে আজ থেকে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি—।'

বিদিশা মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। এই মুহূর্ত থেকেই ও যেন অনেকটা ভরসা পাচ্ছে।

শেখরের কাছ থেকে উঠে চলে যাওয়ার আগে বিদিশা বলল, 'একটু আগে রণজয়ের একটা চিঠি পেয়েছি—অফিসের ঠিকানায়। পরে আপনাকে দেখাব। আমার মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুড়ে মারার হুমকি দিয়েছে।'

শেখর শুধু বলল, 'ওসবে পাত্তা দেবেন না—আমি আছি।'

বিদিশা নিজের টেবিলে ফিরে আসছিল, অশোক চন্দ্র ওকে ডাকল, 'ম্যাডাম, আপনার ফোন—।'

বিদিশা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ডানদিকের দেওয়ালের কাছে অশোক টেলিফোনের রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

বিদিশা ওর কাছে গিয়ে ফোন ধরল।

'হ্যালো—।'

'কেমন আছ, মানু?' রণজয়।

রাগে জ্বলে উঠল বিদিশা 'তোমাকে বলেছি না যে, অফিসে এভাবে ফোন করবে না। তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই, কোনও সম্পর্ক নেই। আমি....।'

ও-প্রান্তে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রণজয়। ধরা গলায় বলল, 'আমার কষ্টটা তুমি কেন বুঝতে চাও না বলো তো! আমি যে একা-একা শেষ হয়ে গেলাম—।'

বিদিশা বাঁকা সুরে বলল, 'একা কেন? তোমার মা তো রয়েছে।'

রণজয় কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'সেইজন্যেই তো কষ্ট আরও বেশি। দেখা হলে তোমাকে সব বলব। কাল রাতে তো সে-কথাই বলতে চেয়েছিলাম, তুমি হঠাৎ অকারণে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলে। আজ তোমার সময় হবে? অফিস ছুটির পর দেখা করতে পারবে?'

বিদিশার কৌতূহল হচ্ছিল। তাই ও দ্বিধায় পড়ে গেল। তরুবালার সঙ্গে কী হয়েছে রণজয়ের? ঝগড়াঝাঁটি? কী নিয়ে? বিদিশার চলে যাওয়া নিয়ে?

ও-প্রান্ত থেকে রণজয় অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'মানু, একটিবার আমার সঙ্গে দেখা করো। তুমি পাশে না থাকলে আমি কেমন করে সেরে উঠব? কেমন করে আবার ভালোবাসব তোমাকে?'

বিদিশা ঠিক করল, রণজয়ের সঙ্গে দেখা করবে—তবে শেখর সঙ্গে থাকবে। শেখর সঙ্গে থাকলে ও ওই ভয়ঙ্কর মানুষটার সঙ্গে দেখা করার জোর পাবে।

'ঠিক আছে। কোথায় দেখা করবে বলো—' বিদিশা ঠান্ডা গলায় বলল।

'মানু, মানু, আই লাভ য়ু, লাভ—' উত্তেজনায় রণজয়ের গলা কাঁপছে 'সি. এ. পি. ক্যাম্প বাস স্টপে আমি সাতটার সময় তোমার জন্যে ওয়েট করব। তুমি আসবে তো?'

'আসব—' বিদিশা ইচ্ছে করেই শেখরের কথা জানাল না। রণজয়কে ও একটা মানসিক ধাক্কা দিতে চায়।

'আমি....আমি তোমাকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছি...অফিসের ঠিকানায়...।'

'জানি। একটা আজ পেয়েছি—।'

'চিঠির খারাপ কথাগুলো ধোরো না, মানু। ওগুলো রাগের মাথায় লিখেছি।'

বিদিশা কোনও জবাব দিল না।

রণজয় আবার কথা বলল চাপা গলায়, 'মানু, চিঠি পড়ে তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না। তোমার সঙ্গে দেখা হলে সব বুঝিয়ে বলব।'

'ঠিক আছে। এখন তাহলে রাখছি। সন্ধে সাতটায়, সি. এ. পি. ক্যাম্প বাস স্টপে।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে শেখরের টেবিলের কাছে গেল বিদিশা। অচেনা একজন ভিজিটর ওর টেবিলে বসে টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলছিল। বিদিশা ইশারায় ডাকল ওকে।

শেখর উঠে কাছে আসতেই বিদিশা নিচু গলায় বলল, 'আজ সন্ধে সাতটায় আমার ডেঞ্জারাস এক্স-হাজব্যান্ডের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। সাবধান থাকবেন....।'

শেখর হেসে বলল, 'দারুণ থ্রিলিং ব্যাপার হবে। আপনার হাজব্যান্ড এক্স হোক আর ওয়াই হোক—আই ডোন্ট মাইন্ড। কিন্তু আপনার কাছে যা শুনেছি, যদি হঠাৎ করে ভদ্রলোক খেপে উঠে আপনাকে অ্যাটাক করেন?'

বিদিশা সিরিয়াস চোখে তাকাল শেখরের দিকে 'আপনি তখন কী করতে চান?'

শেখরও সিরিয়াস গলায় বলল, 'আপনি যা হুকুম করবেন—।'

বিদিশা ঠান্ডা স্বরে বলল, 'দেন হিট হিম—।'

'আই উইল লাভ টু। সাঙ্ঘাতিক থ্রিলিং ব্যাপার হবে।'

সেই সকাল থেকে আকাশের মুখ-ভার এতটুকু কমেনি। মাঝে-মাঝে খাপছাড়াভাবে দু-তিনবার বৃষ্টি হয়েছে। বিদিশা আর শেখর যখন সি. এ. পি. ক্যাম্প বাস স্টপে এসে নামল তখন বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু আকাশে কোনও চাঁদ তারা নজরে পড়ছিল না। বরং খানিকটা লালচে আভা দেখা যাচ্ছিল।

বাস থেকে নামার আগেই ওরা ঠিক করেছিল ওরা অচেনা লোকের মতো বাসের দুই দরজা দিয়ে নামবে। নেমে শেখর বিদিশার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে যাবে। দূর থেকেই ও বিদিশার ওপরে লক্ষ রাখবে। রণজয়ের সঙ্গে বিদিশার ব্যক্তিগত কথাবার্তার মাঝে ও থাকতে চায় না।

শেখর পিছনের দরজা দিয়ে নেমে সোজা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেছে উলটো দিকের বাস স্টপে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ-সাতজন মানুষের মাঝে গা-ঢাকা দিয়েছে। ওর হাতঘড়িতে তখন সাতটা বেজে ছ'মিনিট।

বাসটা চলে যেতেই রাস্তার ওপারে বিদিশাকে দেখতে পেল শেখর। একা-একা দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ দেখছে। রণজয়কে খুঁজছে।

যখন ওরা প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে তখন পাখির খাঁচার পিছন থেকে একটা ছায়ার মতো মানুষ ইতস্তত পায়ে এগিয়ে এল বিদিশার কাছাকাছি।

'বিদিশা, আমি এসেছি—।'

চমকে বাঁ দিকে মুখ ঘোরাল বিদিশা।

ফরসা রোগা চেহারার রণজয় করুণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মধ্যে কেমন দ্বিধা, ইতস্তত ভাব, যেন কোনও অপরিচিত তরুণীর সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে এসেছে।

'কী বলবে, বলো—' বিদিশা পাথরের মতো গলায় বলল।

চারদিকে দেখল রণজয়। এই জায়গাটায় তেমন আলো-টালো নেই। কিন্তু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

রণজয় বলল, 'এখানে নয়, মানু....ওদিকটায় চলো।' আঙুল তুলে সি. এ. পি. ক্যাম্প স্টপেজ থেকে বাঁদিকে এ. ই. ব্লকের দিকে চলে যাওয়া নির্জন রাস্তাটা দেখাল ও।

বিদিশার ভেতরে কেমন একটা টেনশান শুরু হল। ওর চোখ রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা শেখরকে খুঁজল।

এমন সময় আচমকা ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। বিদিশা চটপট ছাতা খুলে মাথায় দিল। কিন্তু রণজয়ের সঙ্গে ছাতা ছিল না। ও নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল।

রণজয় আরও কাছে এগিয়ে এল। ওর সারা মুখ ভিজে চকচক করছে। চুল লেপটে আছে ফরসা কপালে। বৃষ্টির ফোঁটায় ওর মুখ খানিকটা ঝাপসা দেখাচ্ছে।

ওকে দেখে বিদিশার মায়া হল। ও রণজয়কে ছাতার তলায় ডাকল, 'বৃষ্টিতে ভিজো না। এসো।'

রণজয় ওর লেডিজ ছাতার নীচে চলে এল। ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ানোমাত্রই ও বিদিশার গালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল 'মানু...মানু...।'

বিদিশা প্রতিক্রিয়ায় গাল সরিয়ে নিল। ও রণজয়কে ছাতার নীচে আসতে বলেছে মানবিকতা বোধ থেকে, ভালোবাসার টানে নয়।

ওর অবাক লাগছিল। কী সহজে ভালোবাসা মরে যায়। একসময় এই পুরুষটা ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালে বিদিশা ভেতরে-ভেতরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা টের পেত, শরীর পিচ্ছিল হয়ে উঠত।

আর এখন! ওর প্রতিটি রোমকূপ সতর্ক হয়ে রয়েছে বিপদের আশঙ্কায়।

বৃষ্টির ফোঁটা ছাতায় আছড়ে পড়ার তুমুল শব্দ হচ্ছিল। ছাতার রঙের গা দিয়ে জল পড়ছিল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে। রণজয়ের ভেজা শরীর বিদিশার পোশাক ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

রণজয় ওর হাত আঁকড়ে ধরে বলল, 'ওদিকটায় চলো—।'

বিদিশা ওর আঙুলের জোর টের পেল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে শেখরকে শেষবারের মতো খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার ধোঁয়াটে পরদা সরিয়ে ও কিছুই দেখতে পেল না।

নির্জন এলাকা থেকে আরও নির্জন এলাকায় ঢুকে পড়ছিল ওরা দুজনে।

সামনেটা বেশ অন্ধকার। বাড়িগুলোও বর্ষার ঘোমটায় মুখ ঢেকেছে। দু-একটা খালি জমিতে বর্ষায় বেড়ে ওঠা গাছপালা আর আগাছার জঙ্গল। বিচিত্র আকারের অর্ধেক তৈরি একটা বাড়ি অন্ধকারে কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে।

'মানু, তোমাকে আমি অনেক চিঠি লিখেছি...রোজ তুমি অফিসে গেলেই আমার একটা করে চিঠি পাবে...।'

বিদিশা কোনও উত্তর দিল না।

বৃষ্টির তেজ হঠাৎই কমে এল। আর রণজয়ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

'মানু, মুখটা তুলে আমার দিকে একবার তাকাও—।'

রণজয়ের কথায় এমন কিছু ছিল যে, বিদিশা ভয় পেয়ে গেল। ও চোখ নামিয়ে বৃষ্টির খই-ফোটা ভিজে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আচমকা ওর ছাতাটা টান মেরে ছিটকে ফেলে দিল রণজয়।

বিদিশা অসহায়ভাবে ভিজতে লাগল। রণজয় তো আগেই ভিজে স্নান। সেই অবস্থায় ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল বিদিশার পায়ের কাছে। জাপটে ধরল বিদিশার ভিজে লেপটে যাওয়া শাড়ি, সেই সঙ্গে বিদিশাকেও।

'আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, মানু। তোমাকে ফিরে না পেলে আমি মরে যাব।' কথা বলতে-বলতে রণজয় মুখ ঘষছিল বিদিশার ঊরুতে। টের পাচ্ছিল, বিদিশার কোমল ভিজে শরীর ভালোবাসায় থরথর করে কাঁপছে।

আসলে বিদিশা ভয়ে কাঁপছিল। আর দমবন্ধ করে মরিয়া হয়ে শেখরকে খুঁজছিল বারবার।

রণজয়ের জড়ানো স্বর তখনও ভেসে আসছিল বিদিশার কোমরের কাছ থেকে : 'তোমাকে ফিরে না পেলে আমি শেষ হয়ে যাব, মানু...।'

বিদিশার গা ঘিনঘিন করছিল। শরীরটা কাঠ। ও কোনওরকমে বলল, 'সেটা আর কিছুতেই সম্ভব নয়—।'

চাবুকের মতো এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল রণজয়। বাঁ হাতের থাবায় চেপে ধরল বিদিশার গলা। ওর চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। মুখ বেঁকেচুরে বদলে গেছে। অচেনা রণজয় আবার বেরিয়ে এসেছে নির্জন বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায়।

চাপা হিংস্র গলায় রণজয় বলে উঠল, 'ফাকিং বিচ!'

বিদিশার গলায় অসহ্য ব্যথা করছিল। মাথায়, মুখে, শরীরে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে। চোখের সামনে ও মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিল। কী বোকার মতোই না ও রণজয়ের কথার ফাঁদে পা দিয়েছে। এই জানোয়ারটা একটুও বদলায়নি, বদলাতে পারে না।

গলার ওপরে আঙুলের চাপ বাড়ছিল। বিদিশার মুখ দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বেরোনোর উপায় নেই। রণজয় শক্ত হাতে ওর টুঁটি টিপে ধরেছে।

বৃষ্টি অনেক ফিকে হয়ে এসেছিল। আকুল হয়ে সি. এ. পি. ক্যাম্প স্টপেজের পাখির খাঁচার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিদিশা এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল। ছাতা মাথায় লম্বা-লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে আসছে। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে অন্ধকারে কিছু একটা ঠাহর করতে চাইছে।

বিদিশা বেশ বুঝতে পারছিল, চিৎকার করে কোনও লাভ নেই। আর ওর কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো ওর ভয়ঙ্কর স্বামীকে দেখতে বাধ্য হচ্ছিল।

বাঁ হাতে শক্ত করে ওর গলা খামচে রেখে ডান হাতে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় কষাল রণজয়।

বিদিশা চোখে সরষে ফুল দেখল। তারপরই চোখের সামনে একটা কালো পরদা নেমে এল যেন। মুখের বাঁ দিকটা অসহ্য যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে মাথা ধরে গেল। ঠোঁটে নোনা স্বাদ পেল ও। এই অন্ধকার বৃষ্টি-ভেজা রাতে ও কি রণজয়ের হাতে খতম হয়ে যাবে?

শেখর সেনের কথা মনে পড়ল 'যদি হঠাৎ করে ভদ্রলোক খেপে উঠে আপনাকে অ্যাটাক করেন?'

'আপনি তখন কী করতে চান?'

'আপনি যা হুকুম করবেন—।'

'দেন হিট হিম—।'

শেখর সেন যখন স্বামী-স্ত্রীকে দেখতে পেল তখন বিদিশার শরীরটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে। আর ফরসা রোগা একটা বদ্ধ উন্মাদ তখনও হিংস্রভাবে

বাঁ হাতে খামচে ধরে আছে বিদিশার গলা।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। শেখরের মাথার ভেতরেও। অন্ধকার এ. ই. ব্লকের রাস্তাটা চোখের পলকে টালিগঞ্জের ভোরবেলার রাস্তা হয়ে গেল। যে-রাস্তায় শেখর প্রতিদিন ভোরবেলা দৌড়য়।

অনেক কষ্টে একঘেয়ে জীবনে থ্রিল দেখা দিয়েছে। শেখরের মনে পড়ল 'মাই লাইফ উইথ নাইফ', 'ইয়র্কশায়ার রিপার'-এর কথা। বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে থ্রিল নেমে এসেছে বাস্তবের রাস্তায়। এ-সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

হাতের ছাতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে শুরু করল শেখর। আবছায়া অবয়বের অমানুষটা তখন বিদিশাকে পেড়ে ফেলেছে পথের ওপরে। দু-হাতে ওর শাড়ি-জামাকাপড় ধরে টানছে। আর আপনমনেই চিৎকার করে কীসব বলছে। শেখরের মাথায় সেসব তখন একবর্ণও ঢুকছিল না।

ছুটতে-ছুটতে লোকটার প্রায় ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল শেখর। সপাটে এক লাথি চালাল লোকটার কোমরে। লোকটা খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ল, কিন্তু বিদিশার শাড়ির আঁচল তখনও তার মুঠোয় ধরা।

শেখর আনন্দে টগবগ করে ফুটছিল। বইয়ের পাতা শেষ পর্যন্ত তাহলে সত্যি হল!

ও পড়ে যাওয়া রণজয়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে না পড়ে ওর একটা পা চেপে ধরল। তারপর ওর দেহটা হিড়হিড় করে টানতে লাগল পিচের রাস্তার ওপরে।

শেখরের মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছিল বারবার। আর ঝিনচাক মিউজিক বাজছিল। রণজয়ের পলকা শরীরটাকে নিয়ে ও দিশেহারার মতো ছুটে বেড়াচ্ছিল রাস্তার এদিক-সেদিক।

একসময় ও থামল। হাঁপাতে-হাঁপাতে ঝুঁকে পড়ল রণজয়ের ওপরে। বাঁ হাতে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল ওকে। তারপর ওর কেটে-ছড়ে যাওয়া মুখে ডান হাতের এক ভয়ঙ্কর ঘুসি বসিয়ে দিল।

'আঁক' শব্দ করে উঠল রণজয়। ওর নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। শেখর পর-পর আরও তিনটে ঘুসি চালাল। চুলের মুঠি ধরে থাকা মাথাটা ঝাঁকুনি খেয়ে গেল তিনবার।

শেখর শুনতে পাচ্ছিল, ওর কানের ভেতরে কে যেন বারবার বলছে, 'দেন হিট হিম, দেন হিট হিম, দেন হিট হিম....' আর শেখর সেই অলৌকিক নির্দেশের প্রতিটি শব্দ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছিল।

ক্লান্ত শেখর আহত রণজয়কে একসময় ছেড়ে দিল। বৃষ্টি তখন আরও জোরে নেমেছে।

শেখর একপলক অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে তাকিয়েছিল দূরে রাস্তায় পড়ে থাকা বিদিশার দিকে। সেই ফাঁকে রণজয় কোথা থেকে একটা লুকোনো ছুরি বের করে নিমেষে চালিয়ে দিল শেখরের মুখ লক্ষ করে।

ঠিক সেই সময়ে হেডলাইট জ্বেলে একটা গাড়ি বাঁক নিয়েছিল এ. ই. ব্লকের দিকে। গাড়িটার আলো রণজয়ের মুখে এসে পড়েছিল, আর শেখরের পিঠ-কাঁধ গাঢ় ছায়া ফেলেছিল রণজয়ের শরীরে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ছুরিটা চালিয়েছিল রণজয়।

নেহাতই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল শেখর। তাই ছুরির ফলা ওর গলা আর ঘাড়ে রক্তাক্ত আঁচড় টেনে দিল। শেখর আহত জন্তুর মতো গনগনে রাগে রণজয়ের দু-পায়ের ফাঁকে এক মারাত্মক লাথি কষিয়ে দিল।

রণজয় চকিতে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু লাথিটা পুরোপুরি এড়াতে পারল না।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসা গাড়িটার হেডলাইটের আলোয় রণজয়ের রক্তমাখা মুখ ফ্যাকাসে লাগছিল। ও গাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছুটে পালাল অন্ধকারে। ওকে তাড়া করতে গিয়ে শেখর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। ওর গলা বেয়ে তখন দরদর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু ওই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও শেখর থ্রিলের কথা ভাবছিল, বিদিশার কথা ভাবছিল।

জ্ঞান হারানোর আগে শেখর দেখল, গাড়িটা ওর কাছটিতে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন। কেউ যেন ওকে বহুদূর থেকে জিগ্যেস করছে, 'কী ব্যাপার, দাদা? কী হয়েছে?'

আর-একজন যেন কোথা থেকে বলে উঠল, 'মনে হয় ছিনতাইয়ের কেস্—।'

কথাবার্তার শব্দ ক্রমেই বাড়ছিল।

কে যেন হুড়হুড় করে খানিকটা ঠান্ডা জল ঢেলে দিল শেখরের মুখে।

ও চমকে চোখ মেলে তাকাল। এ কী! ও রাস্তায় পড়ে কেন? এই অন্ধকারে বৃষ্টিতে ও কী করছে? গলার পাশটা জ্বালা করছে। কয়েকটা ছায়া-ছায়া মুখ ঝুঁকে রয়েছে ওর শরীরের ওপরে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল শেখর। আর তখনই ওর রণজয়ের ব্যাপারটা মনে পড়ল। ও পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরল গলায়। কয়েকটা হাত ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

উঠে দাঁড়িয়ে বিদিশাকে দেখতে পেল শেখর। ছাতা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল। নানাজনের প্রশ্নের উত্তরে ছিনতাইয়ের চেষ্টার কথাই বলল শেখর। কেন যেন ওর মনে হল, রণজয়ের ব্যাপারটা বলে ফেলা ঠিক হবে না।

বিদিশাকে কেমন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। দু-চোখে ভয় আর উৎকণ্ঠা। ঠোঁটের কোণে রক্তের দাগ। ও জিগ্যেস করল, 'আপনার লাগেনি তো, শেখর!'

শেখর বলল, 'চিন্তা করবেন না। তেমন কিছু নয়—।'

দু-চারজন পরামর্শ দিল একটু ফার্স্ট এইড সেরে নেওয়ার জন্য। কে যেন একটা সাইকেল রিকশা ডেকে ওদের তুলে দিল। বলল, 'কোয়ালিটি স্টপেজের পাশে ওষুধের

দোকান আছে। ওখানে দেখিয়ে নিন—। আর পুলিশে একটা ডায়েরি করে দেবেন। এদিকটায় ছিনতাই বড্ড বেড়েছে।'

রিকশা যখন চলতে শুরু করেছে তখন পিছন থেকে টুকরো একটা মন্তব্য ওদের কানে এল 'এই অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে কেউ কখনও এখানে প্রেম করতে আসে!'

উত্তরে একজন বলল, 'না, না—ওরা "আপনি" করে কথা বলছিল...।'

'রাখুন, রাখুন। ও-সব লোকঠকানো প্যাঁচ পুরোনো হয়ে গেছে...।'

রিকশা কালো রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

লাঞ্চের পর সুধীর বোস খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতে শেখরের টেবিলের কাছে এলেন। সেখানে বিদিশা আর দেবলীনা দাঁড়িয়ে ছিল। আর একটা চেয়ারে বসে ছিল অশোক। লাঞ্চের পর আধঘণ্টাটাক অফিসের মেজাজটা একটু ঢিলেঢালা থাকে।

বোসদা এসেই ঘোষণা করলেন, 'শুনেছ শেখরভায়া, আমাদের অফিসে শক্তিশালী জয়েন করেছে—।'

'শক্তিশালী মানে?' একটু অবাক হয়ে শেখর জিগ্যেস করল। ওর গলার বাঁদিকটায় স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। এখন আর তেমন ব্যথা নেই।

বোসদা হাসলেন 'তোমাদের কি সমাস-টমাস কিছুই পড়ানো হয়নি! শক্তিশালীর ব্যাসবাক্য হল, শক্তিপ্রসাদের শালী। আমাদের এম. ডি.-র পি. এ. শক্তিপ্রসাদের শালী আজ থেকে কোম্পানিতে জয়েন করেছে।'

শেখর হাসল। দেবলীনা আর বিদিশাও।

অশোক হেসে বলল, 'তো আপনার এত হিংসে কেন? আপনিও আপনার শালীকে এখানে ঢুকিয়ে দিন না—।'

সুধীর বোস চোখ ছোট করে হেসে বললেন, 'আমার শালীকে আমি কোথায় ঢোকাব সেটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও না বাবা!'

'আপনার সঙ্গে না কথা বলা যায় না, বোসদা—' বলে হাসি চেপে উঠে চলে গেল অশোক।

বোসদা কপট বিস্ময়ে তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কী খারাপ কথাটা বললাম! তুমিই বলো, মা জননী—' বিদিশার দিকে ফিরে বললেন বোসদা।

'বোসদা, প্লিজ...' প্রায় আবেদনের গলায় বলল বিদিশা।

দেবলীনা বলল, 'আমি সিটে যাই। নইলে পি. এল. চক্রবর্তী আবার ঝামেলা করবে।'

ও চলে যেতেই বোসদা বললেন, 'দেবলীনা পালের একটাই বড় ডিফেক্ট বড্ড লাজুক। না, ভাই, তোমরা গপ্পো করো, আমি নীচ থেকে ঝট করে একটা পান খেয়ে আসি।' বলে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে সুধীর বোস চলে গেলেন।

অশোকের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটা দেখিয়ে শেখর বিদিশাকে বসতে বলল। তারপর জিগ্যেস করল, 'এখন কেমন আছেন?'

সারাদিনে এই প্রথম ওরা আলাদা কথা বলতে পারছে।

বিদিশার ঠোঁটের কোণ, গাল ফুলে আছে। ঠোঁটের কোণে ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ছে। ফরসা গলায় কালচে দাগ। আজ তেমন করে সাজগোজ করেনি ও। চোখে বিষাদ আর অনিশ্চয়তার ছায়া।

'আমি ঠিক আছি।' একটু থেমে 'আপনি?'

হাসল শেখর। ওর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ইংরেজি পেপারব্যাক বের করল। বলল, 'আমি কাল সকালের মতোই—থ্রিল খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিন, এই বইটা দেখুন, ইচ্ছে হলে পড়তে পারেন...।'

বিদিশা বইটার নাম দেখল 'ইন্টারভিউ উইথ দ্য ভ্যাম্পায়ার।' তারপর মাথা নেড়ে 'না' বলল। তারপর একটু সময় নিয়ে জিগ্যেস করল, 'সত্যি ঠিক আছেন? আমার খারাপ লাগছে। শুধু-শুধু নিজের ঝামেলায় আপনাকে জড়ালাম...।'

বিদিশার সাহস শেখরকে হতবাক করে দিয়েছিল। ও চাপা গলায় বলল, 'ঝামেলার আর কী আছে! কাল হোঁচট খেয়ে ওরকম পড়ে না গেলে আপনার এক্স-হাজব্যান্ডকে চন্দ্রবিন্দু করে ছেড়ে দিতাম।' একটু থেমে তারপর 'আমার কথা বাদ দিন। আমি তো সবসময় থ্রিল খুঁজে বেড়াই। কিন্তু আপনার ভয় করে না?'

বিদিশা কাচের চোখে শেখরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না। কাল রাতের পর আমার সমস্ত ভয় পাওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।'

কথাটা বিদিশা মিথ্যে বলেনি।

কাল রাতে এক ডিসপেনসারি থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে ওষুধ নেওয়ার পর বিদিশাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল শেখর।

সারাটা পথ বিদিশা কোনও কথা বলেনি। শুধু একবার বিড়বিড় করে বলেছে, 'রণজয় আমাকে বাঁচতে দেবে না। হয় ও, নয় আমি—যে-কোনও একজন থাকবে।'

শেখর আগে কখনও বিদিশাদের বাড়ি আসেনি। বিদিশা কখনও আসার কথা বলেনি। কারণ, শেখর তখন ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানত না। এখন সবকিছু পালটে গেছে। তাই রাত সাড়ে আটটা নাগাদ যখন ওরা দুজনে 'অরুণা-সুধাময়'-এ পৌঁছল তখন বিস্ময়, উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

অনেক প্রশ্ন, অনেক আলোচনা, অনেক কথা কাটাকাটি। রণজয়ের কাছ থেকে বিপদের ব্যাপারটা যে কত মারাত্মক হতে পারে সেটা অরুণা কিছুতেই বুঝতে চাইছিলেন না। তখন শেখর জামা সরিয়ে নিজের ক্ষতচিহ্নটা দেখাল। অরুণা কথার মাঝখানেই চুপ করে গেলেন। বুঝতে পারলেন, শেখর শেষের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সুধাময় পুলিশে ফোন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অরুণা বললেন, ফোন করে তরুবালাকে

সব জানাতে। বদ্ধ পাগল ছেলে কী ভয়ঙ্কর পাগলামিতে মেতে উঠেছে সেটা মায়ের জানা দরকার। বাপ্পা রণজয়কে ফোন করে সরাসরি হুমকি দিতে বলল। বিদিশা হতাশায় কাঁদতে লাগল। আর এ-বাড়িতে প্রথম অতিথি শেখর বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওর গলার পাশটা ব্যথা করছে। সামান্য চিনচিনে জ্বালাও করছে।

কী আশ্চর্য! আর-একটু হলেই শেখরের থ্রিল-খোঁজা জীবন খতম হয়ে যেতে পারত, অথচ শেখরের মনে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। বরং অল্পের জন্য রণজয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ওর আপশোস হচ্ছিল।

একটু পরেই বিদিশা যখন কথা বলল তখন ও একেবারে অন্য মানুষ।

সুধাময়-অরুণা বারবার বলছিলেন যে, ওর কিছুদিন অফিসে না যাওয়াই ভালো। বিপদটা কেটে যাক, তারপর দেখা যাবে।

উত্তরে বিদিশা রুক্ষ গলায় বলে উঠল, 'এ-বিপদ কোনওদিন কাটবে না। যেদিন আমি অফিসে যাওয়া শুরু করব সেদিনই আবার বিপদ হতে পারে। তা ছাড়া বাড়িতে বসে থাকলেই যে কোনও বিপদ হবে না, তার কী মানে আছে! যে-মানুষটার মাথার গন্ডগোল সে কখনও সুবিধে-অসুবিধে ভেবে কাজ করে নাকি? আমি কাল অফিসে যাব। আমাকে ভয় পেতে দেখলেই রণজয় আরও পেয়ে বসবে।'

বহু তর্কবিতর্ক করেও বিদিশাকে টলানো গেল না। শেখরও কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল। অরুণা অনেক কান্নাকাটি করলেন, কিন্তু বিদিশার একরোখা জেদকে হারাতে পারলেন না।

বিদিশাদের পারিবারিক ব্যাপারের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে শেখরের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বাড়িতে একটা ফোন করে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। এখন দ্বিতীয়বার ফোন করে বলল, এখনই রওনা হচ্ছে।

ও চলে আসার আগে বিদিশা ছোট্ট করে জিগ্যেস করেছিল, 'কাল অফিসে আসছেন তো?'

'অফ কোর্স।' জবাব দিয়েছিল শেখর, 'আমি অফিসে না এলে আপনাকে সেফলি বাড়িতে পৌঁছে দেবে কে?'

উত্তরে ম্লান হেসেছিল বিদিশা। পৃথিবীটা এখনও রণজয়রা কিনে নিতে পারেনি... শেখররাও আছে।

শেখর বলল, 'আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোবেন। আপনাদের বাড়ির কাছটা বেশ অন্ধকার। সন্ধে পার হলেই লোকজন ফিকে হয়ে আসে।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে বিদিশা সায় দিল, বলল, 'তা হলে আধঘণ্টা আগে বেরোব।'

ঠিক তখনই পি. এল. চক্রবর্তী কোথা থেকে যেন প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বিদিশার পিঠে হাত দিয়ে তাগাদা দিতে-দিতে বললেন, 'অ্যাই, বিদিশা, চলো, চলো।

খুব জরুরি কয়েকটা ডিকটেশান দেওয়ার আছে—।'

বিদিশা কুঁকড়ে সরে গেল চক্রবর্তীসাহেবের সুযোগ-সন্ধানী হাতের আওতা থেকে। উঠে দাঁড়াল চট করে।

প্রশান্ত চক্রবর্তীর স্বভাবটাই এইরকম। সবসময় ছোঁকছোঁক করে বেড়ান। বিদিশার শরীরের যেখানে সেখানে যৌনতা খুঁজে বেড়ান। বিদিশার গা ঘিনঘিন করে। এই লোকটাও রণজয়ের চেয়ে কম অসুস্থ নয়। শুধু রোগ-লক্ষণগুলো অন্যরকম।

চোখের ইশারায় শেখরকে 'আসছি' বলল বিদিশা। দেখল শেখরের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। ও চক্রবর্তীসাহেবের অসভ্যতায় ভেতরে-ভেতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

পি. এল. চক্রবর্তীর ডিকটেশান আর গায়ে-পড়া গালগপ্পের হাত থেকে বিদিশা রেহাই পেল প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পর। নিজের টেবিলে ফিরে ও চিঠিগুলো টাইপ করতে বসবে, দেখল ওর টেবিলে একটা ইনল্যান্ড লেটার পড়ে আছে।

চেয়ারে গুছিয়ে বসে চিঠিটা খুলল বিদিশা।

যা ভেবেছিল তাই। রণজয়ের চিঠি। সেই একঘেয়ে কাঁদুনি তুমি ফিরে এসো। আর চিঠির শেষ দিকে নির্লজ্জভাবে নোংরা ভালোবাসার কথা লেখা রয়েছে। সেইসঙ্গে কাঁচা হাতের রেখায় আঁকা নারী পুরুষের মিলনের ছবি।

রাগে চিঠিটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে লিটার বিনে ফেলে দিল বিদিশা। শরীরে কেমন এক অসহ্য জ্বালা টের পাচ্ছিল। ওর শান্তশিষ্ট জীবনটা একটা ভয়ঙ্কর জন্তু কীরকম তছনছ করে দিচ্ছে।

বিদিশা আনমনাভাবে খোলা জানলার দিকে তাকাল। আকাশে গাঢ় মেঘ। কিন্তু কোথাও-কোথাও নীলের আভাস। আর কতদিন থাকবে এই মেঘ? লুকিয়ে থাকা নীলের জন্য আকুল হল বিদিশা।

বিদিশা কতক্ষণ যে ওভাবে বসে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎই দেখল, বন্‌জারা ওর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'ম্যাডাম, আপনার ফোন আছে—।'

বিদিশা উঠে দাঁড়াল। রোবটের মতো নিষ্প্রাণ পায়ে এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। ও জানে, এই টেলিফোনটা কে করেছে। কিন্তু এত দেরি হল কেন? আরও অনেক আগে এই ফোনটা আসা উচিত ছিল।

'হ্যালো—' টেলিফোনে যান্ত্রিক স্বরে কথা বলল বিদিশা।

'কাল রাতের ওই শুয়োরের বাচ্চাটা কে?' ক্ষিপ্ত রণজয়ের কথা ফেটে পড়ল রিসিভারে।

বিদিশা একটা ধাক্কা খেল। ভাবল, রিসিভার নামিয়ে রাখবে। কিন্তু তারপরই একটা তীব্র জেদ আর রাগ ফুটতে শুরু করল ওর মাথার ভেতরে। না, হার মানবে না বিদিশা। ও এই অসভ্য পাগলটার মোকাবিলা করবে।

'ছোটলোকের মতো কথা বোলো না। এটা অফিস। এখানে ভদ্রলোকেরা কাজ করে।'

চাপা ধমকের সুরে বলল বিদিশা।

ও প্রান্তে হাসল রণজয়—নোংরা হাসি। বলল, 'তুমি কি ভেবেছ ওই ভাড়া করা জানোয়ারটা তোমাকে বাঁচাতে পারবে! আমি ওটাকে খতম করে দেব। কেটে টুকরো-টুকরো করে ভাসিয়ে দেব মানিকতলার খালে। তারপর তোমাকে চৌরাস্তায় ন্যাংটো করে...।'

'চুপ করো। বদ্ধ পাগল কোথাকার—' বিদিশা হিসহিস করে বলল।

'মানু, আমি তোমাকে কতবার বলেছি...।'

রণজয়ের কথার ওপরে কথা বলল বিদিশা, 'তুমি একটা আস্ত পাগল। তোমার মাথার ভেতরে সবকিছু ওলটপালট হয়ে আছে। তোমার পাগলামি তোমার মা সহ্য করতে পারে—সেখানে গিয়ে পাগলামি করো—আমার সে-দায় নেই।'

'মানু—' মিষ্টি করে বলল রণজয়, 'তোমাকে আমি ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না।' মিষ্টি সুরে বলল বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে রণজয়ের মুখটা দেখলে বিদিশা ভয় পেত।

'তুমি আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। নইলে আমি থানা-পুলিশ করতে বাধ্য হব। তোমার মতো ছোটলোক পাগলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আমি রাখতে চাই না। তুমি তোমার মাকে নিয়েই থাকো। তোমরা দুজনেই তো অ্যাবনরমাল—ফলে দিব্যি সুখে থাকতে পারবে...।'

একইভাবে রণজয় আবার বলল, 'মানু, তোমাকে আমি ছাড়ব না...।'

এবং লাইন কেটে দিল।

হঠাৎই বিদিশার শরীরের ভেতরে যেন লোডশেডিং হয়ে গেল। টলে পড়ে যেতে গিয়েও ও একটা থাম ধরে সামলে নিল। তারপর থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সুধীর বোস তাঁর ড্রাফটিং টেবিল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। তিনি প্রায় ছুটে এসে বিদিশাকে হাত ধরে কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কোথা থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে ধরলেন বিদিশার মুখের সামনে। বললেন, 'মা জননী, একচুমুক জল খেয়ে নাও, ভালো লাগবে...।'

বিদিশা চোখ বুজে চেয়ারে গা এলিয়ে ছিল। বোসদার কথায় গ্লাসের জলটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল। বোসদাকে ওর ভীষণ ভালো লাগছিল। মনে পড়ল, সকালে এই মানুষটাই ওর আর শেখরের আঘাত আর ক্ষতচিহ্ন লক্ষ করে মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমরা কি অফিসের পর ফ্রি স্টাইল কুস্তি লড়তে গিয়েছিলে নাকি? বয়েসকালে আমিও ওরকম অনেক কুস্তি লড়েছি। তা আমাকেও সঙ্গে নিতে পারতে—নিদেনপক্ষে না হয় রেফারি হতাম।' তারপর দিলখোলা হেসে শেখরকে বলেছেন, 'শেখর, সত্যি-সত্যি বলো তো, কী করে চোট পেলে?'

শেখর মনগড়া একটা সাফাই দিয়েছে। বিদিশাও তাই। কিন্তু এখন চোখ খুলে ও দেখল, বোসদা স্নেহমাখানো উৎকণ্ঠায় ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে।

শেখরও কাছে এগিয়ে এসেছিল। ওর আশেপাশে আরও কয়েকজন।

এত মানুষের ভিড় দেখে বিদিশা কেমন অস্বস্তি পেয়ে গেল। ও আলতো গলায় বলল, 'এখন অনেকটা ভালো লাগছে....' তারপর ধীরে-ধীরে উঠে ফিরে গেল নিজের সিটে।

শেখর, বোসদা ও আরও দুজন সহকর্মী বিদিশার সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছিল। বিদিশা ক্লান্ত গলায় বলল, 'আপনাদের আসার দরকার নেই। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল...এখন ঠিক আছি....আমি একটু একা থাকতে চাই...।'

ওরা আর এগোল না। শেখর শুধু বলল, 'ছুটির পর আপনার সঙ্গে বেরোব।'

বিদিশা ফিরে না তাকিয়েই ঘাড় নাড়ল—অর্থাৎ, ঠিক আছে।

নিজের সিটে এসে ক্লান্তভাবে টেবিলে মাথা নামিয়ে রাখল বিদিশা। রণজয়ের হিংস্র মুখটা ও দেখতে পেল। কী শান্তভাবেই না বাঁচতে চেয়েছিল বিদিশা! অথচ এই অসুস্থ বিকারগ্রস্ত লোকটা ওর জীবনকে নরক করে তুলেছে। বিদিশা কি পালটা জবাব দিতে পারে না ওকে? তিল-তিল টেনশানের ভয়ঙ্কর বিষ কি ও ছড়িয়ে দিতে পারে না ওই অমানুষটার জীবনেও?

বিদিশার বারবারই মনে হচ্ছিল, রুখে দাঁড়ানো দরকার। এইবার রুখে দাঁড়ানো দরকার।

চোখ বুজে থাকা সেই ঘোরের মধ্যে বিদিশা হিংস্র পশুটার গলা শুনতে পেল 'মানু, তোমাকে আমি ছাড়ব না।'

ভোরবেলা থেকেই মিহিদানার মতো বৃষ্টি পড়ছিল। ভোরের আকাশ আর ঘড়ির কাঁটায় কোনও মিল ছিল না। কিন্তু রোজকার অভ্যেস মতো সুধাময়ের জৈবিক ঘড়ি তাঁকে জাগিয়ে দিয়েছিল সাড়ে পাঁচটার সময়ে। নিয়মমাফিক কাজ সেরে সুধাময় বেরিয়ে এসেছেন বাইরের বাগানে। কোণের একটা ঘর থেকে বাগান পরিচর্যার দু-একটি যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে এসেছেন তাঁর প্রিয় গাছপালার কাছে। বর্ষার জল-বায়ুতে বেড়ে ওঠা সবুজ পাতার দল তাঁকে মাথা নেড়ে 'সুপ্রভাত' জানাল। সুধাময় হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন ওদের কাছে।

সুধাময়ের পরনে লুঙ্গি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি। তাঁর কাঁধ আর বাহু দেখলেই শরীরের শক্ত কাঠামো টের পাওয়া যায়। হাতের পিঠে আর কবজির কাছে দড়ির মতো ফুলে রয়েছে শিরা-উপশিরা। মাথার কাঁচা-পাকা চুলে আর চশমার পুরু লেন্সের কাচে বৃষ্টির মিহি গুঁড়ো লেগে আছে। অথচ সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই তাঁর। কারণ, তিনি তখন শ্বেত করবী গাছের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আর একইসঙ্গে গাছ কাটার বড় কাঁচি নিয়ে করবী গাছের বেপরোয়া বেড়ে ওঠা ডালপালা ছেঁটে মানানসই করে দিচ্ছিলেন।

একটা সিগারেটের জন্য তাঁর ঠোঁটে গলায় কেমন তেষ্টা জাগছিল, কিন্তু সুধাময়

চেষ্টা করে সেটা সামাল দিচ্ছিলেন। কয়েক বছর ধরে হাঁপের টানে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। সেই কারণেই রোজকার সিগারেটের অভ্যাস সাঙ্ঘাতিকভাবে কমিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছে আছে, মনের সঙ্গে মোকাবিলায় পেরে উঠলে এই নেশাটা একেবারে ছেড়েই দেবেন।

'এখন তোর ফুলের দিকে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই—তোর শরীরের দিকে মন দে। শরীর না থাকলে ফুল ফোটাবি কী করে?' আপনমনে কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সুধাময়ের কাঁচি চলছিল।

শ্বেত করবীর পর চারটে দোপাটি গাছ। একটাতেও ফুল নেই, শুধুই সবুজ পাতা। বর্ষায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া হয়ে বেড়ে উঠেছে।

'তোরা দেখছি পাতাবাহার গাছ হয়ে গেলি! অবশ্য কী করে ফুল দিবি! এখন তো ঠিক ফুলের সময় নয়—।'

হাতের কাঁচি রেখে সুধাময় গাছের পাতার ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে লালচে-সবুজ ডালগুলো খুব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এই সময়ে নজর না রাখলে একরকম সাদা-সাদা পোকা হয়।

পোকা খুঁজতে-খুঁজতেই গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে লোহার গেটের দিকে চোখ গেল তাঁর। গেটের বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

গাছের পাতার আড়াল থেকে মাথা বের করে নিয়ে এলেন সুধাময়। সকাল ছ'টায় এ-কোন অতিথি এসে হাজির হল!

বাতাসে ভেসে বেড়ানো বৃষ্টির কুচির পরদা ডিঙিয়ে অতিথিকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না।

রণজয় সরকার—তাঁর জামাই। একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোহার গেটের কাছে। বাঁ হাতের নখ দাঁতে কাটছে।

'আরে, তুমি! এসো, এসো—এই সাতসকালে হঠাৎ—।'

রোজ ভোরবেলাতেই লোহার গেটের তালা খুলে দেওয়া সুধাময়ের অভ্যেস। তাই গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হল না রণজয়ের।

ওর পরনের গাঢ় নীল জিন্‌স-এর প্যান্ট, হলুদ রঙের ঢোলা টি-শার্ট।

হালকা চালে সুধাময়ের কাছে চলে এল রণজয় 'সাতসকালে গাছের যত্ন নিচ্ছেন?'

সুধাময় বসেই ছিলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখছিলেন রণজয়কে। এই কাকভোরে কী জন্য এসেছে ছেলেটা? কোনও বদ মতলব নিয়ে আসেনি তো? হাবভাব দেখে তো মনে হচ্ছে না। কে জানে, হয়তো অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছে মানুর কাছে।

রণজয়ের মুখ হঠাৎ বিষণ্ণ হল। দু-হাত একসঙ্গে জড়ো করে মাথা নিচু করে নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে রইল ও। নরম গলায় বলল, 'কাল সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। আপনাদের কাছে আমি মরমে মরে আছি। আপনি...আপনি আমাকে...।'

'ঠিক আছে...ঠিক আছে...যাও, ভেতরে যাও। মানু বোধহয় এখনও ঘুমোচ্ছে...।'

ছেলেটার চোখে জল। ওর রোগা ফরসা মুখে গাঢ় বিষণ্ণতা মাখানো। সুধাময়ের

ভীষণ মায়া হচ্ছিল।

'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, বাবা—' বলে ঝুঁকে পড়ে সুধাময়ের পায়ের ধুলো নিল রণজয়।

'থাক, থাক—' ওকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন সুধাময়। কিন্তু তিনি লক্ষ করেননি, রণজয় যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন ওর হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে একটা ধারালো হেঁসো। আগাছা পরিষ্কার করার জন্য সুধাময়ই ওটা নিয়ে এসেছিলেন কোণের ঘর থেকে।

রণজয়ের নিষ্ঠুর বাঁ হাত চেপে ধরল সুধাময়ের চুলের মুঠি। এক হ্যাঁচকায় তাঁর মাথাটাকে হেলিয়ে দিল পিছনে। পলকের জন্য সুধাময় দেখতে পেলেন মেঘলা আকাশের পটভূমিতে রণজয়ের বিকৃত মুখ, ওর দু-চোখের লালসা, আর তীব্র বাঁকা পথে তাঁর গলা লক্ষ্য করে নেমে আসা হেঁসোটা।

চিৎকার করতে পারলেন না সুধাময়। কিন্তু তাঁর চিৎকারের চেষ্টাটা বুদ্বুদের মতো বেরিয়ে এল গলার ফাঁক দিয়ে। আর রক্ত ছিটকে গিয়ে ছাপ ফেলল রণজয়ের জিন্‌স-এর প্যান্টে।

তাঁর প্রিয় গাছপালার পাশে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন সুধাময়। তাঁর সামান্য-হাঁ-হয়ে-থাকা মুখে বৃষ্টির কণা ঢুকে পড়ছিল। বাতাসে ছটফট করতে-করতে গাছের পাতাগুলো ভীষণ অবাক হয়ে বারবার সুধাময়কে জিগ্যেস করছিল, 'তোমার কী হল গো? কী হল তোমার? অমন চুপ করে অবাক চোখে তাকিয়ে কী দেখছ?'

কিন্তু সুধাময় ওদের আর্ত প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছিলেন না।

রণজয় হেঁসোটা ফেলে দিল সুধাময়ের দেহের পাশে। তারপর অত্যন্ত সহজ হালকা পায়ে দু-ধাপ সিঁড়ি উঠে চলে এল মোজেইক করা বারান্দায়।

সদর দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল, রণজয় সতর্ক হাতে সেটা ঠেলে ঢুকে পড়ল বিদিশাদের বাড়ির ভেতরে। তারপর দরজা লক করে ছিটকিনি এঁটে দিল।

বাড়ির ভেতরটা নিঝুম...আবছায়া অন্ধকার। একে মেঘলা, তার ওপর সব ক'টা জানলাতেই পরদা টানা। কিন্তু এ-বাড়ির ভূগোল রণজয়ের নিজের হাতের চেটোর মতোই চেনা। তাই ও বেড়ালের মতো পা ফেলে এগিয়ে গেল বিদিশার ঘরের দিকে। মানু কোথায়?

বিদিশার ঘরের দরজাটা বন্ধ। এখনও ও ঘুম থেকে ওঠেনি।

তার পরের ঘরটাই অরুণা-সুধাময়ের। অবশ্য এখন থেকে শুধুই অরুণার। সেই ঘরের দরজা স্বাভাবিকভাবেই খোলা। সুতরাং শাশুড়ির ঘরে ঢুকে পড়ল রণজয়।

অরুণা তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। তবে হালকা ঘুমের মধ্যে সামান্য এপাশ-ওপাশ করছিলেন। রণজয় ওর ডান হাতটা কলারের পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল পিঠে। তারপর ঢোলা টি-শার্টের ভেতর থেকে টেনে বের করে নিয়ে এল খবরের কাগজে ভালো করে মোড়া লম্বা মতো একটা কী যেন। ব্যস্ত হাতে মোড়কের কাগজগুলো খুলে ফেলে দিতেই

করাতের দাঁতওয়ালা একটা ঝকঝকে ছুরি দেখা গেল। সেটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে অরুণাকে ধাক্কা মারল রণজয়।

আচমকা রুক্ষ ধাক্কায় চমকে জেগে উঠলেন অরুণা। ঘুম জড়ানো চোখে যা দেখলেন তা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর মুখের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে গিয়ে জিভটা খসখস করছে। বুঝতে পারলেন, চিৎকারের চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ, কোনও শব্দ বেরোবে না তাঁর গলা দিয়ে। আর এও বুঝতে পারলেন, কেন রণজয়কে দেখে বিদিশা এতদিন ভয় পেয়েছে।

রণজয়ের চোখে পাগলের দৃষ্টি, মুখে হাসি, হাতে করাতের দাঁতওয়ালা ছুরি। ও ঠান্ডা গলায় বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। মানুকে ডাকুন—।'

সুধাময়ের জন্য দুশ্চিন্তা হল অরুণার। মানুষটারতো বাইরে গাছ-গাছালি নিয়ে থাকার কথা। এখনও সেখানে আছে তো? ওকে কিছু করেনি তো রণজয়!

অরুণাকে এক হ্যাঁচকায় বিছানা থেকে টেনে নামাল রণজয়। তারপর একইরকম শান্ত গলায় বলল, 'মানুকে ডাকুন—।'

বিস্রস্ত পোশাক ঠিক করতে-করতে বিদিশার ঘরের দরজায় এলেন অরুণা। দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেয়েকে নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডাকলেন। অনেকক্ষণ পর ঘুম জড়ানো গলায় সাড়া দিল বিদিশা।

অরুণার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। সাতসকালের এই অদ্ভুত ঘটনা তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর মুখের ভেতরে জিভ নড়ছিল, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন কথা বলার চেষ্টা করলে কথা জড়িয়ে যাবে।

বিদিশা দরজা খুলল। রণজয়কে দেখেই ওর ফরসা মুখ পলকে রক্তহীন হয়ে গেল। ও আকুল আর্ত চোখে অরুণার দিকে তাকাল। যেন বোঝাতে চাইল, ওদের আর কিছু করার নেই। একটা ভয়ঙ্কর বিষধর পাগল সরীসৃপ ধারালো দাঁত নিয়ে হাজির হয়েছে পাখির খাঁচায়। কামড় সে দেবেই।

অরুণাকে এক ঝটকায় পাশে ঠেলে দিল রণজয়। অদ্ভুত এক তৎপরতায় বিদিশাকে টেনে নিল কাছে। চাপা গলায় অস্বাভাবিক সুরে হিসহিস করে বলল, 'মানু, আমার...মানু...।'

বিদিশা সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে ছিল। রণজয়ের বাঁ হাত কিছুক্ষণ অসভ্যের মতো ঘুরে বেড়াল ওর পিঠে। তারপর ওকে পাশে সরিয়ে দিয়ে অরুণাকে ডেকে নিল রণজয়, 'আপনি এ-ঘরটায় ঢুকুন। আমি আর আপনার মেয়ে ও-ঘরটায় থাকব—।'

রণজয়ের কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত অরুণা চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন মেয়ে-জামাইয়ের দিক থেকে। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না কিছুতেই। রণজয় তাঁকে ডেকে যখন বিদিশার ঘরে ঢুকতে বলল তখন তাঁর দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল।

বাপ্পা সদর দরজার কাছাকাছি ওর ছোট ঘরটায় ঘুমোচ্ছে। ওর ঘুম থেকে উঠতে এখনও অনেক দেরি। রণজয় কি ওকেও ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলবে নাকি!

অরুণার ঘরের লাগোয়া গ্রিল দেওয়া বারান্দায় গেলে বাগানটা দেখতে পাওয়া যায়। আর একইসঙ্গে লোহার গেট, পিচের রাস্তাও দেখা যায়। সুতরাং বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে চিৎকার চেঁচামেচি করলে রাস্তার লোকজন শুনতে পাবে। যদিও এই ভোরে রাস্তায় মানুষজন পাওয়া মুশকিল। তা সত্ত্বেও রণজয় হয়তো সেই সুযোগের কথা আঁচ করেই অরুণাকে বিদিশার ঘরে ঢুকতে বলেছে।

বিদিশার ঘরে ঢুকে অরুণা যখন সুধাময়ের চিন্তায় আর আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে আছেন তখন রণজয় একচিলতে হেসে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার আগে ছোট্ট করে বলল, 'প্লিজ, চিৎকার-টিৎকার করবেন না। করলে আপনার মেয়ের গলা কেটে দেব।' কথা শেষ করার সময় হাতের ছুরিটা উঁচিয়ে দেখিয়েছে রণজয়। তারপর বন্ধ দরজার হাঁসকল টেনে দিয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাত চালিয়ে কপালে এসে পড়া চুল ঠিক করল রণজয়। তারপর রুক্ষভাবে বিদিশাকে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল ডাইনিং হলের দিকে।

বন্ধ ঘরের ভেতরে বন্দি হয়ে অরুণা কাঁদতে শুরু করেছিলেন। রণজয়ের সঙ্গে ডাইনিং হলের দিকে যেতে-যেতে সেই কান্নার গোঙানি শুনতে পেল বিদিশা। ওরও কেমন কান্না পেয়ে গেল। একইসঙ্গে সুধাময়ের চিন্তাটাও চলে এল মাথায় বাপি কোথায়?

ডাইনিং হলে এসেই এক অভদ্র ধাক্কায় বিদিশাকে একটা চেয়ারের দিকে ঠেলে দিল রণজয়। বিদিশা বেশ ব্যথা পেল কোমরে, কিন্তু যন্ত্রণায় চিৎকার করতে ভয় পেল।

ছুরি হাতে রণজয় উদভ্রান্ত চোখে বিদিশাকে একবার দেখল, তারপর এগিয়ে গেল বাপ্পার ছোট ঘরের দিকে।

বিদিশা এবার চিৎকার করে উঠল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ক্ষিপ্ত চিতার মতো ওর দিকে ছিটকে এল রণজয়। এক ধাক্কায় ওকে চেয়ারসমেত কাত করে ফেলে দিল মেঝেতে।

বিদিশার ভয়ের চিৎকারটা মাঝপথে থেমে গিয়ে ব্যথার গোঙানি বেরিয়ে এল।

অগোছালোভাবে পড়ে থাকা বিদিশার দিকে তাকিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ দিল রণজয়। বিদিশা ওর ভয়ঙ্কর চোখ-মুখ দেখে ভয়ে কাঁদতে শুরু করল।

সকালবেলাতেই নানারকম শব্দ আর কথাবার্তা বোধহয় বাপ্পার ঘুম হালকা করে দিয়েছিল। কারণ, বাপ্পার ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। রণজয় ছুটে সেই দরজার কাছে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই বাপ্পা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওর পরনে ডোরাকাটা পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি।

বাপ্পাকে দেখে বিদিশা চিৎকার করে উঠল, 'শিগগির! ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দে! জলদি—।'

বুট পরা পায়ে বিদিশার পাঁজরে প্রচণ্ড এক লাথি কষাল রণজয়। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'ফাকিং বিচ!' তারপর এক লাফে পৌঁছে গেল বাপ্পার ঘরের দরজায়।

কিন্তু বাপ্পা ততক্ষণে দিদির কথা মতো ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে।

রণজয় বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বাপ্পার ঘরের দরজাতেও হাঁসকল টেনে দিল। ও জানে, বাপ্পার ঘর থেকে পালানোর কোনও পথ নেই। তা ছাড়া ওর ঘর থেকে চেঁচিয়ে রাস্তার কাউকে ডাকা বেশ কঠিন। কারণ, ওর ঘরের পাশ ঘেঁষে পরপর দুটো খালি প্লট—আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে আছে।

ছুরি হাতে এবার বিদিশার কাছে এসে দাঁড়াল রণজয়। ছুরিটা ডাইনিং টেবিলের একপাশে রেখে দিয়ে ওর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে তেরছাভাবে হাসল, বলল, 'এসো বউ, আর কোনও লজ্জা নেই—এবারে ফুলশয্যা হয়ে যাক...।'

বিদিশার ফরসা সুন্দর মুখ ভয়ে বেঁকেচুরে গেছে। কোমরে, পাঁজরে অসহ্য ব্যথা। ডাইনিং হলের এক কোণে রাখা টেলিফোনের দিকে তাকাল ও। যদি কোনওরকমে শেখরকে একটা ফোন করা যেত, কিন্তু ফোন করেই বা কী হত! শেখর টালিগঞ্জ থেকে আসতে-আসতে কম করেও একটি ঘণ্টা। তখন কি আর সাহায্যের কোনও দরকার হবে!

কিন্তু টেলিফোন আর কাউকে করা যায় না? বাড়ির কাছাকাছি কাউকে? পাশের লেনের রমেশবাবুকে, কিংবা ডক্টর সান্যালকে?

হঠাৎই বিদিশা টের পেল, ও বোকার মতন দিবাস্বপ্ন দেখছে। রণজয়ের সামনে এখান থেকে কাউকে ফোন করা অসম্ভব। টেলিফোনের আর-একটা প্যারালাল লাইন রয়েছে সুধাময়-অরুণার ঘরে। সেটা মনে রেখেই বোধহয় রণজয় অরুণাকে বিদিশার ঘরে টেনে এনে বন্দি করেছে। কিন্তু বাবা-মায়ের ঘর থেকেও বা ফোন করবে কেমন করে! যদি সুধাময় থাকতেন বাড়িতে, তা হলে....।

কিন্তু বাপি কোথায়? বাইরের বাগানে, নাকি ভোরবেলাই বাজারে রওনা দিল? উহুঁ, বাজারে তো যায়নি—ওই তো, রান্নাঘরের দেওয়ালে বাজারের থলে ঝুলছে! বিদিশা হঠাৎই সুধাময়ের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। ও আর কান্না চাপতে পারল না। হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

আর ঠিক তখনই রণজয় ঝুঁকে পড়ে বিদিশাকে এক হ্যাঁচকায় দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর ওকে খুব কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'বউ, কতদিন তোমাকে ভালো করে দেখিনি।' ওর গালে ঠোঁটে পরপর ক'টা চুমু খেল রণজয়। তারপর আদুরে গলায় বলল, 'নাও, দেখাও—।'

বিদিশার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। ওর শরীরটা কাঠ হয়ে ছিল রণজয়ের হাতের বাঁধনে। কান্নার দমকে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠছিল বারবার। ও চোখ নামিয়ে রেখেছিল মেঝের দিকে। কী হবে এখন! এই বিপজ্জনক পাগলটার হাত থেকে কী করে রেহাই পাবে বিদিশা!

'কী হল! দেখাও—' ওকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল রণজয় 'নাও, চটপট সব খোলো—।'

এতক্ষণে পাগলটার খামখেয়ালি মতলব স্পষ্ট হল বিদিশার কাছে। এই নোংরা লোকটার সঙ্গে ও দু-বছর ঘর করেছে ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে উঠল ওর। ও আড়চোখে ডাইনিং টেবিলে রাখা নির্লিপ্ত ছুরিটার দিকে দেখল। পুরোনো কয়েকটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল বিদিশার। এইরকম বিপদ এড়াতেই ও মানিকতলার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল সল্ট লেকে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, লাভ কিছু হয়নি।

রণজয়ের হাত ওর শাড়ি খামচে ধরতেই বিদিশা চমকে উঠল। প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় বাধা দিয়েছিল ভুল করে। ভুল যে হয়েছে সেটা বুঝিয়ে দিল রণজয়ের নৃশংস থাপ্পড়। বিদিশা টলে পড়ে গেল মেঝেতে। পড়ে-থাকা চেয়ারটা ওর শরীরকে বাধা দিল। ফলে যন্ত্রণার তীর বিঁধে গেল পিঠে, কোমরে। ও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

আর তখনই শুনতে পেল, বন্ধ দরজার পিছন থেকে মা চেঁচিয়ে ডাকছে ওকে 'মানু! মানু, কী হল? রনো, দরজাটা খুলে দাও। মাথা গরম কোরো না। কী হয়েছে আমাকে খুলে বলো। মানুকে কিছু কোরো না...।'

রণজয় একবার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল বন্ধ দরজাটার দিকে। তারপর ঝুঁকে পড়ে একমনে বিদিশার শাড়ি ধরে টানতে লাগল।

বিদিশা আর বাধা দিতে পারল না। শাড়ির পাক যতই খুলতে লাগল ওর শরীরটা ততই গড়িয়ে যেতে লাগল পাকে-পাকে।

রণজয় অত্যন্ত সিরিয়াস মুখে দ্রুত হাতে কাজ সারতে লাগল। খুলে নেওয়া শাড়িটা ও দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল এক কোণে। তারপর পাথরের মতো মুখে বিদিশাকে হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

'তুমি নিজে খুলবে, না কি আমাকে খুলতে হবে!'

রণজয়ের গলার স্বর ভয় পাইয়ে দিল বিদিশাকে। ওর মনে হল, রণজয় বোধহয় বেশ কয়েকটা টেনটেক্স ফোর্ট খেয়ে এসেছে। ও তাড়াতাড়ি ব্লাউজের হুকে হাত দিল।

অরুণা তখনও ইনিয়েবিনিয়ে কেঁদে-কেঁদে কীসব বলছিলেন ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না।

রণজয় সরাসরি বিদিশার বুকের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেদিকে চোখ রেখেই ও ডাইনিং টেবিলে উঠে বসল। বলল, 'মানু, আমি ফুলশয্যার রাতের মতো এক্সাইটেড হয়ে পড়েছি। কুইক। ওঃ কাম অন—অত লজ্জা কোরো না। তোমার সবই তো আমার দেখা—শুধু মাঝে ন'-দশ মাস দেখিনি। নাও, জলদি—।'

বিদিশার বোধহয় দেরি হচ্ছিল। অন্তত রণজয়ের সেইরকমই মনে হয়েছে। তাই ও একলাফে নেমে এল বিদিশার খুব কাছে। ওকে জাপটে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল, মুখ ঘষতে লাগল, শরীরে শরীর ঘষতে লাগল। ওর হাত মাকড়সার মতো হেঁটে বেড়াতে লাগল বিদিশার সারা গায়ে।

বিদিশার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। ও এবার স্পষ্ট টের পেল রণজয়ের অবস্থা।

সত্যিই ও টেনটেক্স ফোর্ট খেয়ে এসেছে।

বিদিশা কাঁদতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওর গলা দিয়ে কেমন একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

ব্লাউজ কখন খুলে গেছে। রণজয়ের লোভাতুর হাতের সামনে কোনও আড়ালই আর নেই। বিদিশা নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে অনুভব করতে লাগল ওর প্রাক্তন স্বামীর নির্লজ্জ আদর। প্রথমে হাত দিয়ে, পরে মুখ দিয়ে। ও দেখতে পাচ্ছিল, ওর ফরসা বুকে রণজয়ের কালো মাথাটা কেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে, পাগলের মতো ছটফট করছে এপাশ-ওপাশ।

হঠাৎই রণজয় খ্যাপা কুকুরের মতো বিদিশাকে এক হ্যাঁচকায় কোলে তুলে ফেলল। তারপর বসিয়ে দিল ডাইনিং টেবিলে। ওর শায়ার দড়ি ধরে প্রচণ্ড এক টান মারল। পট করে ছিঁড়ে গেল দড়ি। বিদিশা চোখ বুজে ফেলল। ঘেন্নায় ওর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

সেই অবস্থাতেই ও টের পেল শায়াটা ধরে ভয়ঙ্কর এক টান মারল কেউ। শব্দে বুঝল শায়া অনেকটা ছিঁড়ে গেল। তারপর বেশ কয়েকটা হ্যাঁচকা টানে ওটা বিদিশার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

লজ্জা ঢাকতে বিদিশা চোখ বুজেই ছিল। তবু টের পাচ্ছিল রণজয় ওর ইচ্ছে মেটানোর পথে ধাপে-ধাপে এগোচ্ছে। পাঁচ-দশ সেকেন্ড পরেই ডাইনিং টেবিলটা বিছানা হয়ে গেল, আর ডাইনিং হলটা বেডরুম। সেই সঙ্গে দিনটাও বোধহয় রাত হয়ে গেল।

সহবাস যে ধর্ষণের চেয়েও জঘন্য হতে পারে সেটা এই প্রথম উপলব্ধি করল বিদিশা। রণজয়ের ফ্রন্টাল লোবের যত গন্ডগোল সব ধরা পড়ে গেল এই মিলনেও। উপোসি কোনও অশরীরী শরীর ফিরে পেতে যতটা আকুল হয়, রণজয়ের চাহিদাও ছিল ঠিক ততটাই আকুল।

পরিশ্রমের ধকলে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছিল রণজয়, আর কাঠ হয়ে পড়ে থাকা বিদিশার কোমল শরীর সেই কম্পন অনুভব করছিল। একইসঙ্গে বিদিশা ভাবছিল, কী করে রুখে দেওয়া যায় এই মারাত্মক অমানুষটাকে।

বাপ্পা চিৎকার করে ডাকছিল, 'দিদি! দিদি!'

অরুণাও কান্না মেশানো গলায় 'মানু! মানু!' করে ডাকছিলেন আর বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন।

রণজয় হঠাৎই বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। চাপা গলায় খিস্তি করে রাগের চোখে ঘুরে তাকাল বিদিশার ঘরের দিকে—যে-ঘরে বন্দি আছেন অরুণা। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গেল সেদিকে।

বিদিশার চোখে জল, বুকের ভেতরে নাম-না-জানা কষ্ট। ও উঠে বসল ডাইনিং টেবিলে। ব্লাউজের হুকগুলো লাগিয়ে নিল। তারপর লজ্জা ঢাকতে নেমে এল ডাইনিং

টেবিল থেকে।

ওকে নামতে দেখেই ক্ষিপ্ত রণজয় এক ঝটকায় ফিরে এল ওর কাছে। এক হাতে টুঁটি টিপে ধরল ওর।

বিদিশার গলা দিয়ে অস্পষ্ট একটা 'আঁক' শব্দ বেরিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই ও চেখের ইশারায় ঘরের কোণে পড়ে থাকা দলা-পাকানো শাড়িটা দেখাল। রণজয় বুঝতে পারল। একটা ছোট্ট ধাক্কায় ওকে ঠেলে দিল সেদিকে।

অরুণা তখনও দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন, কান্না জড়ানো গলায় 'মানু! মানু!' করে ডাকছিলেন।

রণজয় সাঙ্ঘাতিক বিরক্ত হয়ে খ্যাপা কুকুরের মতো ছুটে গেল সেদিকে। দরজায় একটা জোরালো ধাক্কা মেরে অরুণাকে চুপ করতে বলল। তারপর অশ্রাব্য গালিগালাজের ফোয়ারা ছোটাল।

বিদিশা শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছিল। তখনই খেয়াল করল, টেলিফোনটা ওর একেবারে হাতের নাগালে।

রণজয় এখন বিদিশার কাছ থেকে অনেকটা দূরে। সুতরাং টেলিফোনটা বিদিশা চট করে একবার ব্যবহার করতে পারে। তবে রণজয় সেটা দেখতে পাবে এবং বিদিশাকে হয়তো অবাধ্যতার জন্য হিংস্র শাস্তি পেতে হবে।

রণজয়ের করাতের দাঁতওয়ালা ছুরিটা এখনও পড়ে আছে ডাইনিং টেবিলে—মাত্র কয়েক হাত দূরে। বিদিশা ইচ্ছে করলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা তুলে নিতে পারে। কিন্তু ওটা হাতে পেলেই কি ও জিততে পারবে এই পাগলটার সঙ্গে!

হয় টেলিফোন, নয় ছুরি। যে-কোনও একটা হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে বিদিশা। গায়ে শাড়ি জড়াতে-জড়াতে এই অঙ্কের হিসেবটাই কষছিল ও।

শেষপর্যন্ত ও টেলিফোনের পক্ষেই গেল। শাড়ির খানিকটা অংশ মেঝেতে ফেলে দিয়ে সেটা ঠিক করার ভান করে ঝুঁকে পড়ল মেঝেতে।

সেই সুযোগে টেলিফোনের রিসিভারটা মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে শেখরের বাড়ির নম্বরটা ঘোরালো ডায়ালে ফোর সেভেন টু ওয়ান নাইন ওয়ান সেভেন।

বিদিশার পিঠ রণজয়ের নজর আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তেই ও ভাবছিল, এই বোধহয় রণজয় এসে দাঁড়াবে ওর পিঠের কাছে, ধরে ফেলবে ওর অভিসন্ধি। তারপর ওর চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকায় ওকে...।

মেঝেতে পড়ে থাকা রিসিভারে একটি মহিলা কণ্ঠ 'হ্যালো, হ্যালো' করছিল। বিদিশা অতি সন্তর্পণে রিসিভারটা তুলে নিয়ে এল মুখের কাছে। ফিসফিস করে বলল, 'আমি বিদিশা বলছি। শেখরকে বলুন আমাদের বাড়িতে এক্ষুনি চলে আসতে। ভীষণ বিপদ...।'

পিছন থেকে একটা লাথি এসে পড়ল বিদিশার পিঠে। বিদিশা ঠিকরে পড়ল ডাইনিং হলের বড় জানলার কাছে। ওর শাড়ির অর্ধেকটা কোমরে জড়ানো, বাকিটা লুটোপুটি।

সেই অবস্থাতেই ও দেখল, রণজয় ডাইনিং টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়েছে। পরক্ষণেই ছুরির এক কোপে কেটে দিল টেলিফোনের তার। তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে জোরে আছাড় মারল মেঝেতে। সংঘর্ষের শব্দ হল। চুরমার হয়ে যাওয়া প্লাস্টিক আর ধাতুর টুকরো ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

রণজয় হাসল বিদিশার দিকে তাকিয়ে। বলল, 'কী রে, মানু, ভয় পেলি?' তারপরই একরাশ খিস্তিখেউড়।

ছুরির ডগাটা বিদিশার ব্লাউজের মাঝামাঝি ঠেকাল রণজয়। তারপর চাপ দিয়ে আচমকা জোরালো এক টান মারল। ব্লাউজ কেটে দু-ভাগ হল। বিদিশার ফরসা বুকের চামড়াও। রক্তের রেখা দেখা গেল সেখানে।

বিদিশা ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। রণজয় ছুরিটা ফেলে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল বিদিশার ওপরে। দাঁত দেখিয়ে হাসল, বলল, 'মানু, আয়, আর-একবার হয়ে যাক—।'

বিদিশার গা ঘিনঘিন করে উঠল। আবার! টেনটেক্স ফোর্টের তেজ সহজে কমে না।

কিন্তু আর কিছু ভেবে ওঠার আগেই রণজয় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বিদিশার ওপরে। চাপা কর্কশ গলায় বলেছে, 'তোকে আমি ছাড়ব না!'

টেলিফোন আছড়ে ফেলার শব্দে ভয় পেয়েছিলেন অরুণা। বাপ্পাও ভয় পেয়েছিল। সুতরাং কান্নার শব্দ আর দরজার ধাক্কা দুটোই কয়েক পরদা বেড়ে গেল।

রণজয় এবারে আর বিরক্ত হল না। কারণ, ওর রক্তে তখন খই ফুটতে শুরু করেছে।

একটা নাম-না-জানা ঘৃণায় বিদিশা হাত-পা ছুড়তে শুরু করল, বাধা দিতে চাইল হামলে পড়া জন্তুটাকে। কিন্তু তার জবাবে বিদিশার গলা টিপে ধরল রণজয়। আর বিদিশা ডুবে যাওয়া মানুষের মতো এলোমেলোভাবে বাতাস আঁকড়ে ধরতে চাইল।

বিদিশার চোখের সামনে রণজয়ের বিকৃত মুখ, কপালে-নেমে-আসা চুল, আর গরম নিশ্বাস। আর ওর হাত নিতান্ত অকারণেই খড়কুটো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এরকমই একটা অবস্থায় বিদিশার হাত পড়ল বেগন পাওয়ারের স্প্রে সিলিন্ডারে। জানলার ঠিক নীচেই দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে সিলিন্ডারটা দাঁড় করানো থাকে। মশা মারার জন্য কেনা হয়েছে এই ওষুধটা। ধাতুর লম্বাটে বোতলের মাথায় সাদা রঙের বোতাম। বোতামে চাপ দিলেই বেরিয়ে আসে ধোঁয়ার মতো স্প্রে। কী বিশ্রী দুর্গন্ধ! নাকে এলেই বিদিশার মাথা ঝিমঝিম করে।

এটা রণজয়ের মুখে স্প্রে করলে কি ওকে থামানো যাবে? মশা মারার বিষে মানুষ কি একটুও অবশ হবে না!

বিদিশা আর ভাবতে পারছিল না। ও মরিয়া হয়ে সিলিন্ডারটা খামচে ধরে রণজয়ের মুখ লক্ষ করে বোতাম টিপে দিল। সাদা ধোঁয়ার মতো স্প্রে রণজয়ের মুখ ঝাপসা করে দিল। উৎকট দুর্গন্ধে বিদিশার গা গুলিয়ে উঠল। কিন্তু ও দাঁতে দাঁত চেপে বোতাম

টিপেই রইল।

এইরকম একটা প্রতিরোধের জন্য রণজয় তৈরি ছিল না। মুখে স্প্রে এসে পড়ামাত্রই ও বিদিশাকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে গড়িয়ে গেল একপাশে।

কিন্তু বিদিশা কোণঠাসা বেড়ালের মতো মরিয়া হয়ে উঠেছে। ও স্প্রে করেই চলল। কখনও রণজয়ের মুখে, মাথায়, কানে, গলায়—কখনও বা হাতে, পায়ে, গায়ে। তাক কখনও ঠিক হচ্ছিল, কখনও বা ভুল। কিন্তু মরিয়া বিদিশা বোতামের ওপরে আঙুলের চাপ এতটুকু আলগা করেনি।

রণজয়ের মাথা ঝিমঝিম করছিল। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ও ছুরিটা হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজছিল। কোথায় গেল ছুরিটা?

বিদিশা যখন উঠে দাঁড়িয়েছে রণজয় তখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। আচমকা এই অদ্ভুত আক্রমণে প্রথম ধাক্কাতেই অনেকটা বিষাক্ত বাষ্প ঢুকে গেছে ওর চোখে, মুখে, নাকে। ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, চোখ ভীষণরকম জ্বালা করছিল, মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে। কোথায় গেল ছুরিটা?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিলিন্ডার প্রায় শেষ হয়ে গেল। খালি ক্যানটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উদভ্রান্তের মতো চারপাশে দেখল বিদিশা। জানলার তাকে টুকিটাকি অনেক জিনিস। একটা তালাচাবি, সাবানকেস, মোমবাতি, ছোট একটা শেকল, দেশলাই, কাপড় ছড়ানোর প্লাস্টিকের ক্লিপ, আরও কত কী।

দেশলাই! মশা মারার এই ওষুধে কি সহজে আগুন ধরে? কেরোসিন তেলের মতো? বিদিশার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। ও উদভ্রান্ত নজরে দেখল, রণজয় সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ওর হাতে সেই ছুরি। সারা গা বেগন পাওয়ারে ভেজা। চোখে খুনির দৃষ্টি।

বিদিশা আর কিছু ভাবতে পারল না। দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে নিয়ে কাঠি বের করে নিল। কাঁপা হাতের এক ঘষায় সেটা জ্বেলে ছুড়ে দিল রণজয়ের গায়ে।

চোখের পলকে যেন দেওয়ালি শুরু হয়ে গেল। রণজয়ের ছুরি খসিয়ে গেল। লড়াকু শরীরটায় আগুন ধরে গেল দপ করে। তারপর লকলকে শিখায় এলোপাতাড়ি জ্বলতে লাগল।

আগুন ধরে গেল ঘরের বাতাসে, যেখানে ওষুধের বাষ্পের কণা ভেসে বেড়াচ্ছিল। আর বিদিশার শাড়িও রেহাই পেল না। কখন যেন বেগন পাওয়ার ছুঁয়ে গেছে ওর শাড়ি।

বিদিশা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল। রণজয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল জন্তুর গর্জন। আর বন্ধ দরজা দুটোয় কান-ফাটানো শব্দ করছিলেন অরুণা ও বাপ্পা—সেই সঙ্গে তীব্র চিৎকার।

এই তুমুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিদিশার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রণজয়ের জ্বলন্ত শরীর।

ওর টলোমলো ডান হাত আনাড়ির মতো ছুরি চালাল বিদিশাকে লক্ষ করে।

বিদিশা তখন চিৎকার করে ছুটেছিল কলঘরের দিকে, আর পরনের শাড়িটাকে গা থেকে খুলে ফেলতে চেষ্টা করছিল। রণজয়ের ছুরি ওর ডান বাহুতে এসে লাগল, কিন্তু সেই যন্ত্রণা বিদিশা বোধহয় টের পেল না। ও পাগলের মতো ঢুকে পড়ল কলঘরে। শাওয়ারের কল খুলে দিল শেষ প্যাঁচ পর্যন্ত। তারপর শাওয়ারের নকল বৃষ্টির নীচে কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে গোড়া কাটা গাছের মতো ঠাস করে পড়ে গেল কলঘরের মেঝেতে।

নকল বৃষ্টি ওর লজ্জাহীন শরীরকে তখন ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থাতেও বিদিশা শেষবারের মতো দেখল, রণজয়ের দেহটা মেঝেতে পড়ে গিয়েও দাউদাউ করে জ্বলছে।

চেতনা হারানোর আগে বিদিশা অনেকগুলো দরজায় একসঙ্গে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল। মনে হল, বাইরে থেকে কে যেন সদরে কলিংবেলের বোতাম টিপছে।

তারপর আর কিছু ওর মনে নেই।

চোখ খুলেই নার্সিং হোমের সাদা দেওয়াল, সাদা পোশাক পরা নার্স। এ ছাড়া সাবানের ফেনার মধ্যে ভাসছে বেশ কয়েকটা পরিচিত রঙিন মুখ। সেই মুখগুলোর মধ্যে মা-বাবা-রণজয়কে খুঁজল বিদিশা। কিন্তু শুধু মাকে দেখতে পেল।

মাথার অসহ্য যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ও ভাবতে চেষ্টা করল।

না, এটা সেই প্রথমবারের নার্সিং হোম নয়। টেনটেক্স ফোর্ট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিদিশা এখানে আসেনি। এখানে ও এসেছে অন্য কোনও কারণে।

জলের গভীর থেকে ছোট্ট বুদ্বুদ যেমন ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে আসে ঠিক সেইভাবে বিদিশার অচেতন মন চেতনায় ভেসে উঠছিল। শরীরের জ্বালা যন্ত্রণাগুলো একটু-একটু করে টের পাচ্ছিল ও। আর একইসঙ্গে চোখের নজর স্বচ্ছ হয়ে উঠছিল।

এইবার মুখগুলোকে স্পষ্ট করে চিনতে পারল বিদিশা। মা, বাপ্পা, শেখর, বোসদা, দেবলীনা, সুতপাদি আর অশোক চন্দ্র।

ওকে চেতনায় দেখে সবাই স্বস্তির হাসি ফোটাল মুখে।

বিদিশাও হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোঁটে বেশ ব্যথা।

অরুণা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এখন কেমন আছিস?'

বিদিশা সামান্য মাথা নেড়ে বলল, 'ভালো—।'

আর তখনই ও মায়ের সাদা শাড়ি খেয়াল করল।

ও সামান্য ঠোঁট নেড়ে অস্পষ্টভাবে প্রশ্ন করল, 'বাপি আসেনি?'

অরুণা বাপ্পাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। মাথা নিচু করে আঁচলে মুখ গুঁজলেন। শেখর এগিয়ে এসে অরুণাকে আলতো করে ঠেলে সরিয়ে দিল। বিদিশার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আপনার এখন কথা বলার দরকার নেই—স্ট্রেইন হবে।'

সুতপাদি আর দেবলীনা বিদিশার হাত ধরল, হাসল ঠোঁটে।

বিদিশার সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। নার্সিং হোমে ও কতদিন পড়ে আছে? পাঁচ দিন? সাত দিন? দশ দিন?

ও বিড়বিড় করে বলল, 'রণজয়...।'

শেখর বলল, 'কথা বলতে বারণ করলাম না! আপনার আর কোনও ভয় নেই...আর কেউ কখনও আপনাকে বিরক্ত করবে না। সেরে উঠে পরে সব শুনবেন—।'

'বাপি...' ডুকরে কেঁদে উঠল বিদিশা। ওর চোখ ভিজে গেল।

নার্স এগিয়ে এল শেখরের কাছে। বলল, 'আপনারা এবার যান। পেশেন্টকে এবার ঘুমের ইনজেকশান দেব।'

ওরা একে-একে সরে এল বিদিশার কাছ থেকে।

বিছানার পাশের জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে পাচ্ছিল বিদিশা। কোথাও সাদা মেঘ, আর কোথাও নীল আকাশ। কালো মেঘ কোথাও নেই।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে সুধীর বোস বললেন, 'মা জননী, তুমি ঝটপট সেরে উঠে অফিসে জয়েন করো। তুমি অফিসে না এলে আমরা ঠিক কাজে মুড পাচ্ছি না।'

অশোক চন্দ্র জিগ্যেস করল, 'বোসদা, "আমরা" মানে কারা?'

ঘরের দরজার বাইরে বেরিয়ে এসে শেখরের পিঠে চাপড় মেরে বোসদা বললেন, '"আমরা" মানে আমি আর শেখরভায়া।'

অশোক অবাক হওয়ার ভান করে বলে উঠল, 'আমি কি সেদিনের মতোই এক্জ বারে আটকে গেলাম?'

সুধীর বোস পান চিবোতে-চিবোতে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ইয়েস।'
